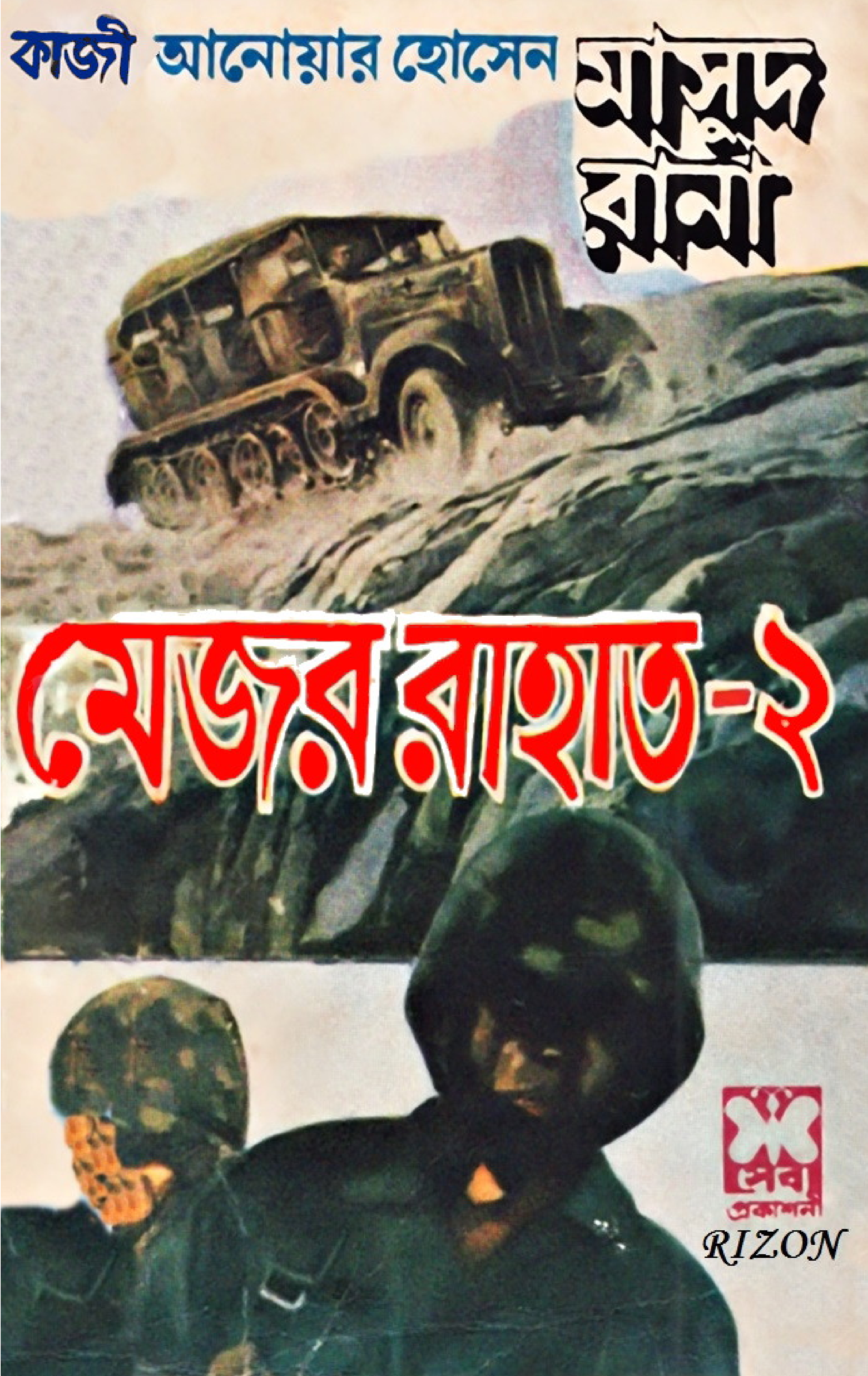

কাজী আনোয়ার হোসেন
মাসুদ রানা
মেজর রাহাত-২
সেবা প্রকাশনী
RIZON

সেবা প্রকাশনী

এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় * ভারত-নাট্যম * স্বর্ণমৃগ * দুঃসাহসিক
মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা * দুর্গম দুর্গ * শত্রু ভয়ঙ্কর
সাগর-সঙ্গম-১, ২ * রানা ! সাবধান !! * বিস্মরণ
রত্নদ্বীপ * নীল আতঙ্ক-১, ২ * কায়রো * মৃত্যু-প্রহর
গুপ্তচক্র * মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র * রাত্রি অন্ধকার * জাল
অটল সিংহাসন * মৃত্যুর ঠিকানা * ক্ষ্যাপা নর্তক * শয়তানের দূত
এখনো ষড়যন্ত্র * প্রমাণ কই ? * বিপদজনক-১, ২ * রক্তের রঙ-১, ২
অদৃশ্য শত্রু * পিশাচ দ্বীপ * বিদেশী গুপ্তচর-১, ২
ব্ল্যাক স্পাইডার-১, * গুপ্তহত্যা * তিনশত্রু
অকস্মাৎ সীমান্ত-১, ২ * সতর্ক শয়তান * নীলছবি-১, ২
প্রবেশ নিষেধ-১, ২ * পাগল বৈজ্ঞানিক * এসপিওনাজ-১, ২
লাল পাহাড় * হৃৎকম্পন * প্রতিহিংসা-১, ২
হংকং সম্রাট-১, ২ * কুউউ ! * বিদায় রানা-১, ২, ৩
প্রতিদ্বন্দ্বী-১, ২ * আক্রমণ-১, ২ * গ্রাস-১, ২ * স্বর্ণতরী-১, ২
পপি * জিপসী-১, ২ * আমিই রানা-১, ২ * সেই উ-সেন-১, ২
হ্যালো, সোহানা-১, ২ * হাইজ্যাক-১ ২
আই লাভ ইউ, ম্যান-১, ২, ৩ * সাগর কন্যা-১, ২
পালাবে কোথায়-১, ২ * টার্গেট নাইন-১, ২ * বিষ নিঃশ্বাস-১, ২
প্রেতাত্মা-১, ২ * বন্দী গগল * জিম্মি * তুষার যাত্রা-১, ২
স্বর্ণ-সংকট-১, ২ * সন্ন্যাসিনী * পাশের কামরা
নিরাপদ কারাগার-১, ২ * স্বর্গরাজ্য-১, ২ * উদ্ধার-১, ২
হামলা-১, ২ * প্রতিশোধ-১, ২ * মেজর রাহাত-১, ২

সেবা প্রকাশনী

মেজর রাহাত-২

দুই খণ্ডে সমাপ্ত সম্পূর্ণ রোমাঞ্চ-উপন্যাস

কাজী আনোয়ার হোসেন

রানা-১১০

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রকাশনী
১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ১৯৮৩

রচনা : বিদেশী কাহিনীর ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শাহাদত চৌধুরী

মুদ্রণে :
রুহুল আমিন
পলাশ মুদ্রণ
২৪, মোহিনীমোহন দাস লেন,
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেগুনবাগান প্রকাশনী
১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০
দূরালাপনী : ৪০৫৩৩২

শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০, বাংলাবাজার
ঢাকা-১

MAJOR RAHAT-2
By Qazi Anwar Husain

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
একা।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে-কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চির-নবীন যুবকটির সাথে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডীবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
এক টানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য প্রতীকী জগতে।
আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

প্রতিটি কাহিনী আলাদা, স্বয়ংসম্পূর্ণ

সিরিজের অন্যান্য বই পড়া না থাকলেও বুঝতে পারবেন।

সেবা প্রকাশনী

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক।
জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সাথে
এর কোনও সম্পর্ক নেই।
॥ লেখক ॥

এক

'কিছু যদি মনে না করেন, জেনারেল ম্যালোরি, ডায়মণ্ড ব্র্যাণ্ড বার্মীজ চুরুটের রহস্যটা কি বলবেন?'

মেজর রাহাতের গল্প শুনতে এসে রাতটা জেনারেলের প্রাসাদোপম বাড়িতে কাটিয়ে দিয়েছে ওরা। বুড়ো ম্যালোরি যখন গল্পের মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁচেছেন, রাত তখন চারটে। তিনি আর ওদেরকে ফিরতে দেননি, ঘুমাবার জন্যে তিনজনকে আলাদা তিনটে সুসজ্জিত বেডরূম খুলে দিয়েছিলেন। বেডরূম বরাদ্দ করার সময় একটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। অবশ্য ঘটনাটা সবার মনে সমান প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। জেনারেল ম্যালোরি রূম বরাদ্দ করেছিলেন দু'টো। একটা সোহেলের জন্যে, আরেকটা রানা আর সোহানার জন্যে। কিভাবে কে জানে, তাঁর ধারণা হয়েছিল, ওরা নিশ্চয়ই স্বামী-স্ত্রী।

তাঁর ভুলটা ভেঙে দেয় রানা। সবিনয়ে জেনারেলকে বলে ও, 'আমার আর সোহানার জন্যে একটা রূম দিয়েছেন, আপনার এই আয়োজনের সমালোচনা করার কোনো ইচ্ছে আমার নেই।

কিন্তু মুশকিল হলো, মত বদলাবার মতো বিরাট কিছু একটা না ঘটা পর্যন্ত বিয়েই করবো না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা।'

নিজের ভুল বুঝতে পেরে বিব্রত বোধ করেন জেনারেল ম্যালোরি, ওদের দু'জনের কাছে আলাদা আলাদা ভাবে ক্ষমাও চেয়ে নেন। তবুও, বারবার তাঁর মনে হয়েছে, পাশাপাশি দাঁড়ালে ওদেরকে বড় সুন্দর মানায়। কিন্তু মনের কথা মুখে ফুটতে দেননি তিনি, বেফাঁস কিছু বলে সবাইকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলার কোনো ইচ্ছে তাঁর নেই।

একা একা মজা পেয়েছে সোহেল। ঘটনাটা ঘটে যাবার পর রানার চেহারা ভাবলেশহীন, নির্লিপ্ত হয়ে যাওয়ায় ওর সামনে হাসতে পারেনি সে। আর সোহানা আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল, একটু যেন আনমনাও, তাই সোহানার সামনেও বত্রিশ পাটি বের করার সাহস হয়নি। কাজেই, নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ না করা পর্যন্ত প্রাণ খুলে হাসতে পারেনি বেচারা।

সকাল দশটায় ঘুম ভাঙে সোহেলের। সে-ই রানার ঘরে নক করে সোহানার ঘুম ভাঙায়। বুড়ো ম্যালোরির আতিথেয়তা ভুলবার নয়। অবসর জীবনে ঘড়ির কাঁটা ধরে সকাল ঠিক সাড়ে আটটায় ব্রেকফাস্ট নিয়ে বসেন তিনি, অনেক বছর পর আজ সেই নিয়ম ভাঙলেন ওদের সম্মানে। গোসল, দাড়ি কামানো ইত্যাদি সেরে ওরা যখন সাড়ে দশটায় ডাইনিংরুমে এল, রাজকীয় ব্রেকফাস্ট নিয়ে তখনও ওদের জন্যে অপেক্ষা করছেন বুড়ো জেনারেল।

এরপর লাঞ্চ পর্যন্ত বাকি সময়টা জেনারেলের সাথে কাটায় ওরা। প্রাসাদটা ঘুরে-ফিরে দেখার সময় ওরা আবিষ্কার করলো,

এটা একটা মিউজিয়ামও বটে। জেনারেলের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় বহু কিছু রয়েছে। নরখাদক আফ্রিকান উপজাতীয়দের মাথার খুলি থেকে শুরু করে হরপ্পায় পাওয়া মাটির পুতুল, সব আছে। জেনারেল ভাল একজন শিকারীও বটেন, স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে হরিণের শিং, হাতির দাঁত, রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ছাল ইত্যাদি রেখে দিয়েছেন। রয়েল বেঙ্গল টাইগারের চামড়া? জেনারেল কি তাহলে শিকার করতে বাংলাদেশেও গিয়েছিলেন? স্মিত হেসে মাথা ঝাঁকালেন বুড়ো। বললেন, সে অনেক বছর আগের কথা।

লাঞ্চের পর ওদেরকে জোরজার করে ঘুমাতে পাঠালেন তিনি। বললেন, 'আজও তো রাত জাগতে হবে।'

তারপর ডিনার শেষ করে এই আবার বসেছে ওরা। উর্দি পরা একজন বাটলার এইমাত্র সবাইকে এক কাপ করে কফি দিয়ে গেল। কফির কাপে প্রথম চুমুক দিয়ে চুরুটের রহস্য জানতে চেয়ে জেনারেলকে প্রশ্নটা করেছে সোহেল।

'কেউ লণ্ডনে এলেই তার হাতে রাহাত এক বাক্স চুরুট কেন পাঠায়, তাই না?' মুচকি একটু হাসলেন বুড়ো ম্যালোরি। একে একে ওদের তিনজনের দিকে তাকালেন। তারপর ধীরে ধীরে এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন তিনি। সংক্ষেপে বললেন, 'দুঃখিত।'

'দুঃখিত মানে?' অবাক হয়ে জানতে চাইলো সোহেল।

'এই চুরুট, পার্টিশনের আগেও তৈরি হতো কক্সবাজারে, কিন্তু তখনও এর নাম ছিল ডায়মণ্ড ব্র্যাণ্ড বার্মীজ চুরুট। সেনাবাহিনীতে আমাদের থাকার সময়ই এই চুরুট নিয়ে দারুণ মজার আর সেই সাথে রোমাঞ্চকর একটা ঘটনার সৃষ্টি হয়। সে আরেক

লম্বা কাহিনী।'

'তাতে কি? আপনি দুঃখ প্রকাশ করছেন কেন?'

'এই চুরুটের গল্পটাও তোমরা শুনতে চাইবে সেই ভয়ে।'

সবাই হেসে উঠলো। কিন্তু এরপর জেনারেল ম্যালোরি ডায়মণ্ড ব্র্যাণ্ড বার্মীজ চুরুট সম্পর্কে আর একটি কথাও মুখে আনলেন না।

কফি শেষ হয়নি, তিনি জানতে চাইলেন, 'কোথায় যেন শেষ করেছিলাম কাল?'

সাথে সাথে মনে করিয়ে দিল সোহানা, 'জার্ভোস গালফে ইটালিয়ান মাইন দেখা গেছে।'

'ঠিক,' বললেন জেনারেল। তারপর শুরু করলেন তিনি।

দুই

পোর্ট সাইডে কাত হয়ে পড়েছে গ্রীক ফেরী টাটরা, অনিশ্চিত ভোঁতা আওয়াজ করছে তার ইঞ্জিন। ইতিমধ্যে নব্বই ডিগ্রী বাঁক নিতে শুরু করেছে জাহাজ, ইনশোরে পৌঁছুতে এটাই তার শেষ বাঁক। দূরে দেখা যাচ্ছে কাটায়রার ল্যাণ্ডিং-স্টেজের আলোক-

মালা। ঠিক এই পরিস্থিতিতে, ভোর ঠিক পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে, ঘটলো বিস্ফোরণ।

তার আগে, ব্রিজে, ক্যাপ্টেন মোপাস্তুর পিছনে দাঁড়িয়ে কর্নেল ব্রিজেলবার্ড ভাবছিল, এই তো, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাবো। কিন্তু পরমুহূর্তে তার মনে সন্দেহ জাগলো, এই শেষ এক মাইল পেরোনো আদৌ কি কপালে আছে? দশ কিলোগ্রাম ডিমোলিশন চার্জ এখনও পাওয়া যায়নি। যে-কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরিত হতে পারে সেটা। তার ওপর, ইটালিয়ান মাইন বিজবিজ করছে সাগরে। ফকার আর মোপাস্তুর অনুরোধ মেনে নিতে হয়েছে ব্রিজেলবার্ডকে, টাটরা এখন আগের চেয়েও মন্থর গতিতে এগোচ্ছে। ওদিকে সশস্ত্র গ্রীক পাপাগোপালাকে নিয়ে আরেক দুশ্চিন্তা, জাহাজের কোথায় যে সে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে, এত খোঁজাখুঁজি করেও সেটা জানা গেল না।

সারি সারি ইটালিয়ান মাইন ঘিরে আছে জাহাজটাকে, সেদিকে গ্লাস তুলে ফোকাস অ্যাডজাস্ট করলো ব্রিজেলবার্ড। অনেকেই রয়েছে ব্রিজে, এইমাত্র আরও একদল ঢুকলো। ইচ্ছে করেই সেদিকে খেয়াল দিল না সে। কারা এসেছে, জানে। পরিস্থিতি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে বলে ব্রিটিশ বন্দীদেরকে নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছিল সে।

'আমরা কি জাহাজ ত্যাগ করছি?' শান্তভাবে জানতে চাইলো সেকেণ্ড-লেফটেন্যান্ট ম্যালোরি।

'না!' ম্যালোরির কনুই ধরে তাকে ব্রিজের পিছন দিকের দেয়ালের কাছে টেনে নিয়ে গেল লেফটেন্যান্ট মুলার। 'একটু পরই তীরে ভিড়বে জাহাজ।'

'এর ভেতর দিয়ে ?' অবিশ্বাসের সুরে, অনেকটা আপনমনেই বললো ব্রিটিশ স্টাফ-সার্জেন্ট গ্রীণ। কর্নেল ব্রিজেলবার্ডের কাঁধের ওপর দিয়ে, অন্ধকার ভেদ করা উজ্জ্বল সার্চলাইটের আলো অনুসরণ করে সাগরের দিকে তাকিয়ে আছে সে। পোর্ট এবং স্টারবোর্ড সাইড যতটুকু উদ্ভাসিত হয়ে আছে আলোয়, ওই অল্প পরিসরের ভেতরই চারটে মাইন দেখা গেল। ক্ষুদে এক একটা গম্বুজের মতো পানিতে ভাসছে ওগুলো, গায়ে ছায়ার মতো দেখালো নজলগুলোকে। কিছু একটার সাথে ধাক্কা লাগতে যা দেরি, সাথে সাথে বিস্ফোরণ ঘটবে।

আড়চোখে মুলারের দিকে তাকালো ব্রিজেলবার্ড, ঠোঁটের কোণ নেড়ে নিচু গলায় তাকে নির্দেশ দিল, হারানো ডিমোলিশন চার্জের কথা ইংরেজ বন্দীদের জানাও। ওরাও তো সোলজার, পরিস্থিতিটা বুঝতে পারবে সহজেই। চোখে-মুখে উৎসাহ ফুটিয়ে তুলে মুলারের কথা সব শুনলো ম্যালোরি আর গ্রীণ। ব্রিজে কয়েকজন অ্যালপেনকরপস সৈনিক রয়েছে। আর রয়েছে সেই সিভিলিয়ান জার্মানটা, ইস্তাম্বুল থেকে জাহাজে উঠেছিল। মাঝারি আকারের লোক, কিন্তু তার চেহারা, আচার-আচরণ দেখে মনে হয় একটা পাথুরে পাহাড়। পাহাড় না বলে, আগ্নেয়গিরি বলাই ভাল—সারাক্ষণ চুরুটের ধোঁয়া উদ্গীরণ করছে।

'উনি ?' মুলারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানতে চাইলো ম্যালোরি।

'হের মেয়র অ্যাবওয়েরে আছেন,' মুলারের গলার সুরে শ্রদ্ধার একটা ভাব ফুটে উঠলো। ম্যালোরি দেখলো, নতুন একটা চুরুট ধরাচ্ছে মেয়র, ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্যে পাশে দাঁড়ানো

একজন কর্পোরালের কাঁধে কনুই রাখলো সে। চুরুট ধরিয়ে সামান্য একটু ঘাড় ফিরিয়ে সরাসরি তাকালো ম্যালোরির চোখে।

লোকটার কালো চোখের মণির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ম্যালোরির সারা শরীরে অদ্ভুত একটা অস্বস্তির ঢেউ বয়ে গেল। তাকিয়ে থাকতে পারলো না, অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল চোখ। নিচু গলায় কি যেন বলছে গ্রীণ, সেদিকে মন দিল সে।

'হড়বড় করে কি বললো, সব বুঝলাম না। ডিমোলিশন চার্জটা কত বড় ?'

'দশ কিলোগ্রাম। খারাপ ?'

'ভাল নয়। বয়লারের কাছে কোথাও যদি ফিট করা হয়ে থাকে, আর···

ব্রিজের দরজায় মেজর হেফনারকে দেখেই চড়া গলায় দ্রুত নির্দেশ দিতে শুরু করলো ব্রিজেলবার্ড, তার কথা শেষ হতেই আবার ছুটে চলে গেল হেফনার। তীরে নামার সময় ঘনিয়ে আসছে, কাজেই সবদিকে শৃংখলা বজায় রাখা দরকার। এক লাইনে সিঁড়ি বেয়ে ডেকে উঠে আসতে শুরু করলো সৈনিকরা। কেউ কিছু বলছে না, কিন্তু তাদের চেহারা দেখে বোঝা যায়, সবাই আতংকিত। ওদেরকে সামলাতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেল মেজর হেফনার। সৈনিকদের পিঠে রাকস্যাকের পাশে স্কি দেখে ম্যালোরি বুঝলো, পেনিনস্যুলার শেষ প্রান্তে, মাউন্ট জার্ভো-সের গভীর বরফে অপারেশন চালাবে ওরা। যা ভেবেছিল, তাই। সন্ন্যাসীদের আশ্রম দখল করতে যাচ্ছে জার্মান অ্যালপেনকরপ্‌স্। ওখান থেকে মেইনল্যাণ্ড রোডটা পরিষ্কার দেখা যায়। ওই রোড

ধরেই মিত্রপক্ষের সাপ্লাই যায় উত্তর দিকে।

'বোমাটা এখনও না ফাটার কারণ কি?' নিচু গলায় গ্রীণকে জিজ্ঞেস করলো ম্যালোরি। 'যে ওটা ফিট করেছে সে হয়তো আনাড়ি, জানেই না কিভাবে কি করতে হয়।'

'হয়তো। কিন্তু ওদের টাইম-ফিউজ মোটেও বিশ্বস্ত নয়, স্যার,' জানালো গ্রীণ। 'বন্দী একজন জার্মানের মুখে শুনেছিলাম। ফাটার যখন কথা নয়, ঠিক সেই সময় ফেটে যাবার একটা প্রবণতা আছে।'

'বলতে চাইছো, মাঝে মধ্যে অকেজো হয়ে যায় ওগুলো?'

'না, তা আমি বলিনি, স্যার। মাঝে মধ্যে অচল হয়ে যায়, কিন্তু তারপর আবার চালুও হয়, আপনা থেকেই। ইঞ্জিন চালু রয়েছে বলে জাহাজ কাঁপছে, তাই না? এই কাঁপুনি ওটাকে অচল করে দিতে পারে, আবার যখন ইচ্ছে চালুও করে দিতে পারে।'

গা ছম ছম করতে লাগলো ম্যালোরির। গ্রীণের হাবভাব ভাল ঠেকলো না তার। সার্জেন্ট একজন দুঃসাহসী অ্যামুনিশন এগজামিনার। সব ধরনের বিপজ্জনক বিস্ফোরক নাড়াচাড়া করে অভ্যস্ত সে। বাঁ হাতে ডান কানের লতি ধরে ঘন ঘন ডলছে সেটাকে, খুব নার্ভাস না হলে এটা তাকে করতে দেখা যায় না। মস্ত একটা ঢোক গিলে জাহাজের এদিক-ওদিক তাকালো সে, যেন যে-কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরণ আশংকা করছে।

'স্ট্র্যাপ বাঁধো!' ব্রিজ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল মুলার, ভেতরে ঢুকে ম্যালোরির লাইফ-জ্যাকেট ঢিলে দেখে নির্দেশ দিল সে। ব্রিজে সবাই লাইফ-জ্যাকেট পরে থাকায় ভেতরে জায়গার খুব

অভাব দেখা দিয়েছে, চলাচল করা মুশকিল। মাথা ঘুরিয়ে আবার পিছনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো ম্যালোরি, স্টার্ণের ওদিকের পুরোটা ডেক চোখে পড়লো। খোলা ডেকে কেউ বেরোবে না, এই নির্দেশ এখনও বলবৎ থাকায় কেউ নেই সেখানে। আরে! হঠাৎ আবছাভাবে একটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেয়ে ভুরু কুঁচকে উঠলো তার। স্টারবোর্ড রেইলের কাছে একটা ল্যাম্প জ্বলছে, সাগর থেকে উঠে আসা কুয়াশায় ঝাপসা দেখালো ল্যাম্পের আলো। ল্যাম্পের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কে ও? একটু বেঁটেই বলা যায়, কিন্তু গাঁট্টাগোঁট্টা, রেলিঙের ওদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদিকে কেন? পিঠে ওটাই বা কি ঝুলছে? হ্যাঁ, রাইফেল! সেই গ্রীক সিভিলিয়ানটা না? যে ইস্তাম্বুল থেকে জাহাজে চড়েছিল? কোনো সন্দেহ নেই! পাপাগোপালা! কুয়াশায় ঢাকা পড়ে গেল মূর্তিটা। আবার যখন দৃষ্টিসীমা প্রসারিত হলো, রেলিঙের ওধারে কাউকে দেখলো না ম্যালোরি।

'এক সেকেণ্ড আগে আপনিও বোধহয় আমার মতো একটা ভূত দেখেছেন, তাই না, স্যার?' অস্ফুট কণ্ঠে জানতে চাইলো গ্রীণ।

ম্যালোরিও ফিসফিস করে বললো, 'কোথায়? কি বলছো?' পরিষ্কার বুঝলো ম্যালোরি, শেষ মুহূর্তে জানালা দিয়ে অ্যাবওয়ের অফিসার মেয়রও বাইরে তাকিয়েছিল। পাপাগোপালাকে দেখতে পেয়েছে কিনা ঠিক বোঝা গেল না। বোধহয় পায়নি, পেলে হৈ-চৈ বাধিয়ে দিত। মেয়রকে চুপ করে থাকতে দেখে মনে মনে পরম স্বস্তি বোধ করলো সে। আড়চোখে আরেকবার তাকালো অ্যাবওয়ের অফিসারের দিকে। চুরুট টানছে আর ধোঁয়া ছাড়ছে।

পাপাগোপালা তাহলে লাফ দিয়ে সাগরে পড়েছে, ভাবলো ম্যালোরি। কিন্তু তীরে পৌঁছুতে পারবে কি? পানির ওপর মাথা তুলে ভেসে থাকা মাইনগুলো চোখের সামনে দেখতে পেল সে, তার ভেতর দিয়ে সাবধানে সাঁতার কেটে তীরের দিকে এগোচ্ছে পাপাগোপালা। নিজের অজান্তেই শিউরে উঠলো ম্যালোরি।

ব্রিজের ভেতর গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। কেউ কোনো কথা বলছে না। কোনো অফিসার বা এন. সি. ও. এলে তাকে নির্দেশ দিয়ে দরজার কাছ থেকেই ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছে কর্নেল ব্রিজেলবার্ড।

পুবদিকে বাঁক নিতে শুরু করলো টাটরা।

সাদা কুয়াশার ভেতর ঢুকে গেল জাহাজের বো। চওড়া একটা সেতুর মতো সাগরের ওপর ভেসে রয়েছে কুয়াশা। সিভিলিয়ান রেনকোট খুলতে খুলতে দাঁতে দাঁত চাপলো ব্রিজেলবার্ড। তীরের কাছাকাছি এসেও বাধা! তার পাশে মোমের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে গ্রীক ক্যাপ্টেন মোপাসু। চোখ দু'টো তীক্ষ্ণ, কুয়াশা ভেদ করে কিছু দেখার চেষ্টা করছে। হুইলের ওপর সেই যে ঝুঁকেছে ফকার, তারপর মুহূর্তের জন্যেও সিধে হয়নি সে। মাঝেমধ্যে স্টারবোর্ডের দিকে তাকাচ্ছে। ওদিকে একটা মাইন হাবুডুবু খাচ্ছে পানিতে, খোলের কাছ থেকে খুব বেশি হলে পঞ্চাশ মিটার দূরে।

পিছনে দাঁড়িয়ে চারদিকে দৃষ্টি বুলাচ্ছে ম্যালোরি। ওর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকজন অ্যালপেনকরপস্ সৈনিক। তাদের টান টান মুখের চামড়ায় ঘাম চকচক করছে। কেউ কেউ রাইফেল আর মেশিন-পিস্তল এত জোরে চেপে ধরেছে, সাদা হয়ে গেছে

নখের ডগা। কারও চোখের পাতা হঠাৎ কেঁপে উঠলো, কারও কপালের পাশে লাফিয়ে উঠলো একটা শিরা। গোটা জাহাজে একজন সৈনিকও স্বস্তি বোধ করছে না, সবাই নার্ভাস হয়ে পড়েছে। ওরা জানে, আর কিছুক্ষণ পর সকাল হবে। সেই সাথে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে কাজে। কিন্তু তার আগেই হঠাৎ করে নিভে যেতে পারে জীবনের আলো। তীরে পৌঁছুতে সামান্য যে-পথটুকু আর পেরোতে হবে, সেটাই সবচেয়ে বিপজ্জনক। যে দিকে তাকাও, শুধু মাইন আর মাইন। তার ওপর, দশ কিলোগ্রাম ডিমোলিশন চার্জের কথাও তারা ভুলতে পারছে না। এখনও যে কেন ওটা ফাটেনি, সেটাই আশ্চর্য। কিন্তু এখনও ফাটেনি বলে ওটা যে এক সেকেণ্ড বা দশ মিনিট পর ফাটবে না, তা নয়। হয়তো টিক টিক করে জিরো আওয়ারের দিকে এগিয়ে চলেছে টাইম-ফিউজ।

ডান দিকে তাকালো ম্যালোরি। অ্যাবওয়ের অফিসার মেয়-রকে মূর্তিমান একটা বিস্ময় বলে মনে হলো ওর। গোটা জাহাজে কেউ যদি নিরুদ্বিগ্ন, নির্লিপ্ত আর নির্বিকার থাকে তো সে এই লোক। লোকটার স্নায়ু কি ইস্পাত দিয়ে তৈরি? এই পরিস্থি-তিতে একজন রক্ত মাংসের মানুষ কিভাবে সম্পূর্ণ শান্ত থাকতে পারে? যেভাবে আয়েশ করে চুরুট ফুঁকছে, যেন সাগর-ভ্রমণে বেরিয়েছে লোকটা।

ম্যালোরি ওর দিকে তাকিয়ে আছে অনুভব করে ঘাড় ফেরালো মেজর রাহাত। তার চোখের দৃষ্টির সামনে অস্বস্তি বোধ করলো ম্যালোরি, মনে হলো অ্যাবওয়ের অফিসার ওর চরিত্র এবং প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করছে, গুরুতর বিপদের সময় ওর আচরণ কি হবে তার যেন একটা আন্দাজ পেতে চায়।

'খুব বেশি হলে আধঘণ্টা,' ফিসফিস করে বললো গ্রীণ।

'আরও কম,' বললো ম্যালোরি। 'কিন্তু আদৌ কি আমরা তীরে পৌঁছুতে পারবো?' কিছুক্ষণের জন্যে সরে গেছে কুয়াশা, তীরের দিকে তাকাতেই ল্যাণ্ডিং-স্টেজের আলো আগের চেয়ে অনেক কাছে দেখতে পেল ও। পেনিনস্যুলার পুব দিকে, একেবারে শেষ প্রান্তেও আলোর আভাস দেখা গেল। রিস্টওয়াচ দেখলো ও, কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ। কোর্স সোজা করে নেবার জন্যে হুইল ঘোরাচ্ছে ফকার। মোপাস্যুর কাছ থেকে পরামর্শ পেয়ে এইমাত্র ফকারকে নির্দেশ দেয়া শেষ করেছে কর্নেল ব্রিজেলবার্ড। অ্যাবওয়েয়র অফিসার মাথা একটু নিচু করে চোখে রাজ্যের সন্দেহ নিয়ে তাকিয়ে আছে তার জ্বলন্ত চুরুটের লাল আগুনটার দিকে। একজন সৈনিক স্যাঁতসেঁতে ভাবটা মোছার জন্যে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপাল ঘষলো। দ্রুত, অস্থির দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছে গ্রীণ—চারদিকে যা ঘটছে সব যেন একই সাথে দেখতে চায় সে। ঠিক এই সময় বিস্ফোরণ ঘটলো।

মাত্র একটা শব্দ হলো বিস্ফোরণের, কিন্তু মনে হলো একসাথে গোটা পঞ্চাশেক বাজ পড়লো টাটরার ওপর। লেজ থেকে মাথা পর্যন্ত ঝাঁকি খেলো জাহাজ, তারপর হাবুডুবু খাবার ভঙ্গিতে টলমল টলমল করতে শুরু করলো। জাহাজের গা থেকে মস্ত একটা ঢেউ ছুটে গেল তীরের দিকে, যাবার পথে শরীরে আরও পানি চড়িয়ে বিশাল হয়ে উঠলো সেটা। কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে স্টারবোর্ডের দিকটা দিনের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, সেদিকে যারা তাকিয়ে ছিল সবার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। ব্রিজের খোলা দরজার ওদিক থেকে আতংকিত সৈনিকদের গলা আর ডেকের ওপর

পেরেক-আঁটা জুতোর খটাখট আওয়াজ ভেসে এল। ব্রিজের ভেতরও ফিসফাস গুঞ্জন শোনা গেল। বাঘের মতো গর্জে উঠলো ব্রিজেলবার্ড। সাথে সাথে থেমে গেল সবাই। স্টারবোর্ডের দিকের জানালায় ঝুঁকে বাইরেটা দেখছিল মোপাস্থ, তাকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিয়ে নিজে ঝুঁকে পড়লো কর্নেল। সাগর যেন উন্মাদ হয়ে গেছে, চারদিকে উত্তাল আলোড়ন। মুহূর্তের জন্যে কর্নেলের মনে হলো, পানির ভেতর দিয়ে ছুটে এসে একটা টর্পেডো আঘাত করেছে টাটরাকে, এখন পানির ওপর মাথা চাড়া দিতে যাচ্ছে একটা সাবমেরিন। তারপর লক্ষ্য করলো, ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসছে পানি। এতকিছু ঘটে গেল, ফকার কিন্তু টাটরাকে কোর্স থেকে সরে যেতে দেয়নি। অন্ধকারে ধীরে ধীরে কাছে সরে আসছে ল্যাণ্ডিং-স্টেজের আলো। কর্নেলের দিকে না তাকিয়ে মুখ খুললো সে, 'জাহাজের একেবারে গায়ের কাছে ফেটেছে মাইনটা।'

'ওটা একটা মাইন, স্রেফ একটা মাইন···আমাদেরকে লাগেনি···' আতংক দূর করার জন্যে প্রথমে জার্মান, তারপর ইংরেজীতে চিৎকার করে বললো লেফটেন্যান্ট মুলার।

নিচু গলায় বললো গ্রীণ, 'এতেও যদি ওটা সচল না হয়, আর কিসে হবে?'

'ওটা?' বিস্ফোরণের ধাক্কাটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি ম্যালোরি।

'ডিমোলিশন চার্জের টাইম-ফিউজ,' বললো গ্রীণ। বিস্ফোরক নিয়ে কথা বলতে ভালবাসে সে, বিষয়টার কথা সহজে ভুলতে পারে না। 'ধরে নিচ্ছি, কোনো কারণে টাইম-ফিউজ বন্ধ হয়ে

গিয়েছিল। এই যে ধাক্কাটা খেলো, আবার সেটা চালু না হয়েই পারে না।'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ ছেড়ে ব্রিজ থেকে বেরিয়ে গেল ব্রিজেল-বার্ড।

'মাইনটা ফাটলো কেন?' জানতে চাইলো ম্যালোরি। 'জাহাজ ওটাকে টোকা দেয়নি···'

'কিছুর সাথে ধাক্কা না খেলেও মাইন ফাটতে পারে···'

'সে কি!'

'এক্ষেত্রে ঠিক কি ঘটেছে তা অবশ্য বলা মুশকিল,' তাড়াতাড়ি বললো গ্রীণ। 'জাহাজ টাটরা ছাড়াও পানিতে আরও অনেক কিছু আছে। একটা কিছুর সাথে ধাক্কা লেগে থাকতে পারে।'

একটু অসুস্থ বোধ করলো ম্যালোরি। চোখের সামনে ভেসে উঠলো গ্রীক সিভিলিয়ান পাপাগোপালার চেহারা, তীরে পৌঁছুবার জন্যে প্রাণপণে সাঁতরাচ্ছে। তার পিঠে আটকানো রাইফেলটার মাজল নেমে গেছে পানির ভেতর, কিন্তু সে দিকে পাপাগোপালার কোনো খেয়াল নেই। চারদিকে মাইন ভাসছে, খুব সাবধানে এগোচ্ছে সে। এই সময় রাইফেলের মাজলের ডগায় ধাক্কা খেলো একটা মাইন। কি হলো জানারও সুযোগ পাবে না বেচারা, সাগরের পানিতে চিরকালের জন্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তার শরীর। একটা মাইন গোটা জাহাজের খোল গায়েব করে দিতে পারে, সে মাইন একজন মানুষের কি অবস্থা করতে পারে···চিন্তায় বাধা পড়লো।

'আওয়াজটা ভায়াদের পিলে চমকে দিয়েছে,' ফিসফিস করে বললো গ্রীণ।

পিছনের জানালা দিয়ে নিচের ডেকে তাকালো ম্যালোরি। মেলা গোলমাল বেধে গেছে ওখানে। ফুল ইউনিফর্ম পরা অ্যাল-পেনকরপ্স্ সৈনিকরা গায়ে গা ঠেকিয়ে ভিড় করে আছে রেলিঙের কাছে, এইমাত্র গরু-ছাগলের মতো খেদিয়ে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে তাদেরকে। প্রকাণ্ডদেহী ফ্র্যাংক আবার তাদেরকে আড়ালে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। সৈনিকরা শুধু যে অসন্তুষ্ট হয়েছে তাই নয়, ফ্র্যাংকের নির্দেশ তারা ঠিক বুঝতেও পারছে না। এই নিয়ে গণ্ডগোল। তবে লেফটেন্যান্ট মুলারের ইঙ্গিতে কাজ হলো, সৈনিকরা দলবেঁধে শেলটারের দিকে ছুটলো। দেখতে দেখতে খালি হয়ে গেল খোলা ডেক। মুলারকে পিছনে নিয়ে ব্রিজে ফিরে এল ব্রিজেলবার্ড। মনটা তিক্ততায় ভরে গেছে তার। আর কেউ না বুঝলেও, এই বিস্ফোরণ কতটা ক্ষতি করেছে সে-ব্যাপারে তার মনে কোনো ভুল ধারণা নেই। সৈনিকদের মনোবলের ওপর এই বিস্ফোরণ প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। মাটিতে পা ফেলে হাঁটার সময় ঘটনাটা ঘটলে হয়তো ওদের মনে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়াই হতো না। কিন্তু অপরিচিত সাগরে ভেসে থাকা অবস্থায় এই বিস্ফোরণ তাদের জন্যে একটা ভয়ংকর অভি-জ্ঞতা হয়ে দেখা দিয়েছে।

সার্চলাইটের আলোর দিকে তাকালো ব্রিজেলবার্ড। প্রতি মুহূর্তে সামনের অন্ধকার পানি আলোকিত হয়ে উঠছে, সেই সাথে আত্মপ্রকাশ করছে নতুন নতুন অসংখ্য মাইন। এই মুহূর্তে কারও প্রশংসা করতে হলে সবাই এক বাক্যে ফকারের নাম বলবে। টাটরা যে পথ ধরে এগোচ্ছে সেই পথের ওপর একটা মাইন যদি থেকে যায়, সেটা যদি ওর চোখে ধরা না পড়ে, এবং সময়মতো

যদি কোর্স চেঞ্জ করা না হয়, জাহাজডুবি কেউ ঠেকাতে পারবে না। এতগুলো লোকের প্রাণ, এই অতি গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের প্রাথমিক সাফল্য, সব নির্ভর করছে তার দক্ষতা, দৃষ্টিশক্তি আর দুরদর্শিতার ওপর।

ডেকের নিচে লোকজন অস্থির, উত্তেজিত হয়ে আছে। তীরে নামার সময় কি না কি ঘটে, সেটা একটা দুশ্চিন্তা, আরেক দুশ্চিন্তা মাইনের সাথে এই বুঝি ধাক্কা খেলো জাহাজ! কিংবা, এই বুঝি ফেটে গেল চুরি যাওয়া ডিমোলিশন চার্জ।

ইঞ্জিনের আওয়াজ একঘেয়ে, বিরক্তিকর লাগছে। গতি একেবারে মন্থর, যেন স্রোতের সাথে অলসভঙ্গিতে ভেসে চলেছে টাটরা। ল্যাণ্ডিং-স্টেজের দু'পাশে গভীর কালো ছায়া মতো দেখা গেল। ক্রমশ কাছে চলে আসছে উপকূল রেখা।

চেহারায় দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের ভাব ফুটিয়ে রাখলেও, টাটরার এই মন্থর গতি লক্ষ্য করে নিদারুণ হতাশায় ভুগছে কর্নেল ব্রিজেলবার্ড। এরই মধ্যে টাইম-টেবল থেকে প্রায় ত্রিশ মিনিট পিছিয়ে পড়েছে সে। মনে মনে প্রার্থনা করছে পাঁচটা পঁয়তাল্লিশে জার্মান বাহিনী যে ব্যাপক আক্রমণ চালিয়েছে সেটার খবর নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে বাতাসে ছড়াতে শুরু করেনি। গ্রীস এবং যুগোশ্লাভিয়ার ওপর হামলা চালিয়েছে প্যানজার, তাকে সহায়তা করছে বিমান বাহিনী। দুনিয়ার লোক এই ঘটনার কথা অন্তত দু'ঘন্টা পরে জানুক, প্রার্থনা করলো সে। এই দু'ঘন্টার ভেতর সে তার কাজ নির্বাধায় সেরে নিতে পারবে। মিত্রপক্ষ কিছু টের পাবার আগেই পেনিনস্যূলা ধরে বিদ্যুৎগতিতে পিছন দিকে সরে গিয়ে আশ্রমটা দখল করতে পারার মধ্যেই রয়েছে তার এই অভিযানের সাফল্য।

পথে যদি কোনো বাধা না পড়ে, এবং নিরাপদে যদি তীরে ভেড়া যায়, তাহলেই হলো। ভোর রাতের হিম বাতাস ইউনিফর্ম ভেদ করে গায়ে লাগলো, ঠাণ্ডায় কাঁপুনি ধরে গেল তার। এই সময় তার পাশে এসে দাঁড়ালো ল্যাবওয়ের অফিসার।

'মাইনের আওয়াজ কাটায়রা থেকে নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছে ওরা,' বললো রাহাত।

'কাদের কথা বলছেন?' সাবধানে জানতে চাইলো ব্রিজেল-বার্ড।

'বোকার মতো প্রশ্ন করবেন না,' শান্ত কিন্তু ধমকের সুরে বললো রাহাত। 'কাটায়রায় কারা থাকে তা আপনার ভালোই জানা আছে।'

'ও, আপনি স্থানীয় লোকজনদের কথা বলছেন! হ্যাঁ, আও-য়াজটা তারা শুনেছে বৈকি।'

'ওখান থেকে কেউ যদি সালোনিকায় ফোন করে দেয়?'

হাসি চেপে চেহারা আরও গম্ভীর করে তুললো ব্রিজেল-বার্ড। বললো, 'এসব খুঁটিনাটি ব্যাপারেও নজর রাখার ব্যবস্থা হয়েছে, কাজেই বিচলিত হবেন না।' এইটুকু বলে একটু থামলো সে। মনে মনে ভাবলো, তীরের কাছে তো পৌঁছেই গেছি, এখন মন খুলে কথা বলা যেতে পারে। 'পেনিনসুলা থেকে মাত্র একটা টেলিফোন লাইন বেরিয়ে গেছে, হের মেয়র। ঘণ্টা কয়েক আগেই সেটা কেটে দেয়া হয়েছে।'

'গুড,' বললো রাহাত। 'কিন্তু লাইনটা ডেড হয়ে গেল কেন সে-কথা ভেবে আশ্চর্য হতে পারে সালোনিকা।'

'প্রকৃতি আমাদের সাথে একটু-আধটু সহযোগিতাও করছে,'

গম্ভীর সুরে বললো ব্রিজেলবার্ড। 'সালোনিকা ধরে নেবে গত-রাতের ঝড়ই এর জন্যে দায়ী।'

'ট্র্যান্সপোর্ট ?' ব্রিজেলবার্ড থামতেই নতুন প্রসঙ্গে চলে গেল রাহাত। 'নিশ্চয়ই আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে ওখানে ?'

'পেনিনস্যূলায় খচ্চর আছে। সাথে করে নিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। তবে যোগাড় করা যাবে। খুঁটিনাটি সমস্ত ব্যাপার বিবেচনার মধ্যে রেখে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে প্ল্যানটা, কোথাও আমরা আটকাবো না। ট্র্যান্সপোর্টের ব্যাপারে খচ্চর ছাড়াও অন্য ব্যবস্থা হবে...' খাদে নামতে নামতে ব্রিজেলবার্ডের গলার আওয়াজ ক্রমশ থেমে গেল। গ্লাস তুলে ফোকাস অ্যাড-জাস্ট করলো সে। পোর্ট বোর কাছ থেকে মাত্র কয়েক মিটার দূরে একটা মাইন দেখা গেল। বিপদটাকে এড়াবার জন্যে এরই মধ্যে কোর্স বদল করতে শুরু করেছে জাহাজ।

'এবং, আপনি কোনোরকম বাধা আশা করছেন না ?' ব্রিজে যত উত্তেজনাই থাক, নিরুদ্বিগ্ন রাহাতকে যেন সেটা স্পর্শই করেনি। কর্নেলের জবাব ভাল করে শুনতে পাবার জন্যে তার দিকে মাথা একটু কাত করলো ও।

'কেউ থাকলে তো বাধা দেবে! জনাকয়েক জেলে আছে, তাদেরকে গোণার মধ্যে ধরি না।'

'দু'জন পুলিশ আছে,' বললো রাহাত। 'কিংবা, আমি যখন শেষবার এসেছিলাম, তখন ছিল।'

'থাকলেও, তাদেরকে সামলানো কোনো ব্যাপারই নয়। আমাদের সাথে আপনিও তো তীরে যাচ্ছেন, নিজের চোখেই সব দেখতে পাবেন।'

'তা বটে!' বলে ব্রিজের ভেতর দাঁড়ানো অ্যালপেনকরপ্স্ সৈনিকদের দিকে মুখ ফেরালো সে। নিরেট পাথরের মতো চেহারা এক একজনের। ঠোঁট জোড়া পরস্পরের সাথে সজোরে চেপে রেখেছে। ম্যালোরির সাথেও চোখাচোখি হলো। অদ্ভুত কৌতূহলী দৃষ্টিতে রাহাতের দিকে তাকিয়ে আছে সে। 'আমার কাছে ল্যুগার আছে,' ব্রিজেলবার্ডকে বললো সে। 'কিছু যদি ঘটেই...'

'গোলাগুলি হতে পারবে না!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললো ব্রিজেল-বার্ড, এই প্রথম সরাসরি অ্যাবওয়েরের অফিসারের দিকে তাকালো সে। 'আমার লোকদের কড়া নির্দেশ দেয়া আছে, তীরে নামার সময় ভুলেও কেউ একটা গুলি ছুঁড়তে পারবে না। কাউকে চমকে দেয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের প্রথম কাজ হবে গ্রামের উত্তর প্রান্তে একটা রোড-ব্লক তৈরি করা। ট্রুপসের প্রথম যে দলটা তীরে নামবে এটা তাদের কাজ'

'কখন আপনি আশ্রম দখল করতে পারবেন বলে মনে করেন?'

'আশ্রমের ব্যাপারে আমরা আগ্রহী, কে বলেছে এ-কথা, হের মেয়র? এটা আমরা একটা যুদ্ধ করছি, ধর্ম প্রচার করতে বেরোইনি।' ছোট্ট কিন্তু অনলবর্ষী ভাষণটা শেষ করে মুখ ফিরিয়ে ল্যাণ্ডিং-স্টেজের দিকে তাকালো ব্রিজেলবার্ড, সমস্ত মনোযোগ আরোপ করলো একটা ল্যাম্পের ওপর, ইতিমধ্যে এত কাছে চলে এসেছে সেটা, পাথুরে জেটির শেষ মাথায় তার পিলারটা আবছাভাবে দেখতে পাওয়া গেল। ল্যাম্পের নিচে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। আন্দাজ করতে অসুবিধে হয় না, বিস্ফোরণের

আওয়াজে ঘুম ভেঙেছে ওদের। কি ঘটেছে জানার জন্যে জেটিতে এসে অপেক্ষা করছে। বিস্ময়ের মহা একটা ধাক্কা খাবে ওরা, ভাবলো ব্রিজেলবার্ড। চোখের কোণ দিয়ে দেখলো, ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগোচ্ছে অ্যাবওয়েরর অফিসার। ওই যাচ্ছে, মনে মনে ভাবলো সে, নিশ্চয়ই আমাদের ল্যাণ্ডিং অ্যারেঞ্জমেন্ট চেক করার মতলব, যাতে ক্যানারিসের কাছে রিপোর্ট করার সময় এ-বিষয়েও কিছু লিখতে পারে। সে যাই হোক, পেনিনস্যুলা সম্পর্কে জ্ঞান আছে লোকটার, সেটা কাজে লাগানো যেতে পারে। রাহাত বেরিয়ে যেতেই ব্রিজের খোলা দরজায় দেখা গেল মুলার-কে। খানিক আগে নিচে নেমে গিয়েছিল সে।

'পাপাগোপালাকে যারা খুঁজছে তাদেরকে ডেকে নাও, তীরে নামার জন্যে তৈরি করো ওদের,' মুলারকে বললো ব্রিজেলবার্ড। 'ডিমোলিশন চার্জের কোনো খবর?'

'নেই, স্যার। এখনও খুঁজছি আমরা…'

'ইঞ্জিনরুম ছাড়া আর সবখান থেকে তল্লাশি উঠিয়ে নাও। পাপাগোপালার কোনো খবর?'

'কোথাও তাকে দেখা যায়নি, স্যার।'

ধীরে ডান হাত থেকে দস্তানাটা খুলে ফেললো ব্রিজেলবার্ড। 'পাপাগোপালা এখন আর কোনো ব্যাপার নয়। জাহাজ পাহারা দেবার জন্যে যারা থেকে যাবে তারাই তল্লাশি চালাবে।' জাহাজ পাহারা দেয়া, এটাও প্ল্যানের একটা ক্ষুদে অংশ। জাহাজ নিয়ে কেউ যদি পালিয়ে গিয়ে গালফের ওপারে ব্রিটিশদের খবর পৌঁছে দেয়, সর্বনাশের আর কিছু বাকি থাকবে না। রিস্টওয়াচ দেখলো ব্রিজেলবার্ড। পাঁচটা পঞ্চান্ন। হ্যাঁ, ত্রিশ মিনিট দেরি হয়ে গেছে

তাদের। ঠিক ভোরের আলো ফোটার সময় তীরে নামবে ওরা। ঠাণ্ডা ম্লান আলোর আভাস এরই মধ্যে ধরা পড়ছে চোখে, আবছাভাবে নিচু পাহাড়-সারির ছায়া ছায়া ভাবও লক্ষ্য করা গেল। পেনিনস্যুলার এদিকটা পাথুরে এলাকা, দক্ষিণ দিকে এক-টাই রাস্তা চলে গেছে পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে, তারপর সেই মালভূমিতে গিয়ে পড়েছে। এরপর যত এগোবে ততোই দুর্গম পার্বত্য এলাকা। গভীর খাদ, চোখা পাথর, দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়। সেই হাইটস অব জার্ভোস পর্যন্ত।

ব্রিজে ঢুকলো ফ্র্যাংক। রিপোর্ট করলো, তার সেকশন তীরে নামার জন্যে প্রস্তুত।

'ব্রিটিশ বন্দীদের দায়িত্ব থাকবে তোমার ওপর,' তাকে বললো ব্রিজেলবার্ড। আগেই ওদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে সে। পেনিনস্যুলার ভেতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে মাঝামাঝি কোথাও ছেড়ে যাওয়া হবে ম্যালোরি আর গ্রীণকে, যাতে পালাতে না পারে তার জন্যে পাহারার ব্যবস্থাও করা হবে। সালোনিকা থেকে পেনিনস্যুলার দিকে গ্রীক ইউনিট পাঠানো হতে পারে, তারা যাতে ওদেরকে পেয়ে সব কিছু জেনে না যায় সেজন্যেই এই ব্যবস্থা। এই অভিযান সম্পর্কে অনেক গুরুত্ব-পূর্ণ তথ্য জানে ওরা, সেগুলো অ্যালাইড ট্রুপসের কানে গেলে সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে।

'দেখেশুনে মনে হচ্ছে, ওরা বোধহয় উতরে যাবে,' নিচু গলায় বললো গ্রীণ।

'ওদের সাথে আমাদের ভাগ্যও আপাততঃ একসূতোয় গাঁথা,' মনে করিয়ে দিল ম্যালোরি। 'আচ্ছা, ডিমোলিশন চার্জটা সত্যি

কি ফাটবে না?'

'সময় এখনও ফুরিয়ে যায়নি, স্যার।'

ঠিক সামনেই একটা নিঃসঙ্গ মাইন ভাসছে, সেটাকে এড়াতে গিয়ে বিষম সংকটে পড়েছে ন্যাভাল অফিসার ফকার। মাইনটাকে পাশ কাটিয়ে যেতে হবে তার, পরমুহূর্তে জাহাজ ঘুরিয়ে নিয়ে ভিড়তে হবে জেটির পাশে।

উজ্জ্বল ল্যাম্পটা একেবারে কাছে চলে এসেছে। ব্রিজেলবার্ড দেখলো, নিচু একটা মাস্তুলের মাথায় আটকানো ওটা একটা লণ্ঠন, তার নিচে জড়োসড়ো হয়ে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। ব্রিজ থেকে বেশিরভাগ লোককে নেমে যাবার নির্দেশ দিল সে। বাকি যারা থাকলো সবাইকে ছায়ার মধ্যে সরে যেতে বললো। কর্নেল নিজেও সরে এল ছায়ায়। এই শেষ মাইনটা দেরি করিয়ে দিচ্ছে ওদেরকে, মনে মনে অস্থির হয়ে উঠলো সে। বাজ পড়া এই গ্রীক জাহাজ থেকে নিরাপদে তীরে নামতে পারলে মনে করবে চোদ্দপুরুষের পুণ্যের ফল। মাইনটা মিত্র ইটালিয়ানদের ফেলা, কিন্তু তা হলে কি হবে, ডিমোলিশন চার্জটাকে বিস্ফোরিত হবার সময় দিচ্ছে ওটা, কাজেই ওটাকে অভিশাপ দিতে শুরু করলো সে। মনে মনে প্রার্থনা করলো, এই শেষ মুহূর্তে টাইম-বোমাটা যেন বিস্ফোরিত না হয়। কিন্তু সেই সাথে ভাবলো যুদ্ধের সময় অপ্রত্যাশিত যা কিছু ঘটে সবই অমঙ্গল ডেকে নিয়ে আসে। ফিনল্যাণ্ডে যুদ্ধ করার সময় এই অভিজ্ঞতা হয়েছে তার, নরওয়েতেও...।

মোপাসুকে স্টারবোর্ড জানালার দিকে এগোতে দেখে দ্রুত নির্দেশ দিল সে, 'হুইলের কাছে থাকো!'

কিন্তু জানালার সামনে না পৌঁছে থামলো না মোপাসু। কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে, কর্নেলের চোখে সরাসরি তাকালো সে। বললো, 'আমাকে দেখতে না পেলে ওদের মনে সন্দেহ জাগবে।' গ্রীক ক্যাপ্টেনের চেহারা থমথম করছে। মনে মনে জানে, এটাই হয়তো টাটরার শেষ ভয়েজ। 'আমি চাই না ওদের কোনো ক্ষতি হোক। ভয় পেয়ে ওরা যদি দৌড়ে পালাতে শুরু করে…'

'আমার লোকদের কড়া নির্দেশ দেয়া আছে, কেউ গুলি ছুঁড়বে না,' বললো ব্রিজেলবার্ড। তার চেহারায় একটা ইতস্তত ভাব দেখা গেল। মোপাসুকে দেখতে পেলে সত্যিই হয়তো ল্যাম্পের নিচে ওরা যারা অপেক্ষা করছে শান্ত হয়ে থাকবে। 'ঠিক আছে, ওখানে তুমি দাঁড়াতে পারো। কিন্তু ওদের সাথে কথা বলতে পারবে না।'

নিঃসঙ্গ মাইনটাকে পাশ কাটিয়ে এগোচ্ছে টাটরা। পেনিনস্যুলার ওপর ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে ভোরের ম্লান আলো। ঝোপ-ঝাড় ঢাকা পাহাড়ের গায়ে জলপাই গাছগুলোকে নগ্ন কংকালের মতো দেখতে লাগলো। কালের স্পর্শে সবুজ হয়ে ওঠা পাথরের তৈরি জেটির কিনারায় তুষার জমে আছে। পকেটে হাত ভরে ঠাণ্ডায় হি হি করে কাঁপছে ল্যাম্পের নিচে ছোট্ট দলটা। পাথরের মেঝেতে পা ঠুকলো একজন। ওদের চোখে অস্বাভাবিক কিছু ধরা পড়েনি এখনও, আশা করলো ব্রিজেলবার্ড। জেটির শেষ মাথায় সাধারণ একটা বাঁধ দেখা গেল। গালফ থেকে সোজা খাড়া হয়ে উঠেছে। শুধু ঢেউগুলোকে বাধা দেয়ার জন্যেই এই বাঁধ। তারপর সৈকত। বালির ওপর পাথর ছড়ানো সৈকতের পর উঁচু একটা পাঁচিল, এটাকে সী-ওয়াল বলা হয়, ক্রমশ

প্রসারিত হয়ে দূরে মিলিয়ে গেছে। এই পাঁচিলের মাপজোক নেয়া সম্ভব হয়নি। ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের লোকজন এই পাঁচিল সম্পর্কে বার বার সতর্ক করে দিয়েছে তাকে। জেটির খুব কাছা-কাছি পাঁচিলটার গায়ে একটা ফাঁক আছে, গ্রামে ঢোকার সেটাই একমাত্র পথ। ওখানে কোথাও একটা কজওয়ে আছে, বাঁধের সাথে রোডের সংযোগ ঘটিয়েছে সেটা। এই রোড ধরে কাটায়-রায় পৌঁছানো যায়।

পাঁচিলের ওপারে তাকিয়ে আছে ব্রিজেলবার্ড। বেশ কয়েকটা দোতালা বাড়ি দেখা গেল, সবগুলোর দরজা-জানালা বন্ধ। শীতের সময় ওগুলো বোধহয় খালিই থাকে। খালি থাকলেই ভাল। কোনো হৈ-হাঙ্গামা ছাড়াই ল্যাণ্ড করতে পারবে তারা। দখল করবে গ্রামটা। উত্তর দিকের রাস্তায় রোড-ব্লক তৈরি করবে। তারপর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ট্রুপসের প্রধান শাখাটা রওনা হয়ে যাবে দক্ষিণ দিকে। পেনিনস্যুলার হৃৎপিণ্ডে পৌঁছুনো তখন আর কোনো সমস্যা নয়।

একজন অফিসার ঢুকলো ব্রিজে। ম্যালোরি এই প্রথম দেখলো লোকটাকে। কর্নেলের ইশারায় ছায়ায় এসে দাঁড়ালো অফিসার। বললো, 'মেজর হেফনার রিপোর্ট করছেন, তীরে নামার জন্যে সমস্ত প্রস্তুতি নেয়া শেষ হয়েছে।'

'গুড। ওয়্যারলেস সেটটা দু'জন লোক পাহারা দিচ্ছে, তাই না, রসম্যান?'

'ইয়েস, স্যার। মেজর নিজে সে-ব্যবস্থা করেছেন।'

'তাকে বলো, জেটিতে দাঁড়ানো ওই সিভিলিয়ানগুলোকে জাহাজে তোলা হবে না—ডিমোলিশন চার্জের জন্যে। আপাততঃ

ওদেরকে সৈকতে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে; তারপর পাহারা দিয়ে গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।'

চলে গেল রসম্যান। ওয়্যারলেস সেটের কথা ভাবছে ব্রিজেলবার্ড। নষ্ট সেটটা মেরামত না হওয়া পর্যন্ত জেনারেল হেড কোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগের ওটাই একমাত্র মাধ্যম। তীরে পৌঁছে যোগাযোগ করে মেসেজ পাঠাতে হবে, এবার আকাশ পথে রিইনফোর্সমেন্ট পাঠাতে পারো। এই অভিযানের ওটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। রিইনফোর্সমেন্ট না পৌঁছুলে তার একার পক্ষে কিছু করা সম্ভব হবে না। মালভূমিতে পৌঁছে অসহায় বোধ করবে সে।

আবার স্টারবোর্ডের দিকে তাকালো কর্নেল। জেটিতে ভিড়ছে টাটরা।

তিন

ভারি ধাতব আওয়াজের সাথে জাহাজ আর জেটির মাঝখানে গ্যাঙওয়ে ফেলা হলো। পাহাড়-সারির নিচেকার ঢালগুলো এখনও ঢাকা পড়ে আছে অন্ধকারে। সবার আগে তীরে পা রাখলো মেজর হেফনার, এক মিনিট পরই তার সাথে যোগ দিল গ্রীক ক্যাপ্টেন মোপাস্থ। মোপাস্থর পিছু নিল এক ডজন অ্যালপেন-

করপস্ সৈনিক। এই দলটা সশস্ত্র নয়, এদের কলার প্রায় গলা পর্যন্ত বোতাম আঁটা। এদের একজনের হাতে চকচকে পিতলের তৈরি একটা ফলক শোভা পাচ্ছে, তাতে খোদাই করা রয়েছে কিছু স্মারক-লিপি। জার্মান এবং গ্রীক জনসাধারণের মধ্যেকার ভ্রাতৃত্ব এবং বন্ধুত্বের সেতু এতোই শক্তিশালী যে কেউ তা ছিঁড়তে পারবে না, এই ধরনের কিছু মিষ্টি কথা বলা হয়েছে স্মারক লিপি-তে। ফলকের এক ধারে তারিখ লেখার ঘর, কিন্তু সেটা খালি পড়ে আছে। এক লাইনে তিনজন করে, মোট চারটে লাইন তৈরি করলো তারা। এগিয়ে চললো জেটি ধরে কজওয়ের দিকে, এই কজওয়েই ওদেরকে কাটায়রায় পৌঁছে দেবে। কাটায়রার চেয়ার-ম্যানকে উপহার দেবার জন্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ফলকটা।

প্রথম দিকে মনে হলো, জার্মান সেনাবাহিনীর কিছু নিরস্ত্র প্রতিনিধি শুভেচ্ছা সফরে এসেছে, অভাব শুধু ব্যাণ্ডপার্টির। ধীরে ধীরে দূরে হারিয়ে যাচ্ছে সৈনিকদের দলটা।

'কেউ বাধা দিও না! প্লিজ! কেউ ছুটোছুটি করো না। প্লিজ, প্লিজ! আমরা অসহায়!' ল্যাম্পের নিচে দাঁড়ানো গোটা চার-পাঁচ লোকের উদ্দেশ্যে কথাগুলো বললো মোপাস্থ। ব্রিজেলবার্ড কোনো নির্দেশ দেয়নি, কিন্তু কথাগুলো বলে ভালোই করেছে সে। ছোট ভিড়ের একেবারে পিছনে দাঁড়ানো লম্বা একজন লোক ট্রাউজারের পকেট থেকে হাত বের করে এক পা পিছিয়ে গেল। ইতিমধ্যে আরেক সেকশন সৈনিক নেমে এসেছে জাহাজ থেকে, তাদের একজন স্যাঁৎ করে এগিয়ে গিয়ে খপ করে ধরে ফেললো লোকটাকে। টেনে ভিড়ের মাঝখানে নিয়ে আসা হলো তাকে। সিভিলিয়ান লোকগুলো বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে গ্যাঙ-

ওয়ের দিকে। সৈনিকদের তৃতীয় দলটা নেমে আসতে শুরু করেছে। প্রত্যেকে সশস্ত্র। পিঠে রাকস্যাক, কাঁধে রাইফেল, কোমরের পাশে খাপে ভরা ছোট আকারের বেয়োনেট।

চোখে প্রশংসা এবং মনে স্বস্তি নিয়ে ব্রিজ থেকে ল্যাণ্ডিং অপারেশন চাক্ষুষ করছে, কর্নেল ব্রিজেলবার্ড। সব কিছু প্ল্যান মাফিক এগোচ্ছে। অগ্রবর্তী দলটা এরই মধ্যে সী-ওয়ালের ফাঁক গলে অদৃশ্য হয়ে গেছে। মিনিট কয়েকের মধ্যেই প্রথম টার্গেট চেয়ারম্যানের বাড়িতে পৌঁছে যাবে তারা। ভোরের আলো একটু একটু করে বাড়ছে, পাঁচিলের ওপারে একটা টাওয়ারের মাথায় পত পত করে গ্রীক পতাকা উড়তে দেখলো ব্রিজেলবার্ড। সশস্ত্র সৈনিকদের দল কজওয়ে পেরোতে শুরু করেছে দেখে চোখের সামনে রিস্টওয়াচ তুললো সে। কি যেন ভাবলো। তারপর তাকালো জেটির দিকে। জেটির মাঝখানে দেখা গেল সিভিলিয়ান লোকগুলোকে, কয়েকজন গার্ড তাদেরকে খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সৈকতের দিকে। তাদের পাশ দিয়ে মার্চ করে এগোচ্ছে অ্যালপেনকরপ্‌স্‌ সৈনিকদের আরেকটা সশস্ত্র দল। হ্যাঁ, সব কিছু প্ল্যান অনুসারে ঘটছে। তার বিরুদ্ধে ক্যানারিসের কাছে রিপোর্ট করার মতো বিশেষ কিছু পাবে না অ্যাবওয়ের অফিসার·

এই সময় গুলি শুরু হলো।

পরিস্থিতি লক্ষ্য করে, আঁতকে উঠলো কর্নেল ব্রিজেলবার্ড। ঘটনাটা ঘটতে শুরু করলো গ্রীক সিভিলিয়ানরা জেটি থেকে নেমে যাবার সাথে সাথে। গ্যাঙওয়ে থেকে কজওয়ের মাঝখানে গোটা বাঁধের ওপর অ্যালপেনকরপ্‌স্‌ সৈনিকদের ভিড় লেগে রয়েছে। জাহাজ থেকে এইমাত্র নামতে শুরু করেছে স্কি সেক-

শন। এদেরই একজন, সবার মতো তার পিঠেও আটকানো রয়েছে স্কি ইকুইপমেন্ট, গুলির আওয়াজ হতেই পড়ে গেল। সেই সাথে আঁটসাঁট শৃংখলা ভণ্ডুল হয়ে গেল। চোখের পলকে ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে গেল সারিগুলো। গুলি খেয়ে সঙ্গীদের গায়ের ওপর হেলান দিল লোকটা, তাকে নিয়ে আছাড় খেলো আরও কয়েকজন। এই সময় আরেকটা গুলি হলো। পড়ে যাওয়া লোকগুলোর দিকে এগিয়ে আসছিল একজন স্কি-সোলজার, হঠাৎ বাঁকা হয়ে গেল তার শিরদাঁড়া, অলস ভঙ্গিতে আধপাক ঘুরে দড়াম করে পড়ে গেল সে। ব্রিজেলবার্ডের ইচ্ছে হলো নিজের চুল নিজেই ছেঁড়ে। গোটা স্কি-সেকশন যদি ধ্বংস হয়ে যায়···এরপর আর কিছু ভাবতে পারলো না সে। ব্রিজ থেকে ঝুঁকে নিচের দিকে খোলা ডেকে তাকালো—হাত নেড়ে, গলা চড়িয়ে দ্রুত নির্দেশ দিচ্ছে লেফটেন্যান্ট মুলার। জেটি ধরে সৈনিকদের এগিয়ে যেতে বলছে সে।

আবার গুলির আওয়াজ।

জেটির মাঝখানে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল চারজন সৈনিক, আওয়াজ শুনেই জেটির শেষ প্রান্তের দিকে ছুটলো তারা কিন্তু ছুটলো তিনজন, চারজন নয়। শেষ লোকটা হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে গেল জেটির ওপর।

ব্রিজ থেকে বেরিয়ে এসে খোলা ডেকের দিকে হন হন করে এগোলো ব্রিজেলবার্ড। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে পেনিনস্যুলার ওপর চোখ বুলাচ্ছে অ্যাবওয়েরের অফিসার, তাকে পাশ কাটিয়ে নেমে যাবার সময় কর্নেল এই প্রথম লক্ষ্য করলো, মেয়রের হাতে বা মুখে চুরুট নেই। সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁচেছে সে, এই সময়

গর্জে উঠলো কয়েকটা রাইফেল। অ্যালপেনকরপ্‌স্‌ সৈনিকরা পাল্টা জবাব দিচ্ছে। কিন্তু কর্নেলের বোধগম্য হলো না কার বা কাদের দিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে ওরা। ব্রিজের কমাণ্ডিং পজিশন থেকেও আক্রমণের উৎসটা খুঁজে পায়নি সে।

সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে পড়লো ব্রিজেলবার্ড। ব্যাটা-লিয়ন ওয়ায়েরলেস সেটটা চোখে পড়লো, দেয়াল ঘেঁষে রাখা হয়েছে, পিছনের ফ্ল্যাপটা খোলা। চালু সেট বলতে এখন এই একটাই। একজন অ্যালপেনকরপ্‌স্‌ সৈনিক পাহারা দিচ্ছে সেটাকে। ঠিক হয়ে আছে কাটায়রা দখল করার পরপরই ওয়া-য়েরলেসে জেনারেল হেডকোয়ার্টারে মেসেজ পাঠাতে হবে, 'অভিযানের প্রথম পর্ব সম্পূর্ণ হয়েছে।'

বিশৃংখলা এখন গ্যাঙওয়ে থেকে জাহাজের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। রেইলের নিচে মাথা নামিয়ে অদৃশ্য শত্রুর দৃষ্টিকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করছে সৈনিকরা। কিন্তু পিছন থেকে হুংকার ছাড়ছে লেফটেন্যাণ্ট মুলার। জাহাজ থেকে সবাইকে নেমে যাবার নির্দেশ দিচ্ছে সে। অফিসারের নির্দেশ অমান্য করা সম্ভব নয়, দলবেঁধে, হুড়মুড় করে জেটিতে পড়ছে সৈনিকরা। চারদিকে মহা আলো-ড়ন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাথা ঠাণ্ডা করে চিন্তা-ভাবনা করছে ব্রিজেলবার্ড। তিনটে গুলি, লেগেছেও তিনজনকে। নিশ্চয়ই এক-জন মার্কসম্যানের কাজ।

ডেকের পরিস্থিতি মোটামুটি আয়ত্তে নিয়ে এসেছে মুলার, কাজেই কি ঘটছে না ঘটছে ভাল করে দেখার জন্যে আবার ব্রিজে ফিরে এল কর্নেল। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে দেখলো আগের দলগুলো জেটি ছেড়ে কজওয়েতে উঠে গেলেও, জাহাজ থেকে

আরেক দল এসে জেটিতে ভিড় করেছে। তারা এগোচ্ছে কম, এলোপাতাড়ি গুলি করছে বেশি। একজন লোক জেটির কিনারায় দাঁড়িয়ে রাইফেল কক করছিল, হঠাৎ যেন প্রচণ্ড একটা ঘুসি খেয়ে ছিটকে পড়লো সে, কিনারা দিয়ে নেমে গেল। ঝপাৎ করে আওয়াজ হলো, ছলকে উঠলো পানি, পানির নিচে হারিয়ে গেল শরীরটা। কয়েক সেকেণ্ড পরই আবার ভেসে উঠলো লোকটা, কিন্তু উপুড় হয়ে। এখন আর নড়াচড়া করছে না।

খোলা ডেকে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা মুলারও দেখলো, কিন্তু জাহাজ খালি করার সিদ্ধান্ত থেকে একচুল নড়লো না সে। সৈনিকরা ইতস্তত করছে দেখে আবার হুংকার ছাড়লো লেফটেন্যান্ট। মুহূর্তের জন্যে রুদ্ধ হয়েছিল গতি, আবার সৈনিকদের স্রোত জাহাজ থেকে খোলা জেটিতে নেমে যেতে শুরু করলো। ব্রিজে আর মাত্র দু'জন গার্ড রয়েছে, তাদের দিকে ফিরে নির্দেশ দিল ব্রিজেলবার্ড, 'ইংরেজ বন্দীদের নামিয়ে নিয়ে যাও।'

ন্যাভাল অফিসার ফকার আগেই নেমে গেছে, কাজেই ব্রিজে একা হয়ে গেল ব্রিজেলবার্ড। হঠাৎ অ্যালপেনকরপ্স্ সৈনিকদের রাইফেল স্তব্ধ হয়ে গেল। মুলারের নির্দেশমতো মিনিট পাঁচেক সীজ-ফায়ার বজায় রাখা হবে।

পাহাড়ের নিচু ঢালগুলোয় রাতের অন্ধকার এখনও কাটেনি। সেদিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে ব্রিজেলবার্ড। প্রথম দিকে তার ধারণা ছিল, কোনো বাড়ির জানালার ভেতর থেকে গুলি করছে কেউ। কিন্তু একটা একটা করে প্রায় সবগুলো জানালা লক্ষ্য করেছে সে, কোনো শাটার খোলা দেখতে পায়নি। জেটির ওপর ফিরে এল দৃষ্টি। মুলারের নির্দেশে ছ'জন সৈনিক দৌড়ে পেরিয়ে

যাচ্ছে জেটি, শিরদাঁড়া বাঁকা করে নিচু হয়ে আছে তারা। পাথুরে মেঝেতে লাশ পড়ে আছে, সেগুলোকে লাফ দিয়ে টপকে গেল সবাই। কংক্রিটের মেঝেতে পেরেক আঁটা বুট জুতোর কর্কশ আওয়াজকে ছাপিয়ে আবার শোনা গেল গুলির শব্দ। সৈনিকদের একজন পড়ে গেল। বাকি পাঁচজন থামলো না, পিছন ফিরে এক-বার তাকালোও না, পাঁচিলের ফাঁক গলে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল। ব্রিজে দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে মাথা দোলালো ব্রিজেলবার্ড। কো-থেকে গুলি হচ্ছে এতক্ষণে দেখতে পেয়েছে সে। গ্রামের দক্ষিণ দিকে, পাহাড়ের এক জায়গায় ক্ষীণ এক ঝলক মাজল-ফ্ল্যাশ ধরা পড়েছে চোখের কোণে। মার্কসম্যানের বাহাদুরি আছে বলতে হবে, অনেক দুর থেকে গুলি করেও প্রতিবার লক্ষ্য ভেদ করতে পারছে। না, তার মনে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই, আক্রমণটা মাত্র একজন লোকের।

ব্রিজ থেকে বেরিয়ে পড়লো ব্রিজেলবার্ড। সিঁড়ির শেষ ধাপে তার সাথে দেখা হলো লেফটেন্যান্টের।

'স্যার,' খানিক ইতস্তত করে বললো মুলার, 'দ্বিতীয় সেট-টাও নষ্ট হয়ে গেছে···'

বাঘের মতো গর্জে উঠলো কর্নেল, 'হোয়াট!' পরমুহূর্তে স্তম্ভিত দেখালো তাকে। অনুভব করলো, সারা শরীরের রক্ত যেন ঠাণ্ডায় জমে গেল। 'কিভাবে ঘটলো এই সর্বনাশ?'

'একটা গুলি এসে লেগেছে—সবগুলো বালব চুরমার হয়ে গেছে।'

বিধ্বস্ত সেটের সামনে বসে সেটার দিকে মাথা নিচু করে আছে একজন সৈনিক, যেন ভয়ে কর্নেলকে মুখ দেখাতে চাইছে না।

এক পা এগিয়ে তার দিকে ঝুঁকে পড়লো ব্রিজেলবার্ড। 'এটাকে পাহারা দিয়ে রাখার জন্যেই তুমি এখানে ছিলে, কেলার,' থমথমে গলায় বললো সে।

'ওর আসলে কোনো দোষ নেই স্যার,' মাঝখান থেকে নাক গলিয়ে বললো মুলার। 'রেইলের সামনে দাঁড়িয়ে আর সবার সাথে গুলি করছিল ও, এই সময় ঘটনাটা ঘটে। সেটের কাছ থেকে একবারও বেশি দূরে যায়নি ও। ব্যাপারটা নিতান্তই আমাদের দুর্ভাগ্য, স্যার।'

'দুর্ভাগ্য, মুলার?' সিধে হয়ে দাঁড়ালো ব্রিজেলবার্ড, কটমট করে তাকালো লেফটেন্যান্টের দিকে। 'একটা সেট আগেই কেউ অকেজো করে রেখেছে। চুরি করে জাহাজের কোথাও ফিট করে রাখা হয়েছে দশ কিলোগ্রামের একটা টাইম-বোমা। তারও আগে, কেউ একজন ইংরেজ বন্দীদের বাঁধন খুলে পালাবার সুযোগ করে দিয়েছিল। এসব দেখেও কি তোমার মাথায় এই সহজ সত্যটা ঢুকছে না যে আমরা চিনতে পারছি না এমন এক-জন লোক বিশেষভাবে খেয়াল রাখছে, দুর্ভাগ্যগুলো যেন একের পর এক শুধু আমাদের ওপরই এসে পড়ে?' একটা বাঁক দিয়ে অ্যাবওয়েরের অফিসার এগিয়ে আসছে বুঝতে পেরে সেদিকে ফিরলো ব্রিজেলবার্ড।

বিধ্বস্ত সেটের দিকে চোখ পড়লো রাহাতের। 'এটাও?'

'বুলেট এসে লেগেছে, একটা বালবও আস্ত নেই। এ আর কোনো কাজেই লাগবে না।' কথাগুলো বলার সময় তীক্ষ্ণ নজরে অ্যাবওয়েরের অফিসারের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলো ব্রিজেলবার্ড। তারপর অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা সুরে বললো, 'হের মেয়র, আমার

বিশ্বাস আপনার কাছে একটা ল্যুগার আছে। কিছু যদি মনে না করেন, সেটা একবার দেখতে পারি ?'

রাহাতের চেহারায় কোনোরকম রাগ বা তিক্ত হাসি ফুটলো না। নিঃশব্দে পকেটে হাত ভরলো সে। ল্যুগারটা বের করে ধরিয়ে দিল কর্নেলের হাতে। ব্রিজেলবার্ড যখন খুঁটিয়ে পিস্তলটা পরীক্ষা করছে, রাহাত তখন কোটের দুই পকেটে হাত ভরে তাকিয়ে আছে জেটির দিকে, সেখান থেকে ট্রুপসের শেষ দলটা মাথা নিচু করে ছুটছে গ্রামের দিকে। ইতিমধ্যে ভোরের আলোয় সী-ওয়ালের ওপারের বাড়ি-ঘরগুলো পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। রাহাত তাকিয়ে থাকতে থাকতেই মিষ্টি রোদ ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। এককালে বাড়ির টালিগুলো লাল ছিল, এখন কালচে হয়ে গেছে। কোনো নিয়ম ধরে নয়, যেমন খুশি তেমনভাবে যেখানে সেখানে তৈরি করা হয়েছে বাড়িগুলো। যতদূর জানা আছে ওর, বছরের অন্যান্য সময়ে এই গ্রামে চেয়ারম্যান আর জনাকয়েক শ্রমিক ছাড়া আর কেউ থাকে না, শুধু মাছ ধরার মরশুম শুরু হলে, গ্রীষ্মে, সালোনিকা থেকে কয়েকশো জেলে এসে হাজির হয়।

পরীক্ষা করতে গিয়ে ব্রিজেলবার্ড দেখলো, ল্যুগারটা ফুল লোড করা রয়েছে। সাত রাউণ্ডের সাতটাই আছে। মাজলটা নাকের কাছে তুলে গন্ধ শুকলো সে। তারপর সেটা ফিরিয়ে দিল অ্যাবওয়ের অফিসারকে। 'ধন্যবাদ।' তাকালো মুলারের দিকে। 'আমরা তীরে নামবো। ফ্র্যাংককে বলো, বন্দীদের নিয়ে আসুক।'

টেনেটুনে টিউনিকটা ঠিক করে নিল ব্রিজেলবার্ড। ছোট

দলটাকে পিছনে নিয়ে গ্রীক মাটির দিকে এগোলো সে। পোর্টের দিকে কাত হয়ে আছে টাটরা, তাই কোণাকুণি ভাবে একদিকে ঢালু হয়ে আছে গ্যাঙওয়ে, এর আগে ব্যাপারটা লক্ষ্য করেনি সে। জায়গাটা পেরোবার সময় এক পর্যায়ে দৌড়ুতে হলো তাকে, তা না হলে পড়ে যাবার ভয় ছিল। খানিকটা এগিয়ে এসে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে থামলো একবার, দু'চারটে কথা বললো দু'জন মেডিকেল আর্দালীর সাথে। আহতদের দেখাশোনা করছে তারা। তাদের একজন মুখ তুলে কর্নেলের দিকে তাকালো, ধীরে ধীরে এদিক-ওদিক মাথা নাড়লো। আবার এগোলো ব্রিজেলবার্ড, পিছন দিকে না তাকিয়েও জানে এখনও যারা রয়ে গেছে জাহাজে তারা সবাই তার দিকেই তাকিয়ে আছে। তার ঠিক পিছনেই রয়েছে অ্যাবওয়ের অফিসার। হাত দু'টো এখনও পকেটে ভরে রেখেছে ও। কর্নেলের পিছু পিছু হাঁটছে, কিন্তু তাকিয়ে আছে দক্ষিণ দিকে। রাহাতের পিছনে ম্যালোরি আর গ্রীণ, ওদেরকে পাহারা দিয়ে নিয়ে আসছে ফ্র্যাংক আর একজন প্রাইভেট। বাঁধের শেষ মাথায় পৌঁছে থামলো কর্নেল, গলা চড়িয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলো টাটরার ক্যাপ্টেন মোপাস্থ্র। গ্রীক সিভিলিয়া-নদের সাথে সৈকতে দাঁড়িয়ে আছে সে।

মোপাস্থ্ এগিয়ে এসে কর্নেলের সামনে দাঁড়ালো।

'তোমাদের ওই জাত ভাই, পাপাগোপালা, আর কি কোয়া-লিফিকেশন আছে তার ?'

'ইংরেজী জানে।'

ঠিক কি জানতে চায় কর্নেল, বুঝতে পারেনি মোপাস্থ্। জবাব শুনে তার শরীর শক্ত হয়ে উঠলো লক্ষ্য করে মনে মনে

ঘাবড়ে গেল সে। বলার সুরটা কি কঠিন হয়ে গেছে?

ব্রিজেলবার্ড অন্য কথা ভাবছে। খোঁড়া হবার আগে পাপাগোপালা কি সামরিক বাহিনীতে ছিল? ইংরেজী জানে, তার মানেটা কি? কজওয়ে ধরে হাঁটার সময় টাটরার ঘটনাগুলো স্মরণ করলো সে। ম্যালোরি আর গ্রীণকে কি সে-ই মুক্ত করেছিল? সে সময় হোল্ডের ভেতর বন্দী ছিল সে। ওয়ায়েরলেস সেট দু'টো তার হাতে নষ্ট হয়নি তো? এখনও কি লোকটা জাহাজেই আছে? তাহলে পাহাড়ে ওই মার্কসম্যানটা কে?

সামনেই পাঁচিল। ফাঁক গলে গ্রামের চৌহদ্দির ভেতর ঢোকার সময় মাথা থেকে সমস্ত চিন্তা দুর করে দিল ব্রিজেলবার্ড। ফাঁকের মুখে একজন সেন্ট্রি দাঁড় করানো হয়েছে। তার স্যালুটের জবাবে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো সে।

কেউ লক্ষ্য করেনি, ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়েছে রাহাত। পিছন থেকে এগিয়ে এসে ফ্র্যাংক এবং বন্দীরা তাকে ধরে ফেললো। এই সময় মোপাসুকে ভাল করে দেখার জন্যে কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকলো ও। তারপর আবার যখন কজওয়ে ধরে এগোলো সে, ফ্র্যাংক তার বন্দীদের নিয়ে কয়েক পা সামনে এগিয়ে গেছে। হাঁটার গতি না বাড়িয়ে দক্ষিণ দিকে, পাহাড়গুলোর ওপর তাকালো সে। মাঝে মধ্যে দৃষ্টি ফিরে এল পাঁচিলের ফাঁকের সামনে দাঁড়ানো সেন্ট্রির বেল্টের দিকে, যেখানে হ্যাণ্ড-গ্রেনেড ঝুলছে। সবশেষে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালো ও, দেখে নিল কাছেপিঠে আর কেউ আছে কিনা। গ্যাঙওয়ে খালি। জাহাজ থেকে এইমুহূর্তে কোনো সৈনিক নামছে না। সামনে তাকালো ও। বললো, 'ফ্র্যাংক! মনে হলো জাহাজ

থেকে কে যেন ডাকছে তোমাকে।'

প্রকাণ্ডদেহী ফ্র্যাংক বন্দীদের থামতে ইঙ্গিত করলো। সী-ওয়ালের ফাঁক গলে এইমাত্র গ্রামের ভেতর ঢুকেছে তারা। সামনে দেখা যাচ্ছে ধুলোমাখা একটা পথ, পাথরের তৈরি একটা বিল্ডিংয়ের পাশ ঘেঁষে এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। বাঁকের একেবারে কাছে পৌঁছে গেছে কর্নেল ব্রিজেলবার্ড, অ্যাবওয়ের অফিসারের গলা তার কানে পৌঁছায়নি। সেন্ট্রিকে বিমূঢ় দেখালো, টাটরার দিকে তাকিয়ে আছে সে। কাউকে ডাকছে কিনা বোঝা গেল না, তবে গ্যাঙওয়ের মাথায় একজন লোক জাহাজের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে বটে।

'কি ব্যাপার, স্যার?' অ্যাবওয়ের অফিসারের দিকে দু'পা এগিয়ে এল ফ্র্যাংক, চেহারায় অনিশ্চিত ভাব। প্রশ্ন করেই ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালো সে। বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে কর্নেল ব্রিজেলবার্ড, ধুলোমাখা রাস্তাটা খালি পড়ে আছে।

দু'কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে ম্যালোরি, চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ্য করছে অ্যাবওয়ের অফিসারকে। কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে গ্রীণ, রাইফেল হাতে তৈরি হয়ে থাকা একজন প্রাইভেটের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

'তোমাকে বোধহয় জাহাজে দরকার হয়েছে,' আবার বললো রাহাত। 'দেখলাম, মুলার হাতছানি দিয়ে ডাকছে।'

উভয় সংকটে পড়ে গেল ফ্র্যাংক। কর্নেলের সুস্পষ্ট অর্ডার আছে, ব্যক্তিগতভাবে তাকেই বন্দীদের নিয়ে গ্রামে ঢুকতে হবে। এই অর্ডারের চুল পরিমাণ লঙ্ঘন করার অধিকার বা সাহস কোনোটাই নেই তার। কিন্তু ডেকে সাড়া না পেলে লেফটেন্যান্ট

মুলার তার জীবনটাকে নরক করে তুলতে পারে, এবং তুলবে। অগত্যা আপোস করলো ফ্র্যাংক, আবার গ্যাঙওয়ে থেকে হাত-ছানি দিয়ে কেউ ডাকে কিনা দেখার জন্যে অপেক্ষা করবে সে।

গালফের দিকে তাকিয়ে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলো রাহাত। দেখে মনে হলো, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করে রেখেছে। জেটিতে পড়ে থাকা লাশ আর সামরিক আগ্রাসনের লক্ষণগুলো কেউ যদি না দেখার ভান করতে পারে, দৃশ্যটা সত্যি অদ্ভুত সুন্দর। সকালের প্রথম রোদ লেগে ঝলমল করছে ঈজি-য়ান, পিছনে মেইনল্যাণ্ডে কুয়াশা ঢাকা পাহাড়ের পর্দা ঝুলছে। নির্জন গালফের মাথার কাছে সূর্যের আলো তেরছাভাবে পড়েছে বলে সাগরের গা হয়ে উঠেছে তরল পারদের মতো। বাতাসের ধাক্কায় ছোট ছোট ঢেউ জাগছে সৈকতের কাছাকাছি, ধীর গতিতে ছুটে এসে বালি আর পাথরের ওপর ভেঙে পড়ছে একের পর এক।

অস্থিরভাবে নড়ে চড়ে উঠলো ফ্র্যাংক। 'আমি তো আর অপেক্ষা করতে পারি না, স্যার!' বললো বটে, কিন্তু সাথে সাথে জাহাজের দিকে পিছন ফিরলো না।

মাথা ঝাঁকালো রাহাত, যেন ফ্র্যাংকের সমস্যাটা বুঝতে পারছে সে। তারপর ফ্র্যাংকের দিকে এগোলো। ফাঁকের ভেতর, সামনেই দাঁড়িয়ে আছে সার্জেন্ট, সেটা গলে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছে দেখে অ্যাবওয়ের অফিসারকে পথ ছেড়ে দিল সে। পাঁচিলের ফাঁক গলে ভেতরে ঢুকেই ওর ডান দিকে দু'জন অ্যালপেনকরপ্‌স্‌ সৈনিককে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো রাহাত। পাঁচিলের পিছনে, আড়ালে পড়ে গিয়েছিল ওরা। রাহাত দেখলো, চোখে গ্লাস

তুলে দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে আছে লোক দু'জন। এখন অবশ্য তারা চোখ থেকে গ্লাস নামিয়ে নিল, কাঁধে আরও ভাল করে ঝুলিয়ে নিল যে-যার মেশিন-পিস্তল, তারপর ফিরে চললো ফাঁক-টার দিকে। ইস্তাম্বুল থেকে এত দূরে নিয়ে এসেছে জাহাজটা, সেটাকে শেষবারের মতো দেখার ইচ্ছে।

ওদেরকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লো ফ্র্যাংক। ঘনিষ্ঠতা আছে, কাজেই ওদের সাথে একটু রসিকতাও হলো তার। কিন্তু রাহাত লক্ষ্য করলো, সারাক্ষণ জেটির দিকে তাকিয়ে আছে ফ্র্যাংক, যদি মুলার নেমে এসে হাতছানি দিতে শুরু করে। খুব জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাঁচিলের দিকে পিঠ দিয়ে ঘাসের ওপর হাঁটু মুড়ে বসে পড়লো ম্যালোরি। দেখাদেখি গ্রীণও তার পাশে বসলো। অপর দু'জন সৈনিকের সাথে এখনও ফাঁকের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ফ্র্যাংক। ঠিক এই সময় পেনিনসূলার ওপর নেমে এল কেয়ামত।

বিস্ফোরণের প্রচণ্ড আওয়াজটাকে পাহাড়গুলো যেন বারবার লুফে নিয়ে ছুঁড়ে দিতে লাগলো। ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে গাল-ফের ওপর দিয়ে কামানের গোলার মতো ফিরে এল আওয়াজটা। পাঁচিলের ফাঁক গলে এমন বিদ্যুৎ গতিতে ঢুকলো শক-ওয়েভ, মনে হলো ফাঁকের কাছেই কোথাও বিস্ফোরণ ঘটেছে। আসলে তা নয়, এতক্ষণে জাহাজের সেই ডিমোলিশন চার্জ বিস্ফোরিত হয়েছে। রাহাতের অর্ধেকটা পাঁচিলের আড়ালে ছিল, তবু ছিটকে ঘাসের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়লো সে। তার মনে হলো, পর-পর দু'টো আওয়াজ শুনেছে—প্রথমে বিস্ফোরিত হয়েছে চার্জ, তারপর বয়লার। বিশাল একটা হাতুড়ির মতো শক-ওয়েভের

পুরো ধাক্কা খেয়ে রাস্তার ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে চারজন অ্যালপেনকরপ্স্ সৈনিক। মাত্র দু'জন একটু একটু নড়াচড়া করছে। তাদের একজন মাথা তুলতে গিয়ে জ্ঞান হারালো। পাঁচিলের বাইরে দাঁড়ানো সেন্ট্রি পাথরের সাথে ধাক্কা খেয়ে সাথে সাথে মারা গেছে, মাথা ফেটে মগজ বেরিয়ে এসেছে তার।

ঘাসের ওপর পড়ে থাকলো রাহাত। তারপর ধীরে ধীরে মাথা তুলতে শুরু করলো। এখনও কিছু শুনতে পাচ্ছে না ও। কিন্তু ম্যালোরি আর গ্রীণের কানে তালা লাগেনি। গ্রামের অনেক বাড়ি-ঘরের দেয়াল, ছাদ ভেঙে গেছে—এখনও সুরকি, গুঁড়ো পাথর ঝরে পড়ার আওয়াজ পাচ্ছে ওরা।

কিন্তু ওদের দু'জনের চেয়ে আগেই ধাক্কাটা সামলে নিতে পারলো রাহাত। টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে দেখলো, রাস্তাটা খালি পড়ে আছে, বাঁকের কাছে নেই কেউ। এই সময় ওর পিছনে উঠে দাঁড়ালো ম্যালোরিও, তার হাতে রয়েছে একটা পাথর। পাথর ধরা হাতটা মাথার ওপর তুলে সাবধানে এগোচ্ছে রাহাতের পিঠের দিকে। পকেট থেকে ল্যুগারটা বের করে ফাঁকের সামনে এসে দাঁড়ালো রাহাত। জেটির দিকটা দেখে নিল একবার, তারপর এগোলো রাস্তার ওপর এই মাত্র উঠে দাঁড়ানো সৈনিকটার দিকে। লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছে বটে, কিন্তু অন্ধের মতো ঘুরপাক খাচ্ছে নিজের চারদিকে, সেই সাথে ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাচ্ছে। সাবধানে তার দিকে এগিয়ে আসছে রাহাত, পিছু পিছু ওকে অনুসরণ করছে ম্যালোরি।

ল্যুগারটা দিয়ে সৈনিকের মাথায় একটা বাড়ি দিল রাহাত। লোকটা ঘাসের ওপর পড়ে যাচ্ছে, এই সময় ছোঁ দিয়ে মেশিন-

পিস্তলের স্ট্র্যাপ ধরে হ্যাঁচকা টান দিল ও। হাতে চলে এল সেটা। ওর পিছনে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো ম্যালোরি, হাতের মুঠোয় এখনও রয়েছে পাথরটা। কিন্তু রাহাতের হাতে মেশিন-পিস্তল দেখে আবার সামনে এগোলো সে। ঘুরে দাঁড়ালো রাহাত, কপালের দিকে ছুটে আসা ম্যালোরির হাতটা এক ঝট-কায় সরিয়ে দিল একপাশে, তারপর সেকেণ্ড-লেফটেন্যাণ্টের হাতে মেশিন-পিস্তলটা ধরিয়ে দিয়ে রুক্ষ কণ্ঠে বললো, 'এটা রাখো, চালাতে জানলে পাথরের চেয়ে অনেক ভাল কাজ দেবে।'

অ্যাবওয়েরের অফিসারের আচরণ দেখে এবং তার মুখে বিশুদ্ধ ইংরেজী শুনে ম্যালোরির মনে হলো, নিশ্চয়ই আমি জেগে থেকে স্বপ্ন দেখছি। তার চোখ দু'টো এখনও অনুসরণ করছে অ্যাবও-য়ের অফিসারকে।

অচেতন একজন জার্মানের কাঁধ থেকে আরেকটা মেশিন-পিস্তল টেনে নিল রাহাত, গ্রীণের দিকে ছুঁড়ে দিল সেটা। তারপর ঘাসের ওপর নিঃসাড় পড়ে থাকা দু'জন সৈনিকের পকেট-হাতড়ে বের করলো স্পেয়ার ম্যাগাজিন। সিধে হয়ে ওদের দিকে তাকা-লো ও, লক্ষ্য করলো দু'জনের মধ্যে গ্রীণই মেশিন-পিস্তলের সাথে পরিচিত, কাজেই স্পেয়ার ম্যাগাজিনগুলো তার দিকেই ছুঁড়ে দিল। 'ধরো, তুমিই বোধহয় এগুলো বেশি কাজে লাগাতে পারবে। এবার, লেজ তুলে পলায়ন। রাইট? ওদিকে যাবো আমরা—পাঁচিল ঘেঁষে দক্ষিণ দিকে।'

'কিন্তু আপনি···কে আপনি?' জানতে চাইলো ম্যালোরি। বিস্ময়ের ঘোর এখনও কাটেনি তার।

'মেয়র···অ্যাবওয়েরের সাথে আছি,' জেটির ওপর দিয়ে টাটরার

দিকে তাকিয়ে রুক্ষ কণ্ঠে বললো রাহাত।

একটা সুররিয়্যালিস্ট কোণ রচনা করে বেঁকে গেছে গ্রীক ফেরী টাটরার ফানেল, এরই মধ্যে পানিতে দেবে গেছে তার বো। খোলের চারদিকে দু'চারটে ক্ষুদে লোককে পানিতে ভাসতে দেখা গেল। পরিষ্কার নীল আকাশে বিশাল একটা কাল ধোঁয়ার স্তম্ভ উঠে গেছে। এই সিগন্যাল মেইনল্যাণ্ড থেকে অন্ধরাও বোধ-হয় দেখতে পাবে। ফেটে চৌচির হয়ে গেছে ফানেল, ফাটল-গুলো থেকে বেরিয়ে আসছে আগুনের লকলকে জিভ। দেখতে দেখতে গোটা সুপারস্ট্রাকচারে আগুন ধরে যাবে এবার। ব্রিজেল-বার্ডের সব কিছু স্বাভাবিক দেখানোর চেষ্টা ডিমোলিশন চার্জের সাথেই ফেটে গেছে। 'আমি ভেবেছিলাম ওটা বোধহয় আর ফাটলোই না!' কথাটা যেন নিজেকেই শোনালো রাহাত। দেখলো হামাগুড়ি দিয়ে জেটির ওপর উঠছে গ্রীক ক্যাপ্টেন মোপাস্থ। সৈকতে যারা দাঁড়িয়েছিল নিশ্চয়ই তাদের মাথার ওপর দিয়ে চলে গেছে শক-ওয়েভ। ঘাড় ফিরিয়ে গ্রামের দিকে তাকালো রাহাত। ধুলোমাখা পথটা এখনও নির্জন। 'এখুনি ফিরে আসবে ওরা,' দ্রুত বললো ও। 'এখানে আর দেরি করা উচিত নয় আমাদের।'

'কোন্‌দিকে যাবো? গ্রামের ভেতর গিজগিজ করছে

'এই পাঁচিল ধরে এগোবো আমরা। পাঁচ বছর আগে এখানে এসে কোথাও যেতে বাকি রাখিনি···সব চিনি। পেনিনসূলার মাথার দিকে উঠে যেতে হবে আমাদের···'

'কিন্তু আপনি···আপনার পরিচয়···?' আবার জানতে চাইলো ম্যালোরি।

'মেজর রাহাত খান। ব্রিটিশ মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স।' খপ্ করে সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্টের কনুই চেপে ধরলো রাহাত, টেনে নিয়ে চললো তাকে। 'গুলি খাবার ইচ্ছে না থাকলে আমার সাথে ঝেড়ে দৌড়াও।'

চার

বেলা দশটা পর্যন্ত একনাগাড়ে হাঁটলো ওরা। পাহাড়ী এলাকা, বেশিরভাগ সময় হয় চড়াই বেয়ে উঠতে হলো, না হয় উতরাই বেয়ে নামতে হলো। অথচ এখনও ওরা পাপাগোপালার ছায়া পর্যন্ত দেখতে পায়নি। প্রথম দিকে গ্রীণ এবং ম্যালোরি, দু'জনেই আভাসে ইঙ্গিতে বিশ্রামের প্রস্তাব করেছে, কিন্তু ওদের কথা কানে তোলেনি রাহাত। তারপর সরাসরি প্রতিবাদ জানিয়েছে গ্রীণ, 'একটু জিরিয়ে না নিলে আমার পক্ষে আর হাঁটা সম্ভব নয়,' বলে দাঁড়িয়ে পড়েছে সে।

গ্রীণকে পাশ কাটাবার সময় তার একটা হাত ধরলো রাহাত, কিন্তু হাঁটার গতি কমালো না। অগত্যা তার সাথে হাঁটতে হলো

গ্রীণকে। 'জার্মানরা বসে নেই,' কঠিন সুরে বললো রাহাত। 'আসছে। বিশ্রাম নেবার আগে দু'দলের মাঝখানে যত বেশি ফাঁক রাখা যায় ততোই ভাল।'

কোথায় দু'শো লোক আর কোথায় তিনজন লোক—দু'টো দল হয় কিভাবে? মনে মনে হেসেছে ম্যালোরি।

এরপর আর মুখ খোলেনি গ্রীণ, বুঝে নিয়েছে আপত্তি জানিয়ে লাভ নেই। রাহাত সম্পর্কে অনেক কৌতূহল ম্যালোরির মনে, কিন্তু প্রশ্ন করে লাভ হয়নি কিছু। গম্ভীর সুরে তাকেও জানিয়েছে রাহাত, 'কথা বললে দম ফুরোয়, সেটা হাঁটার কাজে ব্যয় করো।'

সরু একটা ফুটপাত ধরে এগোচ্ছে ওরা। কোথাও সেটা এঁকে বেঁকে এগিয়েছে, কোথাও খানিক পরপর বাঁক নিয়েছে, সেই সাথে বারবার বদলে যাচ্ছে তার গা—এই বালির ওপর দিয়ে হাঁটছে ওরা, এই আবার পাথরের ওপর দিয়ে, সামনে মাঝে মধ্যে ক্ষতবিক্ষত মাটিও পড়েছে। পথের পাশে একবার জলপাই গাছের ঝোপ পড়লো। তারপর এই পথ ধরেই পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এল ওরা, চূড়াটা বোল্ডার দিয়ে ঘেরা। তারপর ঢাল বেয়ে নেমে এল নিচে, নিচে ঝোপ-ঝাড় ভর্তি উপত্যকার ভেতর দিয়ে এগিয়েছে পথ। পথের ধারে ছোট ঝর্ণা, খিলখিল হাসির আওয়াজ তুলে নিচের দিকে নাচতে নাচতে নেমে যাচ্ছে কাচের মতো স্বচ্ছ পানি। তারপর আবার একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠলো ওরা। এখানে উঠে থামলো রাহাত। এই চূড়া থেকে উত্তর দিকে অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে। কাটায়রা থেকে এদিকেই এসেছে রোডটা। কয়েকটা বাঁক নিয়েছে ওটা, কয়েকটা ঢালের নিচে

হারিয়ে গেছে, তারপর ওদের কাছাকাছি এক সার পাহাড়ের পাশে, ঘন ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর মুখ লুকিয়েছে।

'এখান থেকে ওদেরকে আমরা আসতে দেখবো,' গোল একটা বোল্ডারের মাথায় লাফ দিয়ে উঠে বসে বললো রাহাত। 'আমাদের সমস্যা হবে পানি। মালভূমিতে ওটা বোধহয় পাওয়া যাবে না।'

'এটা হয়তো কিছুটা সাহায্য করবে,' কোটের বোতাম খুলে বেল্টের সাথে আঁটকানো পানির একটা বোতল বের করে বললো গ্রীণ। 'আমার অফিসার সেকেণ্ড-লেফটেন্যান্ট যখন আপনার মাথায় পাথর ঠুকতে যাচ্ছিলেন, তখন একটা জার্মান লাশের বেল্ট থেকে এটা আমি খুলে নিই।'

'এসব ব্যাপারে টনটনে জ্ঞান রাখে গ্রীণ,' মৃদু হেসে রাহাতকে বললো ম্যালোরি। 'কষ্টে পড়ার আগেই কষ্ট লাঘবের ব্যবস্থা সেরে রাখে।' এক সেকেণ্ড থেমে প্রশ্ন করলো, 'এবার আপনার সম্পর্কে আরও কিছু জানতে পারলে খুশি হতাম।'

'আমি একজন সৈনিক,' বললো রাহাত। 'মেজর রাহাত। আর কি জানার থাকতে পারে বলে মনে করো?'

'মেজর রাহাত···নামটা ভারতীয় বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু দেখতে আপনি জার্মানদের মতো, ব্যাপারটা কি?'

'অতি সহজ। ঠিকই ধরেছো, আমি ভারতীয়। দেখে মনে হচ্ছে জার্মান—আসলে বলতে পারো, রঙ মেখে সং সেজেছি।'

'তারমানে কোনো ধরনের কোনো লোশন···'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আপনারা, মানে ভারতীয়রা এই যুদ্ধে···?'

'তোমাদের যুদ্ধ আমরা কেন করছি, এই তো?' গম্ভীর দেখালো রাহাতকে। 'কারণ, তোমাদের সরকার কথা দিয়েছে এই যুদ্ধে মিত্রপক্ষের সাথে ভারতীয়রা যদি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ে, যুদ্ধ শেষ হলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবী মেনে নেয়া হবে।'

'হ্যাঁ, এই ধরনের একটা কথা শুনেছি বটে,' বললো ম্যালোরি। "কিন্তু আপনার সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানতে ইচ্ছে করছে আমার। যেমন, একজন ভারতীয় হয়ে আপনি জার্মান ভাষা শিখলেন কোত্থেকে?'

'শুধু জার্মান নয়, ইটালিয়ান, গ্রীক আর ফ্রেঞ্চ ভাষাও জানি আমি। আসলে দোষ তোমার একার নয়, ভারতীয়দের, বিশেষ করে ভারতীয় বাঙালীদের সম্পর্কে গোটা ইংরেজ জাতির কোনো ধারণাই নেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম শুনেছো?'

'টেগোর—নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন?' অপ্রতিভ একটু হাসলো ম্যালোরি। 'তিনি কি বাঙালী ছিলেন?'

মাথা ঝাঁকালো রাহাত।

'কিন্তু আপনি এখানে, মানে টাটরায় এলেন কিভাবে?'

'কয়েক মাস বলকানে ছিলাম,' বললো রাহাত। 'বিশেষ কাজে আমাদের কয়েকজনকে...'

'তারমানে বলকানে যে-সব স্যাবোটাজের ঘটনা ঘটেছে...?'

'হ্যাঁ। সবগুলোর পেছনে ছিল আমার টিম।'

'শত্রু এলাকায় টিম নিয়ে অপারেশন চালানো!' আঁতকে ওঠার ভঙ্গি করে চুপ করে গেল ম্যালোরি।

'শেষের দিকে টিম আর থাকলো কই!' বললো রাহাত।

'আমি একাই যতটুকু পেরেছি করেছি। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি বহুবার। স্বদেশ প্রেমের জন্যে ততটা নয়, ব্রিটেনের প্রতি প্রেমের তো প্রশ্নই ওঠে না ; আমার এই নিষ্ঠার প্রধান কারণ যুদ্ধে নেমে আমি পরিষ্কার বুঝেছি, সত্যিই অন্যায় করছে জার্মানরা। আমি লড়ছি ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যে, স্থির করেছি জান-প্রাণ দিয়ে লড়ে যাবো।'

'বলকানে থাকার সময় একবারও আপনি ধরা পড়েননি ?' অবিশ্বাসের সুরে জানতে চাইলো ম্যালোরি।

'না। তবে দু'বার আমাকে খুন করার চেষ্টা হয়েছিল। একবার গিঅরে, আরেকবার বুদাপেস্টে। এরপর গা-ঢাকা দিই আমি। জাল কাগজপত্র যোগাড় করে জার্মান সেজে বসি।'

'তারমানে মেজর রাহাত হলেন ডঃ রিচার্ড মেয়র ?'

'না। ওই পরিচয় আরও পরে নিই। প্রথমে আমি ওয়ার্ণার স্মীট হই। এই ছদ্ম পরিচয় নিয়ে বুদাপেস্টের জার্মান কম্যুনিটির সাথে খোলামেলা ভাবে মেলামেশা করতে কোনো অসুবিধে হয়নি।' ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে, পাহাড় সারির দিকে তাকালো রাহাত। রোডের যতদুর দেখা যায়, কোথাও একটা ছায়া পর্যন্ত নড়ছে না। কিন্তু জানা কথা, ওদিক দিয়েই আসবে জার্মানরা।

'ওদিকে মুখ করে বসলেই পারেন,' বললো ম্যালোরি। 'নাকি আপনি ভাবছেন আমরা ঘুর পথে এসে দেরি করে ফেলেছি, ইতিমধ্যে রোড ধরে আরও সামনে এগিয়ে গেছে ওরা ?'

'এটা আমার একটা পুরানো অভ্যেস,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো রাহাত। 'বিপদ যেদিক থেকে আসবে বলে মনে করি সেদিকে পিঠ দিয়ে থাকা, বিপদ যাতে বুঝতে না পারে আমি তার জন্যেই

অপেক্ষা করছি।'

কিছুক্ষণ আর কোনো কথা হলো না। গ্রীণ আর ম্যালোরি দু'জনেই খুঁটিয়ে দেখছে রাহাতকে। এই লোকের ব্যক্তিত্ব, সাহস, চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং বুদ্ধির কিছু কিছু প্রমাণ এরই মধ্যে পেয়েছে ওরা, কিন্তু তবু কেন যেন মনে হচ্ছে, মেজর সম্পর্কে এখনও অনেক কিছু জানতে বাকি আছে তাদের।

উত্তর দিকে তাকালো রাহাত। পরিষ্কার আকাশে কালো ধোঁয়ার স্তম্ভটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। সন্দেহ নেই, ম্যাসেডোনিয়ার আকাশ পরিষ্কার থাকলে এই ধোঁয়া সালোনিকা থেকেও দেখা যাচ্ছে। পাহাড় আর ধূসর রঙের ঝোপ-ঝাড়গুলোর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে এল ও। নির্জন, কোথাও কোনো কিছুর নড়াচড়া নেই। ওই পাহাড়সারির কোথাও দিয়ে ভয়ঙ্কর একটা জার্মান দল মাউন্ট জার্ভোস দখল করার জন্যে মার্চ করে এগিয়ে আসছে, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না।

'তারপর ?'

'স্যাবোটাজের কাজ শেষ করলাম। এবার ফেরার পালা।'

'কিন্তু কর্নেল ব্রিজেলবার্ডকে আপনি বোকা বানালেন কিভাবে ?'

'ধোঁকা দিতে হলে খুব বড় ধরনের ধোঁকা দিতে হয়,' মুচকি হেসে বললো রাহাত। 'কথাটা ঠিক আমার নয়, হিটলারের। আমি যদি স্রেফ একজন জার্মান নাগরিক হিসেবে উতরে যেতে চাইতাম, ওরা আমার গতিবিধির ওপর বাধা-নিষেধ আরোপ করতো। কিন্তু ভয়ংকর অ্যাবওয়েরের নাম শুনে পিলে চমকে ওঠে ব্রিজেলবার্ডের। টাটরায় ওঠার আগে থেকেই অ্যাবওয়ের

সম্পর্কে অনেক কিছু জানা ছিল আমার। বলকানে আমার পেছনে ওরাই তো উঠেপড়ে লেগেছিল। ধরেই নিয়েছিলাম, ফেরার পথে রাস্তায় কোথাও আমাকে খুন করার জন্যে অ্যাবওয়ের আততায়ী লেলিয়ে দেবে।'

'তারমানে টাটরায় আপনার উপস্থিতি কোনো প্ল্যানের অংশ নয়?' অবাক হয়ে জানতে চাইলো ম্যালোরি।

'না। কাজ সেরে এথেন্সে যাচ্ছিলাম, জাহাজ ধরে মিশরে ফিরবো বলে। কিন্তু ইস্তাম্বুল-এথেন্স ফেরী শেষ মুহূর্তে বাতিল করে দেয়া হয়। ব্রিজেলবার্ড যখন টাটরা দখল করে নিল, খুব একটা আশ্চর্য হইনি আমি। আরোহীদের তালিকায় এতগুলো জার্মান রয়েছে দেখে ওদের কিছু একটা কুমতলব আছে বলে আগেই আমার সন্দেহ হয়েছিল।'

'আচ্ছা, ওয়্যারলেস সেট দু'টো কি আপনিই...?'

কথা না বলে মৃদু হাসলো রাহাত।

'আর কেবিনে ঢুকে আমাদের বাঁধন আপনিই...?'

রাহাতের মৃদু হাসি আরেকটু উজ্জ্বল হলো।

'আর ডিমোলিশন চার্জটা?'

বড় করে একটা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো রাহাত, 'হ্যাঁ, আমিই চোর। আধ খোলা রাকস্যাকের ভেতর ছিল ওটা, দেখতে পেয়ে চুরি করার লোভটা সামলানো গেল না। কিন্তু একটু পরই অন্ধকার ডেকে ধাক্কা খেলাম একজন সৈনিকের সাথে। আরেকটু হলে সব ভণ্ডুল করে দিত ব্যাটা। আন-আর্মড কমব্যাটে কারও চেয়ে কম যাই না, তা না হলে ওই লোকটা নয়, রেলিঙের ওপর দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে আমাকেই পড়তে

হতো সাগরে। টাটরার তীরে ভেড়ার সময়টা ছিল আমার জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

সাগ্রহে জানতে চাইলো ম্যালোরি, 'কেন, কেন ?'

'অনেক কারণে। তীরে ভেড়ার পরমুহূর্ত থেকে ব্রিজেল-বার্ডের সমস্ত মনোযোগ ছিল তাড়াতাড়ি ট্রুপ নামিয়ে কাটায়রা দখল করার দিকে। ঠিক ওই সময় স্যাবোটাজের ব্যাপার নিয়ে বিশেষ চিন্তা-ভাবনা করার ফুরসত তার ছিল না। কিন্তু পরে ঠাণ্ডা মাথায় সব ভেবে দেখার সময় পেত সে। কিন্তু তখন যাতে আমাকে নাগালের মধ্যে না পায় সেটা নিশ্চিত করাই ছিল আমার প্রধান কাজ। জানতাম, প্রথম ওয়্যারলেস সেটটা এক সময় মেরামত করে ফেলবে ওরা। তখন আমার আসল পরিচয় জানতে খুব বেশি সময় লাগবে না ওদের। কাজেই যা করার টাটরা তীরে ভেড়ার পর কিছুক্ষণের মধ্যে করতে হবে...'

'টাইম বোমার ফিউজ কখন সেট করেছিলেন ?' উত্তরটা শোনার জন্যে ব্যগ্র দেখালো ম্যালোরিকে। কিন্তু লক্ষ্য করলো, তার কাঁধের ওপর দিয়ে তাদের পিছনে, পাহাড় সারিগুলোর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে গ্রীণ। মেজর রাহাতের ভয়টা ছোঁয়াচে।

'ঠিক যখন ফেটেছে, তখনই। ওটা কাউকে খুন করবার জন্যে সেট করা হয়নি, ডিসট্র্যাকশন চেয়েছিলাম।'

'যদি আগেই ফেটে যেত ?'

'পানিতে নেমে কুমীরকে ভয় পেলে চলবে না, ম্যালোরি,' বললো রাহাত। 'এটা আমরা একটা যুদ্ধ করছি, ছেলেখেলা নয়। এই দু'শো অ্যালপেনকরপ্স্ সৈনিক মিত্রপক্ষের এমন ক্ষতি

করতে পারে যা কল্পনা করতেও ভয় হয়। কিভাবে সম্ভব এখনও তা আমি জানি না, কিন্তু ওদেরকে মেরে খতম করার আশা আমি ছাড়িনি। তুমি নিশ্চয়ই আঁচ করতে পেরেছো, মাউণ্ট জার্ভোসের ওপর আশ্রমে যাচ্ছে ওরা, ওখানে একটা অবজার্ভেশন পোস্ট তৈরি করবে বলে?'

'হ্যাঁ। সম্ভব হলে ওদের আগে ওখানে আমাদের পৌঁছানো দরকার, এটাও বুঝি, যদি আদৌ সম্ভব হয়। কিন্তু একটা জিনিস বুঝি না।'

'সেটা কি?'

'আশ্রমে ওরা যারা আছে তারা সবাই সন্ন্যাসী, কারও সাতে-পাঁচে থাকে না। জার্মানদের ঠেকাবার জন্যে কিভাবে আপনি ওদেরকে দুর্ধর্ষ একটা ব্যাটালিয়নে পরিণত করবেন? ওখানে কি কম্যুনিকেশনের সুবিধে আছে, যার সাহায্যে মেইনল্যাণ্ডের সাথে যোগাযোগ করতে পারবো আমরা?'

'সালোনিকা পর্যন্ত টেলিফোন লাইন আছে, আর কিছু আছে কিনা জানা নেই আমার,' বললো রাহাত। 'টেলিফোন লাইনও কেটে দেয়া হয়েছে।' আধপোড়া চুরুটটা ফেলে দিয়ে জুতো দিয়ে চেপে ধরলো ও, তারপর জুতোর ডগা দিয়ে সেটাকে বালির ভেতর সেঁধিয়ে দিল। 'না, জার্মানদের বাধা দেবার জন্যে সন্ন্যাসীদের আমরা কাজে লাগাতে পারবো বলে মনে হয় না। কিন্তু আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি কি শিখেছি জানো? শিখেছি, বিপদ আসছে দেখলে সেটার সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে হয়, তারপর মোকাবিলা করার একটা না একটা উপায় বেরিয়েই যায়।' চোখ-মুখ লাল, প্রায় নিষ্ঠুর হয়ে উঠলো। 'যাই

ঘটুক না কেন, জার্ভোস দখল করার জন্যে এগোতে শুরু করলে যে-কোনো মূল্যে যে-কোনো ভাবে জার্মানদেরকে বাধা দিতে হবে।' ঠোঁটের কোণ বেঁকে গেল রাহাতের, মনে হলো নিজের ভাগ্যকে চ্যালেঞ্জ করে বিদ্রূপের হাসি হাসছে সে। 'একেবারেই যদি কোনো উপায় না দেখি, আশ্রমে আগুন ধরিয়ে দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টাও তো করতে পারবো? গালফের কয়েক মাইল ওদিক দিয়ে উপকূল ঘেঁষে ব্রিটিশ ট্রুপস আসা-যাওয়া করছে। আশ্রমে আগুন লাগানোটাই বোধহয় একমাত্র সমাধান।'

অবাক বিস্ময়ে রাহাতের দিকে তাকিয়ে থাকলো ম্যালোরি আর গ্রীণ। অন্তরের অন্তস্তল থেকে ম্যালোরি অনুভব করলো, ভাগ্য তাকে এমন এক ব্যক্তিত্বের সামনে নিয়ে এসে হাজির করেছে যার কাছ থেকে দেশপ্রেম, সৎসাহস, কর্তব্যবোধ থেকে শুরু করে আরও অনেক কিছু শেখার আছে তার। আর গ্রীণ সবিস্ময়ে উপলব্ধি করলো, এতদিন সে শুধু ম্যালোরিকেই খাঁটি উচ্চাভিলাষী জন্ম-যোদ্ধা বলে মনে করে এসেছে, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তারচেয়েও এককাঠি সরেস নমুনা এই ভারতীয় মেজর, মেজর রাহাত খান।

কাটায়রা থেকে এগিয়ে আসা রাস্তার দিকে আবার তাকিয়ে আছে রাহাত। ভাবছে, চব্বিশ ঘণ্টার ওপর হয়ে গেল তারা কেউ ঘুমায়নি। ওদের দু'জনের বিধ্বস্ত চেহারা দেখে নিজের চেহারার অবস্থা আন্দাজ করে নিতে অসুবিধে হলো না। শুধু যে শরীরটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তাই নয়, সেই সাথে মাথাও আগের মতো স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করছে না। লক্ষণ ভাল নয়, এগুলো বিপদ সংকেত। কাজেই সময় থাকতে এখুনি সাবধান হওয়া

দরকার।

বিশ্রামের কথা আবার তুলতে যাচ্ছিলো গ্রীণ, এই সময় রাহাতই মুখ খুললো, 'পৌনে এক ঘন্টা ঘুমিয়ে নিতে পারলে জাদুর মতো কাজ হবে। দিন ফুরোবার আগেই শরীরের প্রতিটি আউন্স শক্তি কাজে লাগাবার দরকার হতে পারে। কিন্তু সবাই নয়, একজনকে পাহারায় থাকতে হবে।' ম্যালোরির চোখে চোখ রেখে নিঃশব্দে হাসলো ও। 'এখন প্রশ্ন হলো, আমার ওপর তোমাদের যথেষ্ট বিশ্বাস আছে কিনা। আর যদি মনে করো তোমরা ঘুমালে আমি জার্মানদের দলে ভিড়ে যাবো···'

হেসে উঠলো ম্যালোরি। তারপর তাড়াতাড়ি বললো, 'মাফ করবেন, কষ্টটুকু আমাকে স্বীকার করতে দিন। আপনার ওপর দিয়ে অমানুষিক ধকল গেছে···'

কাঁধ ঝাঁকালো রাহাত। 'ভাল কথা!' বলে বোল্ডার থেকে নেমে পড়লো ও। পেছনের রাস্তাটা শেষ একবার দেখে নিয়ে বালির ওপর শুয়ে পড়লো। শুয়ে ঢিল দিল শরীরে, তারপরই ঘুমিয়ে পড়লো।

পাঁচ

ঘুম ভাঙার সাথে সাথে সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে ওঠে রাহাত, ওর সমস্ত ইন্দ্রিয় তাৎক্ষণিক তৎপরতার জন্যে তৈরি হয়ে যায়। বলকানের অভিজ্ঞতা আরও একটা অভ্যেস গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে ওকে—ঘুম ভাঙার পর কয়েক সেকেণ্ড মরার মতো পড়ে থাকে, কিছু শব্দ না শোনা পর্যন্ত চোখ মেলে না। পাশ ফিরে বালির ওপর শুয়ে আছে ও, পিঠটা ঠেকে আছে পাথরের গায়ে, চোখ না খুলে আওয়াজটা আবার শুনলো ও। পাথরের ওপর ঘষা খেলো বুট জুতো দ্রুত, ভোঁতা একটা শব্দ হলো—রাইফেলের বোল্ট টানলো কেউ। শিরদাঁড়ার কাছে ঠাণ্ডা লাগলো, শিরশির করে উঠলো ঘাড়ের পিছনটা। তারপর ম্যালোরির গলা শুনতে পেল ও।

'ফর গডস সেক, গ্রীণ, নড়ো না!'

শরীরের সব পেশী ঢিল দিয়ে রাখলো রাহাত। চোখের পাতা সামান্য একটু মেললো। বালির ওপর উঠে বসেছে গ্রীণ, কাপড়টা এখানে সেখানে ভাঁজ খেয়ে আছে, শরীরের পাশে পড়ে

থাকা মেশিন-পিস্তলের দিক থেকে ধীরে ধীরে একটা হাত সরিয়ে আনছে সে। চেহারা দেখে বোঝা যায়, এইমাত্র ঘুম ভেঙেছে তার। আধবোঁজা চোখে ম্যালোরিকে কোথাও দেখতে পেল না রাহাত। আন্দাজ করলো, ওরা দু'জন ঘুমিয়ে পড়ার পর নিশ্চয়ই ম্যালোরিও ঘুমে ঢুলতে শুরু করেছিল, এবং সেই ফাঁকে একটা জার্মান পেট্রল কাছে চলে এসেছে। ঘুমোবার আগে থেকেই কোটের পকেট হাত ভরা ছিল রাহাতের, এখনও তাই আছে। ল্যুগারের বাট পেঁচিয়ে ধরলো আঙ্গুলগুলো। সমস্যা হলো, যথেষ্ট ক্ষিপ্রতার সাথে সিধে হয়ে বসতে হবে। গ্রীণের বিমূঢ় দৃষ্টি দেখে বুঝতে অসুবিধে হলো না, যে বোল্ডারে পিঠ ঠেকিয়ে রেখেছে ও, ঠিক সেটার পিছনেই এসে দাঁড়িয়েছে আগন্তুক। কিন্তু ক'জন? আবার বুটের আওয়াজ। পরমুহূর্তে ওর সামনে বালির ওপর একজন লোক আর তার হাতে ধরা রাইফেলের ছায়া পড়লো।

'থামো! ফর গডস সেক, থামো!' এতোই আতংকিত শোনালো ম্যালোরির কণ্ঠস্বর, ভয়ে শিউরে উঠলো রাহাত। 'ব্যাপারটা শোনো আগে—না! গুলি করো না!'

রাইফেল ব্যারেলের ছায়া নিচের দিকে নামতে দেখলো রাহাত। আন্দাজ করলো, মাজলটা ওর দিকে, হয় মাথা নয়তো বুকে তাক করা হয়েছে। জানে, এখন যদি চুল পরিমাণ নড়ে ও, ট্রিগার টিপে দেবে ছায়া। পিস্তল ধরা হাতের তালু ঘেমে গেছে। গ্রীণের মুখ ঝুলে পড়েছে, তাকে পাথরের একটা নিষ্প্রাণ মূর্তি বললেই হয়। নড়ে উঠলো ছায়া, আরেক পায়ের ওপর শরীরের ভার চাপালো, তারমানে রাইফেলের পিছু-ধাক্কা সামলাবার

জন্যে তৈরি হলো সে।

'যীশুর দোহাই, মাথা ঠাণ্ডা করো! আমার কথা বুঝতে পারছো তুমি? ইংরেজী বোঝো?' উত্তেজনায় কেঁপে গেল ম্যালোরির গলা। 'আমরা তোমার···

'হ্যাঁ, ইংরেজী বুঝি,' ভাঙা ভাঙা উচ্চারণ, রাহাতের ঠিক পিছন থেকে এল। গলাটা ভারি, এবং চেনা চেনা লাগলো রাহাতের। 'তোমরা দু'জন এই জার্মানের সাথে কেন?'

'তুমি ভুল করছো, পাপাগোপালা,' নরম সুরে দ্রুত বললো ম্যালোরি। 'উনি জার্মান নন, ভারতীয়, আমাদের সাথেই যুদ্ধ করছেন। ঘুম থেকে জেগে ওঠার সুযোগ দাও, তোমার সাথে ইংরেজীতে কথা বললেই সব বুঝতে পারবে···'

'জার্মানদের মধ্যে ইংরেজী বলতে পারে এমন লোক ঢের আছে,' কঠিন সুরে বললো পাপাগোপালা। 'আমিও তো ইংরেজী বলি, অথচ আমি একজন গ্রীক। ও বুঝি তোমাদের তাই বুঝিয়েছে—জার্মান নয়, ভারতীয়? দেখো, আমাদের হাতে সময় নেই। ওকে মারতে হবে, এখুনি!' আবার রাইফেলের ছায়া নড়ে উঠলো, বোধহয় নতুন করে রাহাতের দিকে লক্ষ্যস্থির করলো পাপাগোপালা। বুলেটের ধাক্কা খাবার জন্যে রাহাতের পেশী শক্ত হয়ে গেল। পাপাগোপালার গলা শুনে আরেকটা বিপদের গন্ধ পেয়েছে ও। পাপাগোপালাকে বোঝাবার জন্যে আবার দ্রুত কথা বলছে ম্যালোরি। এবার সম্পূর্ণ নতুন ভঙ্গি নিয়েছে সে। আবেদন নয়, হুকুমের সুরে কথা বলছে সে।

'বাড়াবাড়ি করো না, পাপাগোপালা! যা বলছি শোনো। ভদ্রলোকের নাম রাহাত খান। উনি একজন ভারতীয়। উনি

অনর্গল জার্মান ভাষা বলতে পারেন। তোমার ইংরেজীর চেয়ে অনেক ভাল ভাবে। আমাদেরকে পালাবার সুযোগ করে দেবার জন্যে একজন জার্মানকে তিনি নিজের হাতে খুন করেছেন। আমি তার সাক্ষী। দু'টো মেশিন-পিস্তল ছিনিয়ে নিয়ে সেগুলো আমাদের দিয়েছেন। এই যে এখানে আমাদের দেখছো, উনিই পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছেন। তোমাদের এই পেনিনস্যুলায় আগেও একবার এসে গেছেন, এখানের সব তাঁর চেনা। এসব যদি তোমার জন্যে যথেষ্ট না নয়, যাও, আবার তুমি সাগরে ঝাঁপ দাওগে। আমি নির্দেশ দিচ্ছি, মেজর রাহাতের দিক থেকে রাইফেল সরিয়ে নাও। ঘুম থেকে উঠে উনি নিজেই সব বলবেন।'

'তুমি যা শুনেছো তা সত্যি কিনা জানলে কিভাবে?' গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলো পাপাগোপালা। যদিও, গলার আওয়াজে একটু যেন দ্বিধার ভাব ফুটে উঠলো। রাইফেলটা এখনও সে রাহাতের দিকেই তাক করে ধরে আছে।

'আমরা একই সেনাবাহিনীর লোক, উনি মিথ্যে কথা বললে ধরতে পারবো না, আমাকে তুমি এতোই বোকা মনে করো?' পাল্টা প্রশ্ন করলো ম্যালোরি। পাপাগোপালার চেহারায় ইতস্তত ভাব ফুটে উঠতে দেখে তাড়াতাড়ি বললো সে, 'মেজরের ঘুম ভাঙাচ্ছি আমি। কোনোরকম বোকামি করো না। ইতিমধ্যে হয়তো তাঁর ঘুম ভেঙে গেছে...'

'হ্যাঁ, আমি জেগেই আছি।' ধীরে ধীরে কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্ট কণ্ঠে বললো রাহাত। লক্ষ্য করলো, রাইফেলের ছায়া আরেকদিকে ঘুরে গেল। 'এখন আমি উঠে বসবো, যাতে গ্রীক বেরাদার

আমার চেহারাটা আরও ভাল করে দেখতে পায়। রেডি ?'

'ঠিক আছে, আপনি উঠে বসতে পারেন,' বললো পাপাগোপালা, বলার সময় এক পা পিছিয়ে গেল সে।

উঠে বসলো রাহাত, শরীরের ঊর্ধ্বগতিটা মন্থর হতে না দিয়ে সেই সাথে সিধে হয়ে পায়ের ওপর দাঁড়িয়েও পড়লো, দাঁড়াবার সময় সাবলীল ভঙ্গিতে ঘুরিয়ে নিল শরীরটা। দেখলো, ভয়ালদর্শন ভিলেনের মতো ওর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাপাগোপালা, রাইফেলটা সরাসরি ওর দিকে তাক করা না হলেও ট্রিগার টেপার আগে মাজলটা ইঞ্চি খানেক ঘুরিয়ে নিলেই বুকে গুলি খাবে ও। লক্ষ্য করলো, পাপাগোপালার হাতে ওটা একটা জার্মান কারবাইন। এটা নিয়েই টাটরা থেকে লাফিয়ে গালফে পড়েছিল সে, জেটির স্কি-সোলজারদের গুলিও করেছে এটা দিয়ে। শরীরের পাশে ঢিলেঢালা ভাবে ঝুলছে রাহাতের হাত, চোখে-মুখে ড্যাম-কেয়ার ভাব, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লোকটার দিকে। রুক্ষ, চ্যালেঞ্জের সুরে একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করলো ও, 'বলো ?'

'আপনি জার্মানদের মতো দেখতে…'

'আর তুমি ডাকাতের মতো।'

ঝিক্ করে আগুন জ্বলে উঠলো পাপাগোপালার চোখে। গান মাজল ওপর দিকে উঠলো, তারপর আবার নেমে গেল। চেহারায় গাম্ভীর্য নিয়ে কয়েক সেকেণ্ড রাহাতের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো সে, তারপর সবাইকে একটু আশ্চর্য করে দিয়ে প্রশংসার ভঙ্গিতে ওপর-নিচে মাথাটা একটু ঝাঁকালো। ম্যালোরির দিকে ফিরলো সে, রাহাতকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে দ্রুত কথা

বলতে শুরু করলো। 'সময় নেই, সেকেণ্ড-লেফটেন্যান্ট। ওই পাহাড়ের ওপর দিয়ে এদিকে আসছে জার্মান সৈন্য যে পাহাড়-কার্ণিশটার দিকে বারবার পিছন ফিরে তাকিয়েছে রাহাত হাত তুলে সেটা ম্যালোরিকে দেখালো সে। 'ওখানে উঠে ওরা তোমাদেরকে দেখতে পাবে। আর দেরি করা উচিত নয়।'

'কোন্ দিকে যাবো আমরা ?' জানতে চাইলো ম্যালোরি।

হাত তুলে আবার সেই পাহাড়ের মাথার কাছে কার্ণিশটা দেখালো পাপাগোপালা। তার হাত অনুসরণ করে সেদিকে তাকালো বটে ম্যালোরি, কিন্তু চেহারায় কোনো উদ্বেগ বা ব্যস্ততা ফুটলো না। নিচু হয়ে মেশিন-পিস্তলটা তুলে কাঁধের সাথে ঝুলিয়ে নিল সে, তারপর মাথা নাড়লো। বললো, 'বুঝলাম না, পাপাগোপালা। তুমি বলছো, ওদিক দিয়ে আসছে জার্মানরা, কাজেই ওদিকে নয় উল্টোদিকে যেতে হবে আমাদের।'

'উঁহুঁ,' দ্রুত বললো পাপাগোপালা। 'জামানরা ওদিক দিয়ে আসছে, কাজেই আমরাও ওদিকেই যাবো। কেন, একটু পরই বুঝতে পারবে। এসো! তাড়াতাড়ি করা দরকার আমাদের!'

'এক সেকেণ্ড!' ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছে না ম্যালোরি, পাপাগোপালাকে বিশ্বাস করা যায় কিনা এই সন্দেহে ভুগছে সে। 'রোড ধরে কোনো জার্মানকে আসতে দেখিনি আমরা, অথচ ওই পাহাড়ের ওদিকে যেতে হলে ওই রোড ছাড়া আর কোনো পথ নেই, এর কি ব্যাখ্যা দেবে তুমি ?'

নিজের অজান্তেই ঝট্ করে পাহাড়টার দিকে তাকালো গ্রীণ।

ওরা তর্ক করছে, মাঝখান থেকে কথা বললো রাহাত, 'ব্রিজেলবার্ডকে বলতে শুনেছি, কাটায়রায় খচ্চর পাওয়া যাবে

বলে আশা করে সে। সবার জন্যে নয় হয়তো, কিন্তু একটা অ্যাডভান্স পার্টি পাঠাবার জন্যে কয়েকটা পাবে সে। আমরা যখন ঘুর পথে এদিকে আসছি, সেই ফাঁকে একটা দল হয়তো ওই রোড ধরে সামনে এগিয়ে গেছে। এটা একটা সম্ভাবনা বটে। সেজন্যেই বারবার ঘাড় ফিরিয়ে ওদিকে তাকাচ্ছিলাম আমি।'

'ওখানে জিপাসাস আছে, জার্মানদের খচ্চর পেতে অসুবিধে হবে না,' বলে থো, থো করে থুতু ফেললো পাপাগোপালা। 'ওর বাবা গ্রীক হলে কি হবে, মা জার্মান। জার্মানদের ওপর ভারি ভক্তি তার। তার নিজেরই বেশ কিছু খচ্চর আছে

'কোথায় হাত বাড়ালে আরও যোগাড় হবে তাও সে জানে,' বললো রাহাত। 'ঠিক আছে, ধরে নিলাম, ওই দূরের পাহাড় থেকেই আসছে ওরা—আমরা এখন কোন্ দিকে যাবো ?'

'এখান থেকে নিচে নেমে অপেক্ষা করবো আমরা

'দাঁড়াও…!' ঠিক কি করতে চায় পাপাগোপালা এখনও ধরতে পারছে না ম্যালোরি। কিন্তু তার কথায় কান না দিয়ে সবাইকে নিয়ে পাহাড় থেকে নামতে শুরু করলো গ্রীক লোকটা। নামার এই পথটা দূরের পাহাড় চূড়া থেকে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাবে। এতক্ষণ ওরা যেখানে বিশ্রাম নিচ্ছিলো সেখান থেকে নিচের উপত্যকা একটা বিশাল ঝুল পাথরের আড়ালে পড়ে যাওয়ায় ভাল করে দেখতে পায়নি ওরা। ঘন ঝোপের ভেতর দিয়ে পথ, ধীরে ধীরে নামছে সবাই। পরিষ্কার দেখা গেল নিচের সরু উপত্যকাটাকে। চওড়া একটা ঝর্ণা কলকল শব্দ করে ছুটে চলেছে সাগরের দিকে। ঝর্ণার পানিতে এক জায়গায় কিছু পাথর, বেশির ভাগ পাথর পানি থেকে কোনোরকমে এক-আধটু

মাথা তুলে আছে। স্রোতের ওদিকের পাড়ে, পাথরগুলোর কাছ থেকে খুব বেশি হলে একশো গজ দূরে, ধুলিময় একটা পথের আভাস ধরা পড়লো রাহাতের চোখে, পাহাড়ের গোড়া পেঁচিয়ে চলে গেছে জার্ভোসের দিকে।

খানিক পর পাহাড়ের ঢালু কার্ণিশটা ওদের সামনের দিকে চলে এল, তাকাতে হলে ওপর দিকে চোখ তুলতে হয়। মেঘ মুক্ত আকাশের গায়ে কঠিন একটা আউটলাইনের মতো লাগছে ওটাকে, এখনও নির্জন। মেজাজ গরম হয়ে উঠলো ম্যালোরির, গ্রীক ব্যাটার মতলবখানা কি?

পিছন দিকে একবারও না তাকিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে দ্রুত নেমে যাচ্ছে পাপাগোপালা। ঠিক তার পিছনে চলে এল ম্যালোরি। 'আমি জানতে চাই, কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'পাইপের দিকে,' হাঁটার গতি না কমিয়ে শান্ত সুরে বললো পাপাগোপালা। পাহাড়-কার্ণিশের দিকে বারবার তাকাচ্ছে সে।

'পাইপ? কিসের পাইপ?'

'পাহাড়ী ঢালের পানি ওই পাইপের ভেতর দিয়েই তো ঝর্ণার দিকে নেমে যায়। রোডটা পানিতে ভেসে যেত বলে বহু বছর আগে এই টানেল তৈরি করা হয়। আমরা ওই পাইপ ধরেই নামবো। ওর ভেতর একবার ঢুকতে পারলে জার্মানরা আর আমাদের দেখতে পাবে না।'

'তোমার এই পাইপ কত বড়?'

'বেশ বড়। ছেলেবেলায় ওর ভেতর দিয়ে নিচে নেমেছি আমি

'তখন তুমি ছোট ছিলে,' ব্যস্ত সুরে বললো ম্যালোরি।

‘তাছাড়া, পাহাড়ের ওই কার্নিশে ওরা পৌঁছুলেই নিচের এই পথ দেখতে পাবে ওরা।’

‘সেজন্যেই তো আমরা লুকাবো। এই তো, পৌঁছে গেছি।’

পাহাড়ের অর্ধেকটাও নামেনি ওরা, এই সময় পথের কিনারা থেকে তর তর করে গভীর একটা নালায় নেমে গেল পাপাগোপালা। নালার দু'পাশের কিনারায় মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে পাথরের নিচু পাঁচিল, তাতে গভীরতা আরও কিছুটা বেড়েছে, ফলে ওখানে নেমে আসার সাথে সাথে চারদিক থেকে আড়ালে পড়ে গেল ওরা। পাপাগোপালার পিছু পিছু নামলো ম্যালোরি। তারপর গ্রীণ, সবশেষে রাহাত। নালার মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসলো পাপাগোপালা, ঘাস আর ঝোপের একটা চাপড়া খালি হাতে টেনে সরালো। তার পিছনে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে আছে ম্যালোরি। দেখলো, কংক্রিটের বড় একটা ড্রেন-পাইপের মুখ হাঁ করে আছে ওদের দিকে। গর্তটা ডায়ামিটারে তিন ফিটের কম হবে না, হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢোকার জন্যে যথেষ্ট। পাপাগোপালার পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো সে। দেখলো, পাইপের ভেতরটা প্রায় বিশ ডিগ্রী ঢালু হয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে, কাজেই ঢলের সময় অনায়াসে নেমে যেতে পারে পানি। পাইপের মুখের কাছে গ্রীণ আর রাহাতও হুমড়ি খেয়ে আছে। পাইপের ভেতর থেকে ভ্যাপসা একটা পচা শ্যাওলার গন্ধ এসে লাগলো ওদের নাকে। বেশ অনেকটা দেখা গেল ভেতরটা, কিন্তু শেষ মাথায় কোনো আলো নেই, কাজেই শেষটা কত দূরে তা বোঝার কোনো উপায় নেই। পালাবার এই রাস্তাটা ওদের তিনজনের কারোরই তেমন পছন্দ হলো না।

'পাইপটা কোথায় বেরিয়েছে আবার?' জানতে চাইলো রাহাত।

'ঝর্ণার পাশে। পানির ওপর পাথর পড়ে আছে, দেখেছেন? ওই পাথরের ওপর দিয়ে ঝর্ণা পেরোবো আমরা।'

'টানেলটা কত লম্বা?'

'বেশি নয়।'

'কি বলেন, মেজর?' রাহাতের দিকে ফিরলো ম্যালোরি। 'ভেবে দেখুন, আমরা সঠিক জানি না জার্মানরা এদিকে আসছে কিনা। সিদ্ধান্ত পাল্টে তারা হয়তো এখন ঠিক করেছে রোডের আরও সামনে কোথাও আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে।'

'জার্মানরা এদিকে আসছে কিনা জানতে হবে,' বললো রাহাত। 'যদি দেখি আসছে, তাহলে পাইপের ভেতর দিয়ে নামা যেতে পারে। আর যদি...'

রাহাতকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে পাপাগোপালা বললো, 'আমি জানি, আসছে ওরা। একটু পরই দেখতে পাবেন।' নালার ঢাল বেয়ে খানিকটা ওপরে উঠলো সে, হাত দিয়ে ঘন ঝোপ সরিয়ে তাকালো পাহাড়-কার্ণিশটার দিকে। দেখাদেখি বাকি সবাইও উঠে এল তার পাশে। ঘন ঝোপ সরিয়ে প্রত্যেকে নিজের জন্যে একটা করে ক্ষুদে জানালা তৈরি করে নিল। পনেরো সেকেণ্ডও হয়নি, ছ্যাঁৎ করে উঠলো ম্যালোরির বুক। আকাশের গায়ে মানুষের আউটলাইন দেখতে পেল ওরা। ছয়জন জার্মান পরস্পরের কাছ থেকে প্রত্যেকে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে ঢাল বেয়ে নেমে আসছে। ছয়জন একটা অর্ধবৃত্ত তৈরি করেছে. মাঝ-খানের দু'জন দু'পাশের চারজনের চেয়ে বেশ কিছুটা ওপরে।

নির্ভুল একটা পদ্ধতি, উপলব্ধি করলো রাহাত। ওপরের লোক দু'জন পাশের লোকদের চেয়ে অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে, এবং প্রয়োজনে নিচের লোকদের কাভার দেবার জন্যে গুলি করতে পারবে। দেখার সাথে সাথে ফিল্ড-গ্রে ইউনিফর্ম আর ক্যাপ অ্যালপেনকরপ্‌সের বলে চিনতে পারলো ও। 'আশ্চর্য লাগছে, ম্যালোরি! টহলের জন্যে এই এরিয়া বেছে নিল কেন ওরা?'

সাথে সাথে জবাব পাওয়া গেল পাপাগোপালার কাছ থেকে। 'কারণ ফুটপাতের কথা জিপাসাসের কাছ থেকে জানতে পেরেছে ওরা। কাটায়রা থেকে জার্ভোসে যাবার দু'টো মাত্র উপায়—রোড আর ফুটপাত। খচ্চর নিয়ে রোড ধরে গিয়েছে ওরা, কিন্তু আপনাদেরকে দেখতে না পেয়ে আবার ফিরে আসছে—ফুটপাতে আপনাদেরকে ফাঁদে আটকাবার জন্যে।' ঘন গোঁফে ঘন ঘন তা দিল সে। ডাকাতের মতো চেহারায় ক্ষীণ একটু হাসি ফুটলো। তারপর বললো, 'বুঝতে পারছি, আমার ওপর আপনাদের আস্থা হচ্ছে না। কিন্তু আমি যা বলছি, বুঝেশুনেই বলছি। ওদেরকে ফাঁকি দিতে হলে এই পাইপের ভেতর না ঢুকে কোনো উপায় নেই।'

'পাইপের দু'মুখে দু'জন লোককে দাঁড় করিয়ে রাখলেই ভেতরে আটকা পড়ে যাবো আমরা,' বললো রাহাত।

'না। কারণ, যখন দেখবো ঝর্ণা পেরোতে শুরু করেছে ওরা শুধু তখনই আমরা ঢুকবো পাইপের ভেতর। ওরা এই পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করবে, আমরা ওদের পায়ের নিচে দিয়ে নামতে শুরু করবো।'

'সেটা মন্দ নয়,' মন্তব্য করলো রাহাত। 'ঘটনা যদি ঠিক তাই ঘটে।' ক্ষুদে জানালা দিয়ে আবার টহল বাহিনীর দিকে তাকালো ও। এই অল্প সময়ের মধ্যে যতটা আশা করা যায় ঢাল বেয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি নেমে এসেছে জার্মানরা। মনে পড়লো, এরা কঠোরতম ট্রেনিং পাওয়া অ্যালপেনকরপ্‌স্‌ সৈনিক, দুর্গম এবং পাথুরে এলাকাতেই এদের জন্ম। এই পরিবেশ এবং পরিস্থিতি, দু'টোর সাথেই তাদের পরিচয় আছে। একটা ব্যাপারে খুঁত খুঁত করে উঠলো মন। পাপাগোপালার দিকে ফিরে জানতে চাইলো ও, 'জিপাসাস এই পাইপের কথা ওদেরকে বলেনি, জানলে কিভাবে তুমি ?'

চেহারায় ঘৃণা আর তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটিয়ে তুলে গ্রীক লোকটা বললো, 'জিপাসাস জানলে তো বলবে ! হাঁটাহাঁটি, শিকার এসবের মধ্যে নেই সে—পাহাড়ী এলাকায় হারিয়ে যাবার অদ্ভুত একটা ভয় আছে তার মনে। কি ঠিক করলেন, মেজর ?' এই প্রথম সরাসরি প্রাপ্য সম্মান দেখালো সে রাহাতকে।

'অপেক্ষা করছি। পাথরের ওপর দিয়ে ওরা ঝর্ণা পেরিয়ে এপারে চলে আসুক, তারপর টানেলে ঢুকবো আমরা।'

প্রতিবাদ করে কিছু বলতে যাচ্ছিলো ম্যালোরি, কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার চেয়ে উপরের একজন অফিসার, কাজেই শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল সে।

কাঁধে টোকা অনুভব করে ঝোপের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সিধে হলো ম্যালোরি, দেখলো তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রাহাত। মেজরের চেহারায় উদ্বেগ লক্ষ্য করে আশ্চর্য হয়ে গেল সে। 'কি ব্যাপার, স্যার ?'

'এ আমার ভাল ঠেকছে না, ম্যালোরি,' বললো রাহাত। ব্রিজেলবার্ড তার লোকজনকে খই-ছড়ানোর মতো ব্যবহার করছে কেন?'

'মানে? আপনার কথা আমি ঠিক···

'জার্ভোস দখল করার জন্যে দু'শো লোক নিয়ে এসেছে ব্রিজেলবার্ড। অন্তত. রুপেসকু থেকে টাটরায় ওঠার সময় তার হাতে দু'শো লোক ছিল বলে আমাকে জানায়। টাটরায় চারজন লোককে হারিয়েছে সে···'

'চারজন?'

'হ্যাঁ, চারজন। একজনকে তুমি সাগরে ফেলেছো। পালাবার সময় দু'জনকে খুন করে পাপাগোপালা। ডেক দিয়ে ডিমোলিশন চার্জ নিয়ে যাবার সময় আমি একজনকে সাগরে ফেলে দিই। তার বেয়োনেটটা কিন্তু খুব কাজ দিয়েছিল—ভেন্টিলেটর শাফটের ভেতর ওটা আটকে দিয়েছিলাম, চার্জটা রশির শেষ মাথায় ওটার সাথেই ঝুলছিল। জেটিতে পাপাগোপালার গুলি খেয়ে এবং চার্জ বিস্ফোরণে যারা মারা গেছে তাদেরকে বাদ দিলেও, গোটা ফোর্স থেকে দুই পার্সেন্ট কমে গেছে ওরা। তবু ব্রিজেলবার্ড শুধু আমাদেরকে খুঁজে বের করার জন্যে ছয়জন লোককে লাগিয়েছে কেন? এ থেকে অন্য একটা সম্ভাবনার কথা তোমার মনে উঁকি দিচ্ছে না, ম্যালোরি? ভীতিকর কিছু একটা?'

মেজর কি বোঝাতে চাইছে, সাথে সাথে ধরতে পারলো না ম্যালোরি। কিন্তু পরমুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে উঠলো তার চেহারা। 'আপনি বলতে চাইছেন, দল আরও ভারি হবে ওদের?'

রাহাতের ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ একটু হাসি ফুটে উঠেই দ্রুত

মিলিয়ে গেল। 'ঠিক তাই। হেভী রিইনফোর্সমেন্ট, খুব তাড়াতাড়ি আশা করছে ব্রিজেলবার্ড। তৈরি হও, ম্যালোরি, সিরিয়াস বিপদে পড়তে যাচ্ছি আমরা।'

'হেভী রিইনফোর্সমেন্ট? কিন্তু আসবে কোন্ পথে? এই দিনের বেলা নিশ্চয়ই আবার ওরা বোট নিয়ে...'

'না বোধহয়। এবার ওরা হয়তো সম্পূর্ণ আলাদা কোনো রাস্তা বেছে নেবে।' মুখ তুলে ওপর দিকে তাকালো রাহাত। মাথার ওপর পরিষ্কার আকাশ, কিন্তু এক কোণে কালো এক টুকরো মেঘ জমেছে। এক ঝাঁক সী-গাল ছাড়া চোখে পড়লো না কিছু। কাটায়রার দিকে উড়ে যাচ্ছে ওগুলো। 'আরও সাহায্য আশা না করলে শুধু আমাদের জন্যে ছয়জন লোককে পাঠাতো না সে।'

'হুঁ,' গম্ভীর সুরে বললো ম্যালোরি।

পাহাড়ের অর্ধেকটা নেমে এসেছে অ্যালপেনকরপ্‌স্ সৈনিকদের ছোট দলটা। একটু তেরছা হয়ে গেছে ওদের নামার পথটা, সরাসরি ঝর্ণার দিকে আসতে চাইছে। এখনও অর্ধ-বৃত্তের আকারে ছড়িয়ে আছে ওরা। পাপাগোপালার দিকে ফিরে নিচু গলায় জানতে চাইলো রাহাত, 'আশ্রমটা ভাল করে চেনা আছে তোমার?'

'দু'বছর ধরে ওখানেই আমি থাকি।'

'টেলিফোনের তার কেটে দেয়া হয়েছে। যোগাযোগের আর কোনো উপায় আছে কিনা জানো?'

'কিছু দরকার হলে কাটায়রায় ফোন করে সন্ন্যাসীরা, মাঝে মধ্যে সালোনিকাতেও করে।'

'ইমার্জেন্সীর জন্যে কোনো ওয়্যারলেস ট্র্যান্সমিটার নেই?'

'না, সে-ধরনের কিছু নেই।' ঝোপ সরিয়ে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে পাপাগোপালা, রাহাতের প্রশ্নগুলো মন দিয়ে শুনছে বলে মনে হলো না।

'ভাল করে চিন্তা করে জবাব দাও···ফেরো আমার দিকে!'

চমকে উঠে সিধে হয়ে গেল পাপাগোপালা। আদেশের কঠিন সুর শুনে অবাক হয়ে গেছে সে। 'জ্বী?'

'ফোন খারাপ হয়ে গেলে আশ্রমের ফাদার কি করেন, তখন যদি কোনো ইমার্জেন্সী দেখা দেয়?' জানতে চাইলো রাহাত।

'তখন কবুতর পাঠিয়ে খবর দেয়া-নেয়া করেন।'

'কবুতর?' তীক্ষ্ণ শোনালো রাহাতের কণ্ঠ। 'তারমানে ট্রেনিং পাওয়া কবুতর আছে আশ্রমে? ছেড়ে দিলে কোথায় যায় ওগুলো?'

'গালফের অপর দিকে—লিভাইতে।'

'তারমানে, মেইনল্যাণ্ডে?'

'হ্যাঁ। লিভাই অলিম্পাসের কাছেই, ওখানে আরও সন্ন্যাসী আছে।'

চিন্তিত ভাবে মাথা ঝাঁকালো রাহাত, কিন্তু আর কোনো প্রশ্ন না করে ঝোপের ফাঁক দিয়ে সামনের পাহাড়ের দিকে তাকালো। ঝর্ণার কিনারায় পৌঁছে গেছে জার্মানরা। সেটা পেরোবার সময় সামরিক সাবধানতা অবলম্বন করলো তারা। পা রাখার জন্যে কয়েক যুগ আগে ফেলা পাথরের ওপর দিয়ে একবারে মাত্র একজন করে এগোলো। একজন একজন করে ঝর্ণা পেরিয়ে এপারে চলে এল ছয়জনই। পাপাগোপালা এবং তার দল

যেখানে রয়েছে সেই পাহাড়ের ঠিক নিচে চলে এসেছে এখন জার্মানরা। শেষ লোকটা ঝর্ণা পেরিয়ে এদিকের পারে উঠে আসতেই পাইপে ঢোকার জন্যে তৈরি হলো পাপাগোপালা, মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসলো। এক এক করে বাকি সবাই অনুসরণ করলো তাকে। 'রেডি?' জানতে চাইলো সে।

কিন্তু সাড়া দিল না রাহাত। মাথাটা একদিকে কাত করে পিছন দিকে তাকালো ও। শ'খানেক গজ ওপরে তিনটে সরু নালা তিন দিক থেকে এগিয়ে এসে এক জায়গায় মিলেছে, এর-পর চওড়া হয়ে গেছে নালাটা। সেই নালার ভেতরই বসে রয়েছে ওরা। আরও ওপরে, পাহাড়ের মাথা ছাড়িয়ে আকাশে চোখ বুলালো ও। এক কোণে জমে থাকা কালো মেঘটা ইতি-মধ্যে উঠে এসেছে প্রায় মাথার ওপর।

রাহাতের দৃষ্টি অনুসরণ করে বিপদের আশংকাটা টের পেল ম্যালোরি। নিচু গলায় বললো সে, 'এখন বৃষ্টি নামলেই সর্ব-নাশের ষোলোকলা পূর্ণ হয়! পাইপের ভেতর সলিল সমাধি ঘটবে আমাদের।'

রাহাতের চেহারায় অনিশ্চিত একটা ভাব দেখা গেল, মৃদু গলায় বললো ও, 'রেডি।'

পাইপের ভেতর ঢোকার আগের মুহূর্তে কোটের পকেটে হাত ভরে হাতড়াতে শুরু করলো পাপাগোপালা। হাতটা বেরিয়ে আসতেই একটা ছুরি দেখতে পেল রাহাত। বোতাম টিপে ছুরির ফলাটা খাড়া করলো পাপাগোপালা, তারপর আবার ভরে রাখলো পকেটে।

ছুরিটা দেখে রীতিমত চমকে উঠেছিল রাহাত। কিন্তু ও

কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই দ্রুত গলায় জানতে চাইলো গ্রীণ, 'ওটা তুমি পেলে কোত্থেকে?'

ঘাড় ফিরিয়ে কটমট করে সার্জেন্টের দিকে তাকালো পাপাগোপালা। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো উত্তর না দিয়ে কড়া কিছু বলতে যাচ্ছে সে। তারপর কি ভেবে কর্কশ সুরে বললো, 'যেখান থেকেই পাই, এটা একটা সাধারণ ছুরি মাত্র। আমার।'

হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে ছিল রাহাত, উঠে দাঁড়ালো ও। তাকালো গ্রীণের দিকে। বললো, 'তুমি ঠিকই সন্দেহ করেছো, গ্রীণ। ওটা একটা জার্মান ছুরি। একজন ছত্রী সেনার গ্র্যাভিটি নাইফ।' পাপাগোপালার দিকে ফিরলো ও। 'বলো, কোত্থেকে পেয়েছো?'

'মেজর, আমরা কিন্তু দেরি করে ফেলছি।' মনে করিয়ে দিল পাপাগোপালা। 'বললাম তো, এটা আমার ছুরি।'

'তোমারই। ওটা তোমার কাছ থেকে আমরা কেউ কেড়েও নিতে যাচ্ছি না। কিন্তু বলতে হবে, তুমি ওটা পেলে কোথায়।'

ছয়

পাপাগোপালার চেহারায় জেদের ছাপ ফুটে উঠলো। জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকলো সে। মনে মনে অস্থির হয়ে উঠলো রাহাত। নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে পাহাড় বেয়ে বেশ কিছুটা ওদের দিকে উঠে এসেছে জার্মান পেট্রল। এই নালায় দেরি করা এখন আর কোনোমতেই উচিত নয়। কিন্তু গ্রীক লোকটাকে অনুসরণ করে পাইপে ঢোকার আগে এই অদ্ভুত ছুরির একটা ব্যাখ্যা পাবার জোর তাগাদা অনুভব করছে সে।

মূল্যবান সেকেণ্ডগুলো পেরিয়ে যাচ্ছে, সে-ব্যাপারে ওরা চারজনই সচেতন। কিন্তু পাপাগোপালার ঠোঁট পরস্পরের সাথে শক্তভাবে সেঁটে আছে, মুখ খুলতে রাজি নয় সে। বাকি তিন-জনের চোখে সন্দেহ আর অবিশ্বাস। এইভাবে ঝাড়া একমিনিট কেটে গেল, তারপর নিস্তব্ধতা ভাঙলো ম্যালোরি। 'মেজর তোমাকে একটা প্রশ্ন করেছেন, পাপাগোপালা।'

রাহাতের দিকে আরও কয়েক সেকেণ্ড মারমুখো চেহারা নিয়ে তাকিয়ে থাকলো পাপাগোপালা, তারপর কাঁধ ঝাঁকালো সে,

কাঁধে ঝোলানো রাইফেলটা অ্যাডজাস্ট করলো, বললো, 'গুলি করে একজন জার্মানকে ফেলেছি, তার কাছ থেকে নিয়েছি এটা।'

'কম করেও একমাইল দূর থেকে জেটিতে গুলি করেছিলে তুমি,' বললো রাহাত। 'দাঁড়াও, দাঁড়াও, কোন্ জার্মানের কথা বলছো তুমি? বোট থেকে নামছিল যারা···?'

'না। ওই ওদিকে একজন জার্মানকে গুলি করেছি আমি।' হাত তুলে পাহাড়ের দিকটা দেখালো পাপাগোপালা, যেটা থেকে জার্মান পেট্রল নেমে আসছে। 'এখন দেখছেন ছয়জন, কিন্তু আমি যখন প্রথম দেখি ওদের, সাতজন ছিল। আমি যাকে গুলি করি সে ডান দিকে ছিল, গুলি খেয়ে পাথরের মাথা থেকে ঝোপের ভেতর পড়ে যায় লাশটা। কেউ দেখতে পায়নি। ওরা চলে যাবার পর ঝোপের ভেতর ঢুকে ছুরিটা নিই আমি।'

'গুড গড! তারমানে কাছেপিঠে কেউ আছে তা ওরা জানে।' বিচলিত দেখালো রাহাতকে। জার্মানরা কেন যে অতি-মাত্রায় সতর্ক হয়ে আছে, কারণটা বোঝা গেল এতক্ষণে।

'হ্যাঁ,' বললো পাপাগোপালা। 'পাইপের ভেতর দিয়ে আমরা ওদিকে বেরিয়ে গেলে ওরা জানতে পারবে না···'

'বুঝেছি! তুমি চাইছো পিছনে গিয়ে আবার গুলি করবে ওদেরকে, তাই না?'

'অবশ্যই,' উৎসাহের সাথে বললো পাপাগোপালা। 'জার্মান মারাই এখন আমার একমাত্র কাজ। এর কারণও আছে। আর্মিতে ভর্তি হতে গেলাম, কিন্তু আমি খোঁড়া বলে ওরা আমাকে ফিরিয়ে দিল। কাজেই, যুদ্ধ করতে জানি সেটা আমাকে প্রমাণ করতে হবে। যত বেশি জার্মান মারবো ততো নিখুঁত হবে আমার সার্টি-

ফিকেট। তারপর এথেন্সে গিয়ে জার্মান মারার গল্প শোনাবো ওদেরকে—তখন আর্মিতে আমাকে না নিয়ে পারবে ওরা?'

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে!' নিচু কিন্তু গভীর আবেদনের সুরে বললো রাহাত, 'পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করো। দু'চারটে জার্মান মেরে কোনো লাভ নেই। ওদের আগে আশ্রমে পৌঁছুতে হবে আমাদের। সময় থাকতে মেইনল্যাণ্ডে খবর পাঠিয়ে ব্রিটিশ ট্রুপকে সতর্ক করে দিতে হবে। অথবা, এমন কিছু করতে হবে যাতে আশ্রম দখল করা কঠিন হয়ে ওঠে ওদের জন্যে। যেভাবে হোক বাধা ওদেরকে দিতেই হবে, এবং আমরা ছাড়া বাধা দেবার আর কেউ নেই। একবার যদি ওরা আশ্রমে গিয়ে উঠতে পারে, আমাদের অর্ধেক ডিভিশন সৈন্যও ওখান থেকে ওদেরকে আর নামাতে পারবে না—গোটা একটা ডিভিশনও পারবে কিনা সন্দেহ। আমাদের প্রধান এবং একমাত্র কাজ এখন আশ্রমে পৌঁছানো—পথে যদি কোনো জার্মান পড়ে তাদেরকে এড়িয়ে ওপর দিকে উঠে যাওয়া। পথে জার্মানদেরকে গুলি করার মানে মৌমাছির চাকে ঢিল ছোঁড়া, এই সহজ ব্যাপারটা তোমার মাথায় ঢুকছে না?'

'জার্মান মারবো না? এ আপনি কি বলছেন?' চোখে অবিশ্বাস এবং চেহারায় রাগ নিয়ে রাহাতের দিকে তাকিয়ে থাকলো পাপাগোপালা। 'আপনার কথা আমি মানি না!' বলে ম্যালোরির দিকে ফিরলো সে। 'তুমি একজন ব্রিটিশ অফিসার, তুমিই বলো, জার্মান মারাটাই কি আমাদের আসল কাজ নয়? এই ভদ্রলোক নিজেকে জার্মান নন বলে দাবী করছেন, তুমি তাঁর কথা মানবে?'

'তোমাকে তো বলেছি, আমরা একই সেনাবাহিনীর সদস্য,' শান্ত সুরে বললো ম্যালোরি। 'তাছাড়া, উনি আমার সুপিরিয়র অফিসার। আমাদের ছোট্ট এই ট্রুপের নেতৃত্ব তাঁর হাতেই রয়েছে।'

কটমট করে রাহাতের দিকে তাকালো পাপাগোপালা। 'আপনিই যত নষ্টের গোড়া।' বলে ঝট্ করে মুখ ফিরিয়ে নিল সে, হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়লো পাইপের ভেতর। পিছন থেকে লক্ষ্য করলো ওরা, তার বাঁকা পিঠের ওপর আর মাত্র এক ফিটেরও কম জায়গা রয়েছে। হামাগুড়ি দিয়ে তাকে অনুসরণ করলো মেজর রাহাত। সবার পিছনে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ম্যালোরি, কাজেই এরপর গ্রীককে পাইপের ভেতর পাঠালো সে। নিজে পাইপে ঢোকার আগে আশপাশটা ভাল করে দেখে নিল। না, কোনো চিহ্ন রেখে যাচ্ছে না ওরা। মেশিন-পিস্তলটা স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা আছে, পিঠের ওপর পাঁজরে সেঁটে থাকলো সেটা, প্রয়োজনে ঝট্ করে হাতে তুলে নিতে পারবে। তবে মনে মনে আশা করলো কিসে নিজের ভাল হবে সেটা বোঝার মতো বুদ্ধি গ্রীক লোকটার আছে, মেজরের সাথে লাগতে যাবে না সে।

পাইপে ঢোকার পর এক একজনের অবস্থা এক এক রকম হলো। পাপাগোপালা লম্বায় খুব বেশি না হলেও, চওড়ায় সাধারণ একজন লোকের প্রায় দ্বিগুণ, খানিক দূর এগোতেই দেখা গেল, পাইপের কর্কশ গায়ে তার পিঠ ঘষা খাচ্ছে। ফলে ইচ্ছে করলেও হামাগুড়ি দিয়ে এগোবার গতি বাড়াতে পারছে না সে। সবচেয়ে সুবিধে হলো রাহাতের, পাইপের ওপরের গা থেকে ইঞ্চি দু'য়েক নিচেই থাকলো তার পিঠ। ম্যালোরি আর

গ্রীণের আকার-আকৃতি প্রায় সমান, পাইপের ওপরের গা যেখানে নিচের দিকে ডেবে আছে বা নিচের মেঝে যেখানে উঁচু হয়ে ফুলে আছে সে-সব জায়গা পেরোবার সময় পিঠে খোঁচা খেতে হলো দু'জনকেই।

তবে কনুই বার বার পিছলে যেতে লাগলো সবারই। পাইপটা টিউব আকৃতির, ওদের কনুই পড়ছে ঢালের গায়ে, কনুইয়ের ওপর শরীরের চাপ পড়লে সেটা তো পিছলে যাবেই। এক মিনিটও পেরোয়নি, সবার কোটের আস্তিন কনুইয়ের কাছে ছিঁড়ে গেল, চামড়া ছড়ে গিয়ে জ্বালা করতে শুরু করলো।

এগোবার গতি খুব মন্থর। নিচের দিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে পাইপ, সেটা এগোবার জন্যে মস্ত একটা সুবিধে বটে, কিন্তু চওড়ায় পাইপটা খুব কম বলে সুবিধেটা তেমন কোনো কাজে লাগানো যাচ্ছে না। পিঠের সাথে ধাক্কা লাগছে পাইপের, কনুই পিছলে যাচ্ছে, পাইপের সাথে ঘষা খাচ্ছে পাঁজর—এই অবস্থায় গতি মন্থর হবে না তো কি! তার ওপর, এরই মধ্যে গভীর অন্ধকার হয়ে গেছে ভেতরটা। ছয় ইঞ্চি দূরের জিনিসও ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না ওরা।

দু'মিনিট যেতেই শ্বাস নিতে কষ্ট হতে লাগলো ওদের। মাটির নিচে পোঁতা পাইপের এত ভেতর দিকের বাতাস অনেকদিন হলো বিশেষ নড়াচড়া করেনি, তাই ভারি আর ভ্যাপসা গন্ধে ভরাট হয়ে আছে। এদিকে নিশ্চয়ই অক্সিজেনের মাত্রা খুব কম। মনে মনে আশা করেছিল রাহাত, খানিক পর অন্ধকার সয়ে আসবে চোখে, কিন্তু এখনও কিছু দেখতে পাচ্ছে না ও। আর শব্দ বলতে পাইপের গায়ে হাত-পা ঘষা লাগার খস খস,

ঝুরঝুর করে বালি আর আলগা হয়ে থাকা প্লাস্টার খসে পড়ার শব্দ।

ম্যালোরির মনে হলো, আসলে সে পাইপের ভেতর নেই, দুঃস্বপ্ন দেখছে। ভয় লাগলো, যদি পাইপের শেষ মাথাটা বন্ধ থাকে? এই ধরনের আর একটি পাইপের সন্ধান জানে সে, সেটার শেষ মাথা লোহার গ্রিল দিয়ে বন্ধ করা ছিল, কৌতূহলী ছোট ছেলেরা যাতে ওর ভেতর দিয়ে নদীতে গিয়ে না পড়তে পারে। পাপাগোপালা বলছে সে এর ভেতর দিয়ে গেছে, কিন্তু সে তো আর আজকের কথা নয়। হয়তো কিছুদিন আগে পাইপ থেকে বেরিয়ে যাবার মুখে গ্রিল লাগানো হয়েছে। আন্দাজ সিকি মাইলটাক লম্বা হবে এটা। যদি দেখা যায় বেরিয়ে যাবার মুখ বন্ধ, কি অবস্থা হবে ওদের? জায়গা এত কম যে শরীরটা উল্টোদিক ঘুরিয়ে নেয়া অসম্ভব। তারমানে পিছন দিকে হামাগুড়ি দিতে হবে ওদেরকে। মাই গড! মনে মনে আঁতকে উঠলো ম্যালোরি। শুধু পিছু হটা নয়, হামাগুড়ি দিয়ে পিছু হটা, তাও আবার ঢালু পাইপ বেয়ে ওপর দিকে উঠে যাওয়া। ক'বছর লাগবে কে জানে।

যতোই এগোচ্ছে ওরা, ততোই ঢালু হয়ে নেমে গেছে পাইপ। রাহাতের মনে পড়লো, ঝর্ণার দিকে যত এগিয়েছে পাহাড়ী ঢাল, ততোই সেটা ঢালু হয়ে পড়েছে। ম্যালোরির মতো ওর-ও ভয় করতে লাগলো—ওরা বোধহয় ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অচেনা পাইপ, ঢোকা উচিত হয়নি। এর ভেতর ওদের সবার জ্যান্ত কবর হয়ে গেলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কেউ কিছু জানতেও পারবে না। একটু থেমে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে

কপালের ঘাম মুছে নিল ও। শরীরের ভার বইতে বইতে ব্যথা ধরে গেছে হাত দু'টোয়। ক্ষত-বিক্ষত কংক্রিটের ওপর ঘষা খেয়ে তালুর মোটা চামড়া ছড়ে গেছে। টন টন করতে শুরু করেছে পিঠ আর উরুর পেশী। আর কত দূর? সামনে নিশ্চয়ই কোথাও একটা বাঁক আছে, আলো দেখতে না পাবার সেটাই একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে। যদি নিরেট নিচ্ছিদ্র কিছু দিয়ে বেরিয়ে যাবার মুখটা বন্ধ করে রাখা না হয়। তাই আছে নাকি? সেজন্যেই কি শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে? আচ্ছা, মুখটা যদি সত্যি বন্ধ থাকে, কি অবস্থা হবে ওদের? ব্যাপারটা যখন জানা যাবে তখন ওদের শারীরিক অবস্থা এতোই কাহিল থাকবে যে ফিরতি পথে পিছু হটা অসম্ভব। বহু বছর পর, মেরামতের জন্যে আবার যখন কেউ ঢুকবে এর ভেতর, গোটা কয়েক কংকাল পড়ে থাকতে দেখে ভারি আশ্চর্য হবে সে।

গরম লাগছে ম্যালোরির। ভাবলো, নাকি শরীরে কোনো-রকম গোলযোগ দেখা দিচ্ছে, তারই লক্ষণ এটা?

জোরে জোরে হাঁপাতে শুরু করেছে ওরা। কিন্তু মন্থর হলেও, এগিয়ে চলেছে চারজনই, কেউ থেমে পড়েনি। হঠাৎ বাড়ানো হাতে শক্ত আর উঁচু কি যেন ঠেকতেই ছ্যাঁৎ করে উঠলো রাহাতের বুক। পাপাগোপালার বুট। কিন্তু নড়ছে না কেন? কোনো বিপদ? দম ফুরিয়ে গেছে তার? জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে?

'গোপালা?' ডাকলো রাহাত। গলা থেকে ফিসফিসে আওয়াজ বেরোলো শুনে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল ও। 'কি ব্যাপার, পাপাগোপালা?'

রুদ্ধশ্বাসে, কর্কশ স্বরে কথা বললো পাপাগোপালা, 'বাঁকে

পৌঁছেছি আমরা। নিচে আলো দেখতে পাচ্ছি। ওখানে পৌঁছে সবাই পাইপের ভেতর অপেক্ষা করবেন। আমি না বলা পর্যন্ত কেউ বাইরে মাথা বের করবেন না।'

'ঠিক আছে। খুব ভালভাবে নিয়ে এসেছো তুমি।'

আবার এগোলো পাপাগোপালা। এদিকে আগের চেয়েও ঢালু হয়ে নেমে গেছে পাইপ, তাই হামাগুড়ি দেবার চেয়ে ক্রল করে, পাইপের মেঝেতে পেট ঠেকিয়ে এগিয়ে যাওয়া সহজ লাগলো। রাহাত তাকে অনুসরণ করতে যাবে এই সময় ওর গায়ে হাত পড়লো গ্রীণের। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে মুখ ঘোরালো ও, বললো, 'প্রায় পৌঁছে গেছি, গ্রীণ। টানেলের শেষ মাথা দেখতে পাবো এবার। ম্যালোরিকে জানাও।'

বাঁক ঘুরে স্বস্তি বোধ করলো রাহাত। সামনে অনেকদূর নিচে পর্যন্ত গাঢ় অন্ধকার, কিন্তু শেষ মাথায় আলো দেখা গেল। আলো? তারচেয়ে বলা ভাল একটা ফুটো, ফুটো পয়সার মত। পাহাড়ী ঢালের বোধহয় অর্ধেকটা পেরিয়ে এসেছে ওরা। বাঁকের মোড়ে শরীরটাকে ঘুরিয়ে সোজা করে নিতে গেল ও, হাতের তালু পড়লো পিচ্ছিল শ্যাওলার ওপর। কিছু বুঝে ওঠার আগেই পিছলে গেল হাতটা। দড়াম করে পাইপের গায়ে ধাক্কা খেলো শরীর। সাথে সাথে পাঁজরে আর মাথায় যেন আগুন ধরে গেল। গড়িয়ে নেমে যাচ্ছিল ও, কোনোরকমে মেঝেতে পা বাঁধিয়ে পতনটা ঠেকালো। পাইপের সাথে ঠুকে গেছে মাথা, রক্ত বেরোচ্ছে কিনা দেখার জন্যে একটা হাত তুললো ও। ঝুরঝুর করে বালি ঝরে পড়ছিল এতক্ষণ, এবার প্লাস্টারের বড় একটা চাঙ আলগা হয়ে নেমে এল ওর পিঠে। পিঠ ঝাড়া দিয়ে

সেটাকে ফেলে দেবার চেষ্টা করলো ও।

কোথাও কাটেনি, কিন্তু ফুলে গেছে মাথা। বার কয়েক ঝাড়া দিয়েও বোঝাটা পিঠ থেকে নামাতে পারলো না রাহাত, অগত্যা হাল ছেড়ে দিয়ে সেটাকে নিয়েই পাপাগোপালাকে অনুসরণ করলো।

গ্রীকের পিছনে চলে এল রাহাত। টানেলের ভেতরের ভৌতিক নিস্তব্ধতা আচমকা মড়মড় আওয়াজে খান খান হয়ে গেল। পাপাগোপালার মাথার ফুটখানেক সামনে পাইপের ছাদ চুরমার হয়ে গেল, ডেবে গিয়ে নেমে এল নিচের দিকে। ছোট একটা গর্ত তৈরি হলো সেখানে, সেটা গলে টানেলের ভেতর নেমে এল একটা অ্যালপেনকরপ্‌স্ বুট।

একটা হাত আগেই বাড়িয়ে দিয়েছিল রাহাত, সেটা পাপাগোপালার বুটের ওপর পড়লো। অনুভব করলো, মরার মতো স্থির হয়ে গেছে পাপাগোপালা। টানেলের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো জার্মান সৈনিক, মান্ধাতা আমলের পাইপের ছাদ ধ্বসে গিয়ে এই অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে। পাপাগোপালার মুখের কাছ থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে ঝুলছে অ্যালপেনকরপ্‌স্ বুট। এখন আর টানেলের ভেতরটা অন্ধকার নয়। বুট জুতোর সোলে বড় বড় পেরেকগুলো পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা গেল। রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছে রাহাত, একটু একটু করে ওপর দিকে উঠে যেতে শুরু করলো জার্মান পা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গর্তের সরু মুখে আটকে গেল বুট। ওপর থেকে সৈনিকটা গায়ের জোরে টেনে তুলে নিতে চেষ্টা করছে সেটা। খানিকক্ষণ কসরৎ করার পর তার চেষ্টা সফল হলো, গর্তের মুখ দিয়ে গলে ওপরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল বুট।

সম্মোহিতের মতো গর্তটার দিকে তাকিয়ে থাকলো রাহাত। কংক্রিটের অমসৃণ, চোখা কিনারা হিংস্র পশুর ধারালো দাঁতের মতো লাগছে। নিঃসাড় শুয়ে থেকে মনে মনে প্রার্থনা করছে ও, পিছনের ওরা দু'জন যেন কোনো শব্দ না করে। গ্রীণ এবং ম্যালোরি কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে সিরিয়াস কিছু একটা ঘটেছে সামনে। কিন্তু এখন কথা বলা বা কোনো শব্দ করা মানে যে মরণ ডেকে নিয়ে আসা, সেটা কি উপলব্ধি করতে পেরেছে ওরা ?

টানেলের মেঝেতে এখনও স্থির হয়ে পড়ে আছে পাপাগোপালা। রাইফেলটা স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা রয়েছে পিঠে, ভয়ংকর ঝুঁকি না নিয়ে সেটায় হাত দেবার উপায় নেই। কষ্টকর মন্থরতার সাথে এক চুল এক চুল করে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে ইঞ্চিখানেক এগোলো রাহাত, মনে প্রশ্ন, গর্তটা কি এত বড় যে ওপর থেকে উঁকি দিয়ে পাইপের ভেতর পড়ে থাকা পাপাগোপালাকে দেখতে পাবে জার্মান সৈনিক ? মনে হয় না। গর্তের ঠিক নিচেই নয়, একটু পিছনে রয়েছে পাপাগোপালা। উঁকি-ঝুঁকি দিলেও তাকে দেখতে পাবার কথা নয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, জার্মান সৈনিকের বোধ-বুদ্ধি এবং কৌতূহল কতটুকু ? পাইপের ভেতরটা কি ভাল করে দেখার ইচ্ছে জাগবে তার ? পা দিয়ে ঠুকে গর্তটা কি আরও বড় করে নেবে সে ? পাইপটা যখন তৈরি করা হয়, নিশ্চয়ই তার ওপর মাটি ফেলা হয়েছিল। কিন্তু কয়েক যুগের বৃষ্টি ছাদের ওপর থেকে মাটির স্তর ধুয়ে প্রায় সাফ করে দিয়েছে।

লোকটা কি চলে গেছে, নাকি পাইপের ছাদে দাঁড়িয়ে আছে

এখনও ? এরা অ্যালপাইন ট্রুপের লোক, মাথা খাটানোর অভ্যেস এবং ট্রেনিং দু'টোই আছে। লোকটা কি গর্তের ভেতর কিছু আছে কিনা দেখার চেষ্টা করবে ?

ছাদ ভেঙে পড়ার আওয়াজটাই শুধু পেয়েছে গ্রীণ আর ম্যালোরি, কি ঘটছে সে-সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই নেই। পাপাগোপালা এবং রাহাত কোনো শব্দ করছে না লক্ষ্য করে ওরাও কোনো শব্দ করছে না। রাহাতের হাতে ঠেকে রয়েছে পাপাগোপালার বুট, সেটা একটু নড়ে উঠলো। সংকেতটা বুঝলো রাহাত, পাপাগোপালা গর্তের কাছ থেকে আরও কিছুটা পিছিয়ে আসতে চাইছে। কারণটা বুঝতে পারলো না। পাপাগোপালা কি কোনো নতুন বিপদের গন্ধ পেয়েছে ? পিছিয়ে এসে উরু পর্যন্ত রাহাতের নিচে চলে এল পাপাগোপালা। পরমুহূর্তে শক্ত কিছুর বাড়ি পড়লো গর্তের কিনারায়। একবার নয়, কয়েকবার। ওপর থেকে গর্তটাকে বড় করছে জার্মান সৈনিক। বালি আর কংক্রি-টের টুকরো খসে পড়তে শুরু করলো। তারপর স্যাঁৎ করে টানেলের ভেতর অর্ধেকটা নেমে এল একটা রাইফেলের ইস্পাত মোড়া বাট।

রাহাত অনুভব করলো পাপাগোপালার শরীর শক্ত হয়ে উঠে পরমুহূর্তে আবার ঢিল হয়ে গেল। কারণটা বুঝে নিল রাহাত। রাইফেলের বাটটা ধরে হ্যাঁচকা টান দেবার ইচ্ছে হয়েছিল পাপা-গোপালার, কিন্তু সেটা উচিত হবে না বুঝতে পেরে শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়েছে সে। জার্মান সৈনিক একা হলে কথা ছিল, পাহাড়ের ঢালে তার সাথে আরও পাঁচজন রয়ে গেছে, কাজেই ঝুঁকিটা নেয়া বোকামি হয়ে যাবে। এক সেকেণ্ড পরই

গর্ত থেকে উঠে গেল রাইফেলের বাট। তারপর আবার গর্তের কিনারায় বাড়ি পড়তে শুরু করলো। গর্তের মুখটাকে আরও বড় করতে চাইছে জার্মান সৈনিক। পাইপের ভেতরটা ভালভাবে না দেখে ছাড়বে না সে।

আওয়াজটা থামার আশায় অপেক্ষা করে আছে রাহাত। একটু একটু করে আকারে বড় হচ্ছে গর্তটা। এক সময় যথেষ্ট বড় হবে ওটা, ওপর থেকে পাইপের ভেতর ওদেরকে দেখতে পেতে কোনো অসুবিধেই হবে না লোকটার। কিন্তু তার আগেই থেমে গেল আওয়াজ। প্লাস্টার খসে পড়াও বন্ধ হয়ে গেল সেই সাথে। এটা স্রেফ একটা খালি টানেল, বুঝতে পেরে জার্মান লোকটার কৌতূহল বোধহয় মিটেছে। ওখানে আর দাঁড়িয়ে থাকার কোনো মানে হয় না, নিশ্চয়ই এতক্ষণে আবার সে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করেছে পাহাড়ে। নিজেকে মিথ্যে সান্ত্বনা দিচ্ছে না তো, ভাবলো রাহাত। হঠাৎ থেমে গেছে লোকটা, এর অন্য কারণও থাকতে পারে। পাপাগোপালাকে দেখে ফেলেনি তো? বোধহয় দেখেনি, কারণ ঠিক আগের মুহূর্তেই পিছিয়ে এসেছিল সে।

গর্তের মুখ থেকে পাইপের নিচে লম্বা কি যেন একটা পড়তে দেখলো রাহাত। দেখেও চিনলো না ও। অনুভব করলো, থরথর করে কেঁপে উঠলো পাপাগোপালা। মাথা তুলে তাকালো রাহাত। ছ্যাঁৎ করে উঠলো বুক। জার্মান সৈনিক নিজের ভুল বুঝতে পেরে এতক্ষণ গর্তের মুখ বড় করা থেকে বিরত ছিল। টানেলের ভেতর অনুসন্ধান চালাবার জন্যে আরও অনেক সহজ উপায় আবিষ্কার করেছে সে। লম্বা মতো ওটা কংক্রিটের টুকরো নয়। একটা হ্যাণ্ড-গ্রেনেড।

ওটা দেখেই বুঝলো রাহাত, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে মারা যাচ্ছে ওরা। পাইপের মেঝেতে গোবেচারার মতো পড়ে রয়েছে গ্রেনেড। এখুনি বা ছু'সেকেণ্ড পর বিস্ফোরিত হবে। ওটাকে চিনতে পারার পর এক সেকেণ্ড পেরিয়ে গেছে, এর মধ্যে বিত্যুৎ-গতিতে অনেকগুলো চিন্তা খেলে গেল ওর মাথায়। ছোট একটু জায়গার ভেতর বিস্ফোরণের আওয়াজ এবং ধাক্কা হবে ভয়ংকর, ক্ষুদে একটা গর্ত ছাড়া শক-ওয়েভের বেরিয়ে যাবার কোনো রাস্তা নেই। সামনের ছু'জনকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, মাংস আর হাড় সব গুঁড়ো হয়ে দলা পাকিয়ে যাবে। গ্রীণের অবস্থা হবে কসাই-য়ের হাতে পড়া জবাই করা গরুর মতো, আট দশ টুকরো হয়ে যাবে তার শরীর। ম্যালোরি হয়তো বিস্ফোরণের সাথে সাথেই মারা যাবে না, কিন্তু প্রচণ্ড আওয়াজে কানের পর্দা ছিঁড়ে রক্ত বেরিয়ে আসবে। মাথার খুলিও ফেটে যেতে পারে। রাহাতের শরীরের নিচে মোচড় খেতে শুরু করলো পাপাগোপালা। বুঝতে অসুবিধে হলো না কি করতে চায় সে। কিন্তু মেঝেতে পেট ঠেকিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে প্রায় অসহায় ভঙ্গিতে পড়ে আছে সে, সময় থাকতে গ্রেনেডের দিকে হাত বাড়ানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। পাপাগোপালার শরীরের ওপর দিয়ে ঘষা খেয়ে এগোবার চেষ্টা করলো রাহাত। হাতটা আগেই বাড়িয়ে দিয়েছে ও। পাপাগো-পালার মাথা ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল হাতটা। কিন্তু গ্রেনেডের থ্রোয়িং-হ্যাণ্ডেল এখনও নাগালের বাইরে।

আরও উঁচু করতে হবে শরীরটাকে। এক হাতের ওপর ভর দিয়ে পাপাগোপালার শরীর থেকে নিজেকে ওপরে তুললো রাহাত, তারপর সামনে বাড়লো। হাতের মধ্যে চলে এল

শীতল। জানে, সাক্ষাৎ মৃত্যুকে মুঠোর মধ্যে ধরে আছে ও। তাকালো ওপর দিকে। চোখের পলকে আন্দাজ করে নিল গর্ত-টার বেড়। তারপর ওপর দিকে হাত ঝাঁকি দিয়ে মুঠো থেকে ছেড়ে দিল গ্রেনেড। ভয় ছিল, গর্তের কিনারায় লেগে আবার সেটা পাইপের ভেতর ফিরে আসবে। কিন্তু না। গর্তের মাঝখান দিয়ে ওপর দিকে উঠে গেল সেটা। সাথে সাথে পাপাগোপালার ওপর নেতিয়ে পড়লো রাহাত। এক সেকেণ্ড কিছুই ঘটলো না।

বিস্ফোরণের আওয়াজটা ভোঁতা শোনালো ওদের কানে। রাহাতের শরীরের নিচে অস্থিরভাবে নড়েচড়ে উঠলো পাপাগো-পালা। অনেকটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল ওকে, তারপর বসার ভঙ্গিতে খাড়া হলো। গর্তের ভেতর মাথা গলিয়ে কাঁধ দিয়ে প্রচণ্ড এক ঝটকা দিল গর্তের কিনারায়। ছাদ ভেঙে হুড়মুড় করে কাঁধসহ শরীরের অর্ধেক বেরিয়ে গেল পাইপের বাইরে।

রাহাতও মাথা উঁচু করে প্রায় বসার ভঙ্গিতে খাড়া করলো নিজেকে। ল্যুগারটা ওর হাতে চলে এসেছে। দেখলো, পাই-পের বাইরে হাত দিয়ে উন্মত্তভাবে কি যেন টানা-হ্যাঁচড়া করছে পাপাগোপালা। এক মিনিট পর পাইপের ভেতর মাথা টেনে নিল সে। গর্তের ভেতর দিয়ে বাইরে হাত গলিয়ে কিনারা থেকে টেনে নিয়ে এসে ঘাসের একটা চাপড় ফাঁকটার মাঝখানে সেট করলো। তার হাতের তালু দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে।

'জার্মান লোকটা মারা গেছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো পাপাগোপালা, 'বোমাটা বোধহয় তার পায়ের কাছে পড়েছিল। আর কাউকে দেখলাম না, তবে এখুনি পৌঁছে যাবে ওরা। ঘাস দিয়ে ঢেকে দিয়েছি গর্তটা, ওরা ভাববে গ্রেনেডটা এমনিই ফেটে

গেছে—একটা অ্যাক্সিডেন্ট। কিন্তু গর্তটা যদি দেখে ফেলে···

'ঠিকমত ঢাকা পড়েছে তো ?'

'বোধহয়। তবে ভাগ্য খারাপ হলে চোখে পড়ে যেতে পারে। হয়তো পা দিয়ে ঘাস সরাবার চেষ্টা করবে।'

'দেখা যাবে কি হয়। টানেলের মুখে যেতে পারবে তুমি ? ঠিক আছে। কিন্তু সাবধান, বেরোবার সময় কোনো শব্দ হয় কিনা শুনে নিও আগে।'

খানিক ইতস্তত করে পাপাগোপালা বললো, 'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি যদি গ্রেনেডটা···'

বাধা দিয়ে রাহাত বললো, 'তাড়াতাড়ি করো। এখুনি পৌঁছে যাবে ওরা।'

ঘটনাটা ঘটে যাবার পর ওদের শরীরের সমস্ত ক্লান্তি যেন দুর হয়ে গেছে। আগের চেয়ে অনেক দ্রুত হলো ওদের এগোবার গতি। টানেলের বাকি অংশ পেরিয়ে এল ওরা।

টানেলের বাইরে মাথা বের করে বাইরেটা ভাল করে দেখে নিল পাপাগোপালা। এক সেকেণ্ড পরই সিগন্যাল দিল সে। এরপর প্রথমে রাহাত, তারপর গ্রীণ এবং সবশেষে টানেল থেকে বেরিয়ে এল ম্যালোরি। জার্মান সৈনিকদের মতোই এক-জন একজন করে ঝর্ণার ওপর পড়ে থাকা পাথরের ওপর দিয়ে পানিটুকু পেরোলো ওরা।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে রোডের ওপর উঠে এল ওরা। এই রোড জার্ভোসের দিকে চলে গেছে। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে সবার আগে থাকলো পাপাগোপালা। রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে নেবার সময় একগাল

হাসলো সে। 'এখন থেকে আর কোনো ভয় নেই। আমরা জার্মানদের আগে চলে এসেছি।'

'তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারলে ভাল হতো,' গম্ভীর সুরে বললো রাহাত। 'কিন্তু মন সায় দিচ্ছে না।'

'সেকি? আপনি কি··?'

'হ্যাঁ,' বললো রাহাত। 'কেন যেন মনে হচ্ছে আমার, জার্ভোসে পৌঁছুবার আগেই রাস্তায় একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে।'

সাত

ফোকাস অ্যাডজাস্ট করতেই জার্মান সৈনিকদের প্রথম দলটাকে দেখা গেল। খচ্চরের পিঠে চড়ে আসছে ওরা, কাজেই পায়ে হাঁটা যে-কোনো দলের নাগাল পাওয়া এখন শুধু সময়ের ব্যাপার। দাঁড়ের মতো দেখতে একটা ঝুল-পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ওরা তিনজন, রোড থেকে প্রায় একশো ফিট ওপরে। মনোকিউলার গ্লাসটা বন্ধ করে নিচে, রোডের দিকে তাকালো রাহাত। রোডের ধারে একা অপেক্ষা করছে পাপাগোপালো। জার্ভোসের দিক থেকে কয়েকটা গরুর গাড়ি আসছে, গাড়োয়ানদের সাথে কথা বলার জন্যে ওখানে রয়ে গেছে সে। কথা বলার সময় পাপাগোপালার সাথে বিদেশী আর কেউ থাকলে গ্রাম্য লোকগুলো অহেতুক ভয় পেতে পারে, তাছাড়া ওদের উপস্থিতির কথা তাদেরকে জানাবার ঝুঁকি না নেয়াই ভাল, কাজেই রোড থেকে ঢাল

বেয়ে এই ঝুল-পাথরের ওপর উঠে এসেছে ওরা তিনজন—রাহাত, ম্যালোরি আর গ্রীণ। এখানে উঠে আসতে পেরে ফেলে আসা রোডটা অনেক দূর পর্যন্ত দেখার একটা সুযোগ পেয়ে গেছে রাহাত। কিন্তু যা দেখলো, মনটা তাতে আগের চেয়ে দমে গেল।

'কথা বলতে কতক্ষণ লাগবে ওর কে জানে!' কোনো কারণ নেই, তবু পাপাগোপালার ওপর বিরক্তি বোধ করছে ম্যালোরি। আসলে প্রচণ্ড ক্লান্তি বোধ করছে সে, এত ঘুম পেয়েছে যে চোখ খোলা রাখাই দায়। জেগে আছে শুধু ইচ্ছা-শক্তির জোরে। পাপাগোপালা ওদের দলে ভেড়ার আগে সবাই তবু যা হোক কিছুক্ষণ ঘুমাবার সুযোগ পেয়েছে, কিন্তু তার কপালে তাও জোটেনি।

'একটু সময় তো লাগবেই,' শান্ত সুরে বললো রাহাত। 'ওরা কোনো খবর জানলে আমাদের গোপালা সেগুলো আদায় করার চেষ্টা করবে···তারপর, খাবার। ওদের কাছ থেকে জানতে হবে, কোথায় পাওয়া যেতে পারে।'

'আমার মুখে কিছু রুচবে না। ওরা পিছু পিছু আসছে দেখে ক্ষিদেটা মরে গেছে।'

'এখানে পৌঁছুতে খুব একটা সময় লাগবে না ওদের,' বললো গ্রীণ। 'কাদের হাতে পড়েছে দেখতে হবে তো,' জ্ঞান হারিয়ে পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত খচ্চরগুলোর রেহাই নেই। আর সহজে পড়ে যাবে ওগুলো, তাও নয়। সাংঘাতিক ধকল সইতে পারে।'

ম্যালোরির জন্যে একটু চিন্তিত হয়ে পড়লো রাহাত। সেকেণ্ড-লেফটেন্যান্ট এমনিতেই হতাশ হয়ে পড়েছে, তার ওপর যদি এই রকম কথাবার্তা চলতে থাকে, প্রতিরোধ ক্ষমতা যাও-বা একটু

এখনও আছে তাও হারিয়ে ফেলবে। কাজেই কথা বলার সময় চেহারা এবং গলার সুরে রুক্ষ, কঠিন একটা ভাব ফুটিয়ে তুললো ও। 'আমরা এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, ম্যালোরি, যেখান থেকে ইচ্ছে করলেই তুমি গোটা এলাকার জিওগ্রাফী চেক করে নিতে পারো। কাটায়রা থেকে মালভূমি প্রায় দশ মাইল। মালভূমি নিজেই ছয় মাইল। এরপর আরও আছে চার মাইল—মালভূমির শেষ প্রান্ত থেকে জার্ভোস পর্যন্ত। এই শেষের চার মাইল পেরোনো সহজ কথা নয়। মালভূমি থেকে গোটা পাহাড়ী এলাকাকে পেঁচিয়ে, এঁকে বেঁকে উঠে গেছে। কাজেই, একটা গরুর গাড়ি বা ক'টা খচ্চর যদি যোগাড় হয়, জার্ভোসে পৌঁছানো তেমন কঠিন কোনো সমস্যা নয়। আমাদের গোপালা একটু চেষ্টা করলে যোগাড় করতে পারবে বলে মনে হয়। এই পেনিনস্যুলা তার নিজের এলাকা।'

'তারমানে, আপনি বলছেন আশ্রমে পৌঁছুতে হলে আরও দশ মাইল পেরোতে হবে আমাদের?' একটা বোল্ডারে বসতে গিয়েও বসলো না ম্যালোরি, হঠাৎ মনে হয়েছে একবার যদি বসে সে, পরে আর উঠে দাঁড়াবার শক্তি পাবে না। 'তাহলে আজকের মধ্যে ওখানে আমরা কোনোভাবেই পৌঁছুতে পারবো না।'

'ব্রিজেলবার্ড কিন্তু আজকের মধ্যেই ওখানে পৌঁছুবে—সেটাই যে তার টাইম-টেবিলের আসল কথা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ওদিকে একটু তাকাও, মাউন্ট জার্ভোস দেখতে পাবে।'

রোডের এতটা ওপর রয়েছে বলে গোটা পেনিনস্যুলার প্রায় সবটাই উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে ওদের চোখের সামনে। পুব এবং পশ্চিম দিকে ঈজিয়ান, উপসাগরের পানি এখনও উজ্জ্বল নীল। ওপারে

মেইনল্যাণ্ড, সরু ফিতের মতো রোডের ওপর পাহাড় দেখা যাচ্ছে এই রোডটাই ব্যবহার করছে মিত্রপক্ষ। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা রোড, মিত্রপক্ষ যদি ওটা ব্যবহার করার সুযোগ হারায়, যুদ্ধের মোড় অনেকটা ঘুরে যাবে। জার্ভোসের আশ্রম দখল করে ওই রোডের ওপর কামানের গোলা ফেলাই জার্মান অ্যালপেনকরপ্স্ সৈনিক-দের উদ্দেশ্য। গ্লাসটা অ্যাডজাস্ট করে নিল রাহাত। গালফের পানিতে বিন্দুর চেয়েও ছোট কি যেন চিকচিক করছে—নিশ্চয়ই ওগুলো ইটালিয়ান মাইন। এখনও কুয়াশায় প্রায় ঢাকা রয়েছে মেইনল্যাণ্ড, তবে রোদ লেগে চৌকো সাদা কি সব যেন দেখা যাচ্ছে—রাহাত আন্দাজ করলো, ওগুলো বোধহয় বাড়িঘরের দেয়াল। উত্তরের আকাশে এখনও লেগে রয়েছে ধোঁয়ার রেশ, তারমানে কি টাটরা পুড়ছে এখনও? সেই উত্তরেই দেখা যাচ্ছে জার্মান সৈনিকদের প্রথম দলটাকে। খচ্চরের পিঠে চড়ে ঝুল-পাথরের দিকে এগিয়ে আসছে তারা, যদিও অনেকক্ষণ এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে তবে বিশ্বাস হয় ওগুলো সচল।

দক্ষিণ আকাশে ঘন কালো মেঘ। কিন্তু গালফের ওপর দিয়ে কেপ জার্ভোসের দিকে ভেসে যাবার সময় দ্রুত পাতলা আর হাল্কা হয়ে আসছে। মেঘের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে পাহাড়, বিশাল গম্বুজের মতো দেখালো সেটাকে। গম্বুজের ঢাল-গুলো তুষার জমে প্রায় তেকোণা আকৃতির চূড়া পর্যন্ত সাদা হয়ে আছে। গ্লাসটা ম্যালোরির হাতে গুঁজে দিয়ে সেদিকে হাত তুললো রাহাত, 'দেখো।'

মেঘের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসা পাহাড়টাকে দেখে মনটা আরও দমে গেল ম্যালোরির। ওই বিশাল পাহাড়টার

গা পেঁচিয়ে উঠে যাওয়া রাস্তা ধরে জার্মানদের আগে ওরা কি আশ্রমে পৌঁছুতে পারবে? লক্ষ্য করলো, পাহাড়ের মাথাটা আসলে একবারও মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ছে না। মেঘগুলো মালভূমির ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে, তারপর উত্তর দিক আর পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তারমানে, আবহাওয়া বিভাগের লোকেরা ঠিকই বলেছিল—আবহাওয়া যত খারাপই হোক, জার্ভোসকে সাধারণত আচ্ছন্ন করতে পারে না। একবার যদি ওখানে আসন গাড়তে পারে ব্রিজেলবার্ড, মেইনল্যাণ্ডের সাপ্লাই রোডের ওপর সারাক্ষণ নজর রাখতে পারবে সে। হঠাৎ একটা অস্থিরতা পেয়ে বসলো ম্যালোরিকে। এখন আবার নতুন করে উপলব্ধি করলো সে, জার্মানরা আশ্রম দখল করে নিলে সর্বনাশের কিছু আর বাকি থাকবে না। সেই সাথে জার্মানদের আগে ওখানে পৌঁছুনো অসম্ভব বলে মনে হওয়ায় তার অস্থিরতা আরও বেড়ে গেল।

'পুবের আবহাওয়া কিন্তু অতটা ভাল নয়,' মৃদু কণ্ঠে ওদেরকে সাবধান করে দিল রাহাত। 'বছরের এই সময় ঝড়-ঝাপটা সব ওদিক থেকেই আসে। ওদিকের যা চেহারা, মোটেও ভাল ঠেকছে না আমার।'

পুবদিকে এখনও দেখা যাচ্ছে সাগর। কিন্তু পানির রঙ নীল নয়, ধূসর। ধূসর রঙা সাগরকে ঢেকে দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন আরেক প্রস্থ ঘন কালো মেঘ ছুটে আসছে। এগিয়ে আসার সময় মেঘগুলো হাল্কা বা পাতলা হচ্ছে না, আরও ঘন আরও ভারি হয়ে উঠছে। সন্দেহ নেই, কঠিন একটা দুর্যোগের মধ্যে পড়তে যাচ্ছে ওরা। পেনিনস্যূলার এমন একটা দিকে আসছে দুর্যোগটা, মাউন্ট

জার্ভোসে পৌঁছুতে হলে ওই এলাকা ওদেরকে পেরোতে হবে।

আবার দক্ষিণ দিকে তাকালো ম্যালোরি, মেঘের আড়াল থেকে পাহাড়টা এখন সম্পূর্ণ বেরিয়ে এসেছে। নির্দিষ্ট একটা জায়গায় ফোকাস ফেলতে বললো রাহাত। পাহাড়ের কিনারার কাছে, মনে হয় সাগরের ওপর ঝুলছে, চৌকো একটা পাথর।

'যদি ঠিক জায়গায় তাকিয়ে থাকো,' তাকে বললো রাহাত, 'ওটাই আশ্রম। দেখতেই পাচ্ছো, যথেষ্ট ওপরে ওটা।'

'আকাশের চেয়ে আর নিচে হলো কোথায়!' মন্তব্য করলো গ্রীণ। তার চোখের দৃষ্টি সাধারণ লোকের চেয়ে কিছু বেশি বলে মনে হলো।

'স্নো-লাইনের বেশ ওপরে,' চিন্তিতভাবে বললো ম্যালোরি।

ঝুল-পাথর থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে, মেঘের শেষ প্রান্ত মালভূমির কিনারা উন্মুক্ত করে দিয়ে পাহাড়ের গোড়া থেকে ওপর দিকে খাড়া হয়ে উঠছে আকাশ-ছোঁয়া পাঁচিলের মতো। আবার নির্দিষ্ট এক জায়গা দেখালো রাহাত ম্যালোরিকে। রোডটা দেখতে পেল ম্যালোরি, এঁকে বেঁকে উঠে গেছে সম-মালভূমির দিকে। মালভূমির পুব দিকে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটা বিল্ডিঙের মাঝখান থেকে ক্ষীণ ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

'ওটা এলাটিয়া গ্রাম,' ম্যালোরি জিজ্ঞেস করতে বললো রাহাত। 'ওটার ধারে-কাছেও ঘেঁষবো না আমরা। মেইন রোড থেকে সরু একটা পথ বেরিয়ে গেছে ওদিকে।'

'মেইন রোডই বটে!' তিক্ত হাসি দেখা গেল গ্রীণের ঠোঁটে।

গ্লাসটা রাহাতের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে নিচে, রাস্তার দিকে

তাকালো ম্যালোরি। কয়েকজন গ্রাম্য লোক ঘিরে আছে পাপাগোপালাকে, তাদের সাথে কথা বলছে সে। রীতিমত উত্তেজিত হয়ে আছে, হাত তুলে লোকগুলোকে কাটায়রার দিকটা দেখালো। তারমানে, আন্দাজ করলো ম্যালোরি, ওদেরকে জার্মানদের কথা বলছে পাপাগোপালা। সাথে সাথে গ্রামের সহজ-সরল লোকগুলোর মধ্যে দারুণ একটা বিচলিত ভাব দেখা গেল। মোট চারটে গরুর গাড়ি, তাড়াহুড়ো করে তিনটের মধ্যে উঠে বসলো তারা। বাঁকানো শিংওয়ালা ষাঁড়গুলোর পিঠে ছড়ির ঘা পড়লো, রোড ছেড়ে সোজা ঢালের দিকে এগোলো তারা। নিচে মাঠ, সেই মাঠের ওপর দিয়ে কেটে পড়তে চায় লোকগুলো। জার্মানরা আসছে শুনে রোডের ওপর থাকতে রাজি নয়।

খালি গরুর গাড়িটা রোডের ওপর রয়ে গেল। মুখ তুলে ঝুল-পাথরের দিকে তাকালো পাপাগোপালা, মাথার ওপর দুই হাত তুলে ব্যস্ততার সাথে নিচে নেমে আসার ইঙ্গিত দিল ওদেরকে।

ঝুল-পাথর থেকে নামতে শুরু করার আগে শেষবারের মতো উত্তরদিকে তাকালো রাহাত। দূরের রোডে জার্মান সৈনিকদের রেখাটা দেখতে পেল ও। রেখার লেজটা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ওখানে পাহাড়ের আড়ালে বাঁক নিয়েছে রাস্তাটা। আবার যখন ওরা বেরিয়ে আসবে, এই ঝুল-পাথরের কাছাকাছি দেখা যাবে ওদেরকে।

'খবর খারাপ!' রোডের ওপর ওরা নেমে আসতেই বললো পাপাগোপালা। 'আমার দেশ আর যুগোস্লাভিয়ায় হামলা চালি-

য়েছে জার্মানী। আজ সকাল পাঁচটা পঁয়তাল্লিশে গ্রীক সেনা-দফতর থেকে বলা হয়েছে, রুপেলের দুর্গ প্রথম হামলাটা ঠেকিয়ে দিয়েছে।'

'আগেই জানি, ম্যাগিনট লাইন যে-কোনো হামলা প্রতিরোধ করতে পারবে,' নিঃশ্বাসের সাথে বিড়বিড় করে বললো ম্যালোরি। 'গরুর গাড়িটা ওরা রেখে গেল, তারমানে কি আমাদের কথা জানে ওরা?' গলা চড়িয়ে জানতে চাইলো সে। গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়েছে পাপাগোপালা, এখন সেটা জার্ভোসের দিকে মুখ করে আছে।

'হ্যাঁ। জার্মানদের ভয়ে খেতের ভেতর দিয়ে পালাচ্ছে ওরা, কাজেই জানলেও কোনো ক্ষতি নেই।' ম্যালোরির দিক থেকে গ্রীণের দিকে ফিরলো পাপাগোপালা। 'খাবার আর পানি পাওয়া যাবে। কিন্তু তোমাদের জন্যে কাপড়চোপড় দরকার, এগুলো পরে জার্ভোসে উঠলে ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে যাবে তোমরা।'

'আর কোনো খবর, পাপাগোপালা?' শান্ত সুরে জানতে চাইলো রাহাত। 'জার্মানরা হামলা চালিয়েছে, তোমার বন্ধুরা জানলো কিভাবে? টেলিফোন লাইন তো কেটে দেয়া হয়েছে।'

'হ্যাঁ, কাল রাতে কেটে দেয়া হয়েছে। রেডিও থেকে খবর পেয়েছে ওরা।' চেহারা দেখে মনে হলো রাহাতের ওপর আবার বিরূপ হয়ে উঠেছে গ্রীক লোকটা। 'আমি আপনাকে মিথ্যে কথা বলিনি।'

'না, বলোনি,' আগের মতোই শান্ত দেখালো রাহাতকে। 'কিন্তু, সব ব্যাপারের খুঁটিনাটি জানা দরকার আমার। কাপড় আর খাবার কোথায় পাবে তুমি?'

'রোডটা যেখান থেকে উঠতে শুরু করেছে, ঠিক তার পাশেই একটা বাড়ি আছে। তাড়াতাড়ি...'

'এক সেকেণ্ড ! ফ্যামিলিটাকে তুমি চেনো ?'

'ফ্যামিলি নয়, শুধু একজন লোক, অনেক বছর ধরে চিনি। বুড়ো বলে যুদ্ধে যেতে পারেনি। আপনার ভয় পাবার কিছু নেই, মিঃ রাহাত, ওর মা-বাবা কেউ জার্মান নয়।'

'তাহলে আর দেরি নয়। ম্যালোরি, এবার তুমি খানিকটা বিশ্রাম নিতে পারো।'

গাড়ির ওপর বিছানোই ছিল খড়, চিৎ হয়ে শুতে যা দেরি, সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়লো ম্যালোরি। গাড়োয়ানের আসনে হাতে ছড়ি নিয়ে বসলো পাপাগোপালা, বাড়ি খেয়ে হাঁটতে শুরু করলো বাঁকা শিংওয়ালা প্রকাণ্ড ষাঁড় দু'টো। এদিকের রাস্তায় ধুলো খুব বেশি, যদিও সমতল একটা জায়গার ওপর দিয়ে এগিয়ে গেছে। ছড়ির বাড়ি খেয়ে ষাঁড় দু'টো ছুটতে শুরু করলো। খানিক পর ডান দিকে পড়লো নিচু-পাহাড়, ফলে গালফটা চোখের আড়াল হয়ে গেল। তারপর শুরু হলো নিচের দিকে নামা, সেই সাথে দুরের মালভূমি একটা পাঁচিলের মতো গুটি গুটি এগিয়ে আসতে লাগলো ওদের দিকে।

রাস্তার অবস্থা তেমন সুবিধে নয়, ষাঁড়গুলো মাঝেমধ্যেই হোঁচট খেলো, ফলে একজন মানুষের পায়ে হাঁটার চেয়ে বেশি গতি তাদের কাছ থেকে আদায় করা সম্ভব হলো না। কিন্তু লাভ হলো এই যে ওরা চারজনই কায়িক পরিশ্রম থেকে বেঁচে গেল; যদিও মনে মনে সবাই সচেতন, ওদের চেয়ে অনেক দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে জার্মান সৈনিকরা। খচ্চর শুধু হালকা বলে নয়, এমনি-

তেও ওগুলো ষাঁড়ের চেয়ে জোরে ছুটতে পারে। সন্দেহ নেই, দু'টো দলের মাঝখানের ফাঁক ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে।

মালভূমির পাঁচিল কাছাকাছি চলে এসেছে, এই সময় রাহাতকে প্রশ্ন করলো গ্রীণ, 'স্যার, আপনাকে কেমন যেন চিন্তিত দেখাচ্ছে।'

'এটা যদি একটা ট্রেন হতো!' বলে পাপাগোপালার দিকে তাকালো রাহাত। ওদের সামনে দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে পাপাগোপালা, দৃষ্টি সামনের দিকে স্থির হয়ে আছে। 'ভাবছি, মেইনল্যাণ্ড ফোর্সের সাথে যোগাযোগ করার উপায়টা কি? এখানে কি ঘটছে সেটা ওদেরকে সময় থাকতে জানাতে না পারলে...' হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো ও। 'জার্ভোসের ওই আশ্রম আসলে একটা দুর্গম দুর্গ, যার দখলে থাকবে সে-ই সবার মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাবে। আমার আসল দুশ্চিন্তা ব্রিজেলবার্ড-বাহিনীর সাইজ—আমি জানি, বিরাট আকারের রিইনফোর্সমেণ্ট আশা করছে সে।'

'কিভাবে বুঝতে পারছি না। তবে যদি জলপথে আসে...না, তাই বা কিভাবে সম্ভব? ওরা কি ওখানে ল্যাণ্ড করতে পারবে?' পুবদিকের উপকূল রেখা দেখালো গ্রীণ। ওদিকটা এখনও পরিষ্কার থাকলেও, ঈজিয়ানের ওপর তুমুল আয়োজনের সাথে ঘন কালো মেঘ জমছে।

'উঁহু'। ইনল্যাণ্ডে ঢোকার কোনো পথ নেই ওদিকে। পাহাড়ের খাড়া পাঁচিল সেই উত্তরের ডেলটা পর্যন্ত চলে গেছে। আমিও মনে করি, সাগর-পথে দু'বার আসার ঝুঁকি ওরা নেবে না। বিশেষ করে এই দিনের বেলা তো নয়ই। সালোনিকার প্রতিরোধ

ভেঙে সময়মতো এখানে পৌঁছুতে পারবে, সে আসাও নেই। থাকলে ব্রিজেলবার্ডকে এভাবে পাঠাতো না।'

ব্রিজেলবার্ডের জায়গায় নিজেকে কল্পনা করার চেষ্টা করলো রাহাত। ও যদি কর্নেল ব্রিজেলবার্ড হতো, পরবর্তী পদক্ষেপ কি হতে পারতো তার ?

গাড়ির পিছন দিকে মুখ করে বসে আছে গ্রীণ, পিছনের রাস্তার ওপর সারাক্ষণ নজর রেখেছে সে। যতদূর দেখতে পাচ্ছে, কোথাও প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই।

মালভূমির পাঁচিল কাছে চলে এল, পাঁচিলের গোড়ায় গাড়ি থামালো পাপাগোপালা। তাকে অনুসরণ করে সাইপ্রেস গাছের ঘন ঝোপের আড়ালে দাঁড়ানো একটা পাথরের বাড়িতে ঢুকলো ওরা। বাড়ির মালিক সত্তর বছরের এক বুড়ো, নিজের জন্যে এই-মাত্র তৈরি করা খাবার-দাবার ওদের চারজনের মধ্যে ভাগ করে দিল সে। খাবারের মধ্যে পরিমাণে বেশি পাওয়া গেল যেটা সেটার গ্রীক নাম উচ্চারণ করা কঠিন, চেষ্টা করতে গেলে দাঁত ভেঙে যাবার ভয় আছে। সম্ভবত ভেড়ার মাংস, থেঁতলে ময়দার মণ্ডের মতো করে ফেলা হয়েছে, অচেনা গাছের বড় সাইজের পাতা দিয়ে মুড়ে নানারকম মশলা আর তেলের মধ্যে ফেলে কড়া করে ভাজা হয়েছে। মাংসের গায়ে কোথাও মশলার চিহ্ন পর্যন্ত নেই, কিন্তু স্বাদটা দারুণ !

এক প্লেট খাবার আর এক বোতল ঠাণ্ডা পানি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল রাহাত, সাইপ্রেস গাছের ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে পেট-পূজা এবং রাস্তার ওপর নজর রাখা, দু'টো কাজই সারছে। খাওয়া শেষ হয়েছে, এই সময় ওদেরকে আসতে দেখলো ও।

ওর মনোকিউলার ওদেরকে একেবারে কাছে টেনে আনলো—খচ্চরের পিঠে বসা অ্যালপেনকরপ্স্ সৈনিকের একটা সারি, সারির শেষ মাথাটা অনেক দূর পিছনে। এবার অনেক কাছ থেকে দেখার সুযোগ হলো বলে জার্মান সৈনিকদের এই প্রথম দলটার আকার আকৃতি এবং শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা করতে পারলো ও। প্লেট এবং বোতল নিয়ে এক ছুটে বাড়ির ভেতর ফিরে এল। দেখলো, বুড়ো গ্রীকের কাছ থেকে ভেড়ার চামড়া দিয়ে তৈরি দু'টো কোট নিয়ে এরই মধ্যে গায়ে চড়িয়ে ফেলেছে গ্রীণ আর ম্যালোরি। পকেট থেকে নোট বুক বের করে খসখস করে তাতে বুড়োর নাম লিখছে ম্যালোরি, ভবিষ্যতে যদি সম্ভব হয় কোটের দাম মেটাবার ব্যবস্থা করবে।

ধমকের সুরে এই প্রথম ম্যালোরির সাথে কথা বললো রাহাত, 'নাম নয়, এইমাত্র তুমি ওর মৃত্যুদণ্ড লিখে রাখলে, ম্যালোরি! তুমি যদি জার্মানদের হাতে ধরা পড়ো এবং তারা যদি পায় ওটা?'

আঁতকে উঠলো ম্যালোরি। তাড়াতাড়ি বললো, 'ভুল হয়ে গেছে, স্যার!' বলে কাঠ-কয়লার চুলোর সামনে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসলো সে। নোট বুক থেকে কাগজটা ছিঁড়ে পোড়াবে।

'জলদি করো!' পিছন থেকে বললো রাহাত। 'ওরা কাছে চলে এসেছে।'

পোড়া কাগজটা হাতে তুলে নিয়ে দুই তালু একসাথে করে ঘষলো ম্যালোরি। সিধে হয়ে উঠে দাঁড়ালো। 'কত কাছে, স্যার?'

'দু'মাইল।'

গম্ভীর দেখালো ম্যালোরিকে। নিঃশব্দে পাপাগোপালা এবং গ্রীণের দিকে তাকালো সে। 'ঘুমিয়ে নিয়ে আমি তাজা হয়ে গেছি। তোমাদের কি অবস্থা? খচ্চরের চেয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে হবে, পারবে তো?' রাহাতের দিকে ফিরলো সে। 'ওপর দিকে উঠে যাবার আর বোধহয় কোনো রাস্তা নেই, স্যার?'

উত্তর দেবার কোনো প্রয়োজন বোধ করলো না রাহাত।

'নেই,' পাথরের চার দেয়ালের ভেতর গমগম করে উঠলো পাপাগোপালার কণ্ঠস্বর।

'ঠিক আছে, তাহলে রোড ধরেই যেতে হবে—হেঁটে। চলুন, স্যার।'

পাপাগোপালার দিকে ফিরলো রাহাত। ইঙ্গিতে বুড়ো গ্রীকের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো ও। 'ওকে বলো ওর আতিথেয়তায় আমরা খুশি হয়েছি। কোট আর খাবারের জন্যে কিছু দিতে যাওয়াটা বোধহয় অন্যায় হয়ে যাবে?'

'জ্বী।' খোলা দরজা দিয়ে রোডের দিকে তাকিয়ে আছে পাপাগোপালা। সেদিকে পা বাড়িয়ে কাঁধ থেকে রাইফেলটা নামিয়ে নিল সে।

'এক সেকেণ্ড, পাপাগোপালা!' দ্রুত বললো রাহাত। 'ওকে আরও বলো, জার্মানরা এলে তাদেরকে জানাতে হবে, ওটা বোধহয় একটা চুরি করা গরুর গাড়ি, গাছের আড়ালে ফেলে পাহাড়ের দিকে ছুটে পালিয়ে যেতে দেখেছে আমাদেরকে। কিছু একটা না বললে জার্মানরা ওকে হয়তো মেরেই ফেলবে। আরও বলো, ওর নিজের প্লেট আর গ্লাস বাদ দিয়ে শুধু আমাদেরগুলো ধুয়ে ফেলুক। এই ধরনের খুঁটিনাটি ব্যাপার লক্ষ্য করবে ওরা।

আর, ধন্যবাদ জানাতে ভুলো না।'

দরজার কাছ থেকে স্থানীয় গ্রাম্য গ্রীক ভাষায় দ্রুত একটানা কথা বললো পাপাগোপালা। তার কথা শেষ হতে গ্রীক বুড়ো এগিয়ে এসে রাহাতের সাথে হাত মেলালো, তারপর বিড়বিড় করে কি বললো ঠিক বোঝা গেল না। ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে ওরা, পিছন ফিরে একবার তাকালো রাহাত। দেখে স্বস্তিবোধ করলো, বুড়ো সময় নষ্ট না করে প্লেটগুলো ধুতে শুরু করেছে।

ছোটো, নিচু পাহাড়ের ওপর দিয়ে উঠে গেছে রাস্তাটা। খানিক দূর উঠতেই পিছনে জার্মান সৈনিকদের সারিটাকে দেখতে পাওয়া গেল। আরও অনেক কাছে চলে এসেছে তারা। তাড়াতাড়ি কোথাও লুকাতে হবে ওদের, তা না হলে ধরা পড়ে যেতে হবে। কিন্তু গা-ঢাকা দেয়া মানে পরাজয় স্বীকার করে নেয়া। এবার যদি জার্মান সৈনিকরা ওদেরকে ছাড়িয়ে সামনে এগিয়ে যায়, কোনোভাবেই আর তাদেরকে পিছনে ফেলা সম্ভব হবে না। তাছাড়া, গা ঢাকা দিয়েও যে রেহাই পাওয়া যাবে, তাও নয়। ধরা পড়া শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র। ভোজবাজির মতো কিছু একটা না ঘটলে মিত্রপক্ষের এই ছোট্ট দলটা দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

ঠিক ছুটছে না ওরা, আবার হাঁটছেও না, দৌড় আর হাঁটার মাঝামাঝি একটা ব্যস্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছে। সবার আগে রয়েছে রাহাত। কিন্তু পাহাড়ের মাথায় ওঠার অনেক আগেই এই গতিও মন্থর হয়ে এল। আঁকাবাঁকা রাস্তাটা ক্রমশ খাড়া হয়ে গেছে, দু'ধারে বিরাট আকারের বোল্ডারের মিছিল, উঁচু-নিচু কিনারা থেকে পড়ি পড়ি করেও পড়ছে না। পাহাড়ের ঢাল ঢাকা

পড়ে আছে জলপাই গাছের উঁচু ঝোপে, কয়েকটা বাঁক নিতেই নিচের প্রান্তর আড়ালে পড়ে গেল। এতে লাভ হলো এই যে নিচের খচ্চর বাহিনী ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু লোকসান হলো এই যে শত্রুরা কতটা কাছে চলে এসেছে তা জানার আর কোনো উপায় থাকলো না ওদের। আড়ালটাই বেশি দরকার, নিজকে স্মরণ করিয়ে দিল রাহাত। রাস্তা ছেড়ে ঝোপের আড়ালে গা-ঢাকা দেবার ঝোঁক চাপলো বারবার, কিন্তু তার মানে হবে জার্মানদেরকে এগিয়ে যেতে দেয়া। এত সহজে হার মানবো? আপনমনে বাঁকা হেসে ভাবলো ও, ইস্তাম্বুল থেকে ওই রকম একটা প্রমোদভ্রমণে টিকে যাওয়ার পরও?

'আর খুব বেশি হলে ত্রিশ মিনিট সময় পাবো আমরা,' পিছন থেকে বললো ম্যালোরি।

মাথা ঝাঁকিয়ে একমত হলো রাহাত। ত্রিশ মিনিটের মধ্যে ওদেরকে নাগালের মধ্যে পেয়ে যাবে জার্মানরা। মনে মনে অস্থির হয়ে উঠলো ও। আর কত দূর মালভূমি? ওখানে পৌঁছুলে কি গা·ঢাকা দিয়ে এগোবার কোনো উপায় হবে? ছয় মাইল লম্বা ওটা, সবটাই কি ওদেরকে পায়ে হেঁটে পেরোতে হবে? এই এলাকার টপোগ্রাফী সম্পর্কে খুব কমই জানা আছে ওর। বছর কয়েক আগে মালভূমির ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় গোটা এলাকাটা ঘন কুয়াশায় ঢাকা ছিল।

সবাইকে বেশ অনেকটা পিছনে ফেলে একা এগিয়ে এসেছে রাহাত। ওকে ধরার জন্যে দৌড়াতে শুরু করলো ম্যালোরি, তার দেখাদেখি বাকি সবাইও।

'স্যার!' এইটুকু বলে রয়ে গেল ম্যালোরি। মেজর সাংঘা-

তিক হাঁপাচ্ছে দেখে কিছু বলতে চায় সে। কিন্তু কিভাবে বলবে কথাটা ভেবে পেল না। 'মানে…'

রাহাত যেন ম্যালোরির না-বলা কথা বুঝতে পেরেছে। বললো, 'শুরুতে ওদের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিলাম আমরা, ম্যালোরি!'

'ইয়েস, স্যার!'

'ওপরে উঠে তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে,' বললো রাহাত। কথা বলা এখন শুধু সময়ের অপচয় নয়, শক্তিরও অপ-ব্যয়। হাঁটো, আরও জোরে, হাঁটো! মনে মনে বার বার আওড়াচ্ছে ও। ম্যালোরি এখন ওর পাশে চলে এসেছে, তারমানে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী পাওয়া গেল। নিচের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাবার প্রবণতাটাকে গলা টিপে মারলো ও। তাতে হাঁটার গতি মন্থর হবে, ক্লান্তি বাড়বে। একটু বাঁকা হয়ে গিয়েছিল শিরদাঁড়া, সেটাকে সোজা করে সামনের রিজের দিকে তাকালো ও। ওটাই কি তবে মালভূমির কিনারা? এর আগে এই রকম তিনটে রিজ পেরিয়ে এসেছে ওরা। প্রতিবার মনে হয়েছে, এরপরই মালভূমি। এটাও কি ওদেরকে হতাশ করবে? কিন্তু আর যে শক্তি নেই, আর যে হাঁটা যায় না। ওদের এখন যা মনের অবস্থা, ওপরের মালভূমিটাকে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট আর আপদ-বিপদের ঊর্ধ্বে স্বর্গ বলে ভাবতে ইচ্ছে করছে। যেখানে কোনোমতে একবার পৌঁছুতে পারলেই পিছু ধাওয়ারত জার্মান সৈনিকদের হাত থেকে বাঁচার একটা উপায় হবে।

কাঁটা-ঝোপ, বোল্ডার দু'পাশ দিয়ে দ্রুত পিছিয়ে যাচ্ছে। শুধু সামনের দিকে তাকিয়ে আছে রাহাত। টলমল করতে করতে

কাছে চলে আসছে রিজ। একটা বাঁক নিল ওরা, তারপর আরেকটা। নিজেকে আর মানুষ বলে মনে হচ্ছে না, রবারের তৈরি রোবটের মতো লাগছে। কিন্তু হঠাৎ বেড়ে ওটা ঠাণ্ডাটা অনুভব করতে পারলো। বাতাসের গতিও একটু একটু করে বাড়ছে। আবার আশা জাগলো মনে, এতক্ষণে বোধহয় দুর্গম পথের শেষ মাথায় পৌঁছুতে যাচ্ছে ওরা। আরেকটা বাঁক, সাদা ধুলোর আরেক প্রস্থ বিস্তৃতি। আরেকটা বাঁক···।

'বাতাস!' ঠাণ্ডায় হি হি করতে করতে বললো ম্যালোরি। 'আমরা বোধহয় কাছাকাছি পৌঁছে গেছি।'

হুঁ করে শুধু একটা আওয়াজ করলো রাহাত। হাঁটার গতি বেড়ে গেল আরও। আস্তিন দিয়ে দ্রুত কপালের ঘাম মুছলো একবার। পিছিয়ে পড়তে শুরু করলো ম্যালোরি। ক্রমশ নিচু হচ্ছে রিজের মাথা। তারপর বিজয়ের উল্লাস অনুভব করলো রাহাত। রিজের ওপর খোলা আকাশ দেখতে পেল ও।

এই পর্যায়ে কোনোরকম দ্বিধা নয়, নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল রাহাত। কি করা হবে না হবে তাড়াতাড়ি ঠিক করে ফেলতে হবে। ওপরে এক-আধটা খামার-বাড়ি থাকতে পারে। ভাগ্য সহায় হলে সাইকেলও জুটে যেতে পারে। প্রথম বার পেনিনসূলায় এসে কাটায়রার লোকজনকে সাইকেল চালাতে দেখেছিল ও। খচ্চরের সাথে সাইকেলের একটা তুলনা চলতে পারে। রাস্তাটা কি রকম তার ওপর নির্ভর করছে অনেক কিছু। আর যদি কিছুই পাওয়া না যায়?

ছুটলো রাহাত, রিজের মাথা টপকে চলে এল মালভূমির ওপর। তারপর কয়েক সেকেণ্ড নড়তে পারলো না ও, অদৃশ্য

একটা হাত যেন ঠাস করে চড় কষেছে গালে। যতদুর দেখতে পেল, কোথাও কোনো আড়াল বা গা-ঢাকা দেবার মতো কিছু চোখে পড়লো না। মাইলের পর মাইল ফাঁকা। রোডটাও একটা বিস্ময়। বেশিদিন হয়নি আলকাতরা ঢালা হয়েছে, সোজা সেই বহুদুরের পাহাড়ে গিয়ে ঠেকেছে। সমতল প্রান্তরটা রাস্তার এক-দিকে সবুজাভ, আরেক দিকে খয়েরী। নিশ্চয়ই পেনিনস্যূলার টিপ থেকে এই হাইওয়ে শুরু করা হয়েছে, সময়ে যেটাকে কাটায়রা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হবে।

'ফাটা কপাল!' মন্তব্য করলো ম্যালোরি।

কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকালো রাহাত। 'পাপা-গোপালার কি অবস্থা?'

'খুঁড়িয়ে হাঁটছে তাই একটু পিছিয়ে পড়েছে, ওকে সঙ্গ দিচ্ছে গ্রীণ। আরে, ওখানে কি করছে ওরা?'

রাস্তা থেকে সামান্য একটু সরে গিয়ে একটা ঝুল-পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে পাপাগোপালা আর গ্রীণ। হাতছানি দিয়ে ওদেরকে ডাকছে তারা। রাহাতকে রেখে সেদিকে এগোলো ম্যালোরি।

'তাড়াতাড়ি, স্যার! তা না হলে দেখতে পাবেন না!' তাগাদা দিল গ্রীণ।

ঝুল-পাথরে চলে এল ম্যালোরি। 'কি দেখতে পাবো না?' ওর পিছনে সূর্য, কিন্তু ঘাড়ে পড়া রোদে এতটুকু উত্তাপ নেই। ঠাণ্ডায় হি হি করতে করতে মনে পড়লো, তারা একটা লো-টেম্পা-রেচার জোনে ঢুকতে যাচ্ছে। পাপাগোপালার পাশে দাঁড়িয়ে গায়ের কোট নেড়েচেড়ে ঠিক করে নিল ও। সাইজে বড় হয়েছে

ওটা, কাঁধের কাছে ঢিলে হয়ে আছে। গ্রীণের বাড়ানো হাত অনুসরণ করে বাড়িটার ছাদ দেখতে পেল ও। সাইপ্রেস গাছের পাশে দেখা গেল অ্যালপেনকরপ্‌স্‌ সৈনিকদের সারিটাকে।

'ওই ওরা আসছে।' বললো গ্রীণ।

'জানো ওটাই প্রথম দল কিনা?' জানতে চাইলো ম্যালোরি।

'জানি, স্যার। এর আগেও ওদেরকেই দেখেছি।'

দুই কি তিনজন লোককে বাড়িটার ভেতর ঢুকতে দেখা গেল। সারির বাকি সবাই যেমন এগিয়ে আসছিল তেমনি এগিয়ে আসতে লাগলো। দলটা পাহাড়ে উঠতে শুরু করতেই ওপর থেকে আর তাদেরকে দেখা গেল না। সাইপ্রেস গাছের আড়ালে দেখা যাচ্ছে গরুর গাড়িটাকে। বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে সেটার দিকে এগোলো না কেউ। মনে মনে স্বস্তিবোধ করলো ম্যালোরি। ঝুল-পাথর থেকে ছুটে চলে এল রাস্তায়, সেখান থেকে মালভূমির ওপর রাহাতের পাশে।

স্তব্ধ পাথর হয়ে গেছে রাহাত। মুখ তুলে তাকিয়ে আছে ওপর পানে।

'স্যার!' ফিসফিস করে ডাকলো ম্যালোরি। পরমুহূর্তে চমকে উঠে বললো, 'ও কিসের শব্দ?'

'রিইনফোর্সমেন্ট,' বিড়বিড় করে বললো রাহাত। 'মাই গড, এতটা আমি আশা করিনি! এ তো গোটা জার্মান সেনাবাহিনীর অর্ধেক!'

উত্তর-পুব দিকের আকাশ এখনও পরিষ্কার। পরিষ্কার মানে, মেঘ নেই। কিন্তু সেই আকাশ দ্রুত ঢাকা পড়ে যাচ্ছে জার্মান এয়ারফোর্সের ট্র্যান্সপোর্ট প্লেনের ভিড়ে। ভারি ইঞ্জিনের শব্দে

মুখর হয়ে উঠলো বাতাস। এক একটা প্লেনে তিনটে করে ইঞ্জিন, জানে রাহাত। ফিউজিলাজে একটা করে আয়রণ-ক্রস, লেজে আঁকা রয়েছে স্বস্তিকা। 'ওগুলোয় নিশ্চয়ই ছত্রীসেনা আছে!' ফিসফিস করে বললো ম্যালোরি।

প্রথম ঝাঁকের নিচে দিয়ে আসছে আরও একটা ঝাঁক। এই ঝাঁকের প্রতিটি প্লেনের সাথে ঝুলছে বিভিন্ন কাঠামোর আকৃতি। গ্লাসটা চোখে তুলে ফোকাস অ্যাডজাস্ট করলো রাহাত।

'পিছনে ওরা পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করেছে, স্যার!' ব্যস্ত সুরে বললো ম্যালোরি। 'কোনো কিছুই ওদেরকে ঠেকাতে পারবে না, সন্ধ্যের আগেই জার্ভোস দখল করে নেবে ওরা।'

'এমনও হতে পারে,' ক্ষীণ কণ্ঠে ওদের পিছন থেকে বললো গ্রীণ, 'ওরা হয়তো মেইনল্যাণ্ডে যাবে বলে আসছে।'

চোখে গ্লাস নিয়ে তাকিয়ে আছে রাহাত, প্লেনগুলো এগিয়ে আসার সাথে সাথে এক দিকে কাত হয়ে যাচ্ছে ওর মাথা। যে-সব প্লেন বোঝা ঝুলিয়ে নিয়ে আসছে সেগুলো দ্রুত নামছে নিচের দিকে, আর ট্রান্সপোর্ট প্লেনগুলো ভোঁতা গর্জন তুলে চক্কর দিচ্ছে মালভূমির ওপর। ওদেরকে বাধা দেবার জন্যে আকাশের কোথাও একটা মিত্রপক্ষের ফাইটারকে দেখা গেল না। সবশেষে, আকাশের একেবারে শেষ প্রান্ত থেকে ছুটে এল জার্মান বিমান বাহিনীর এক ঝাঁক ফাইটার। রয়্যাল এয়ারফোর্স আসবে না, জানে রাহাত। আলবেনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে গ্রীককে সাহায্য করছে তারা। জার্মান বিমান বাহিনী সেখানে এর চেয়ে অনেক, অনেক বেশি শক্তি নামিয়েছে।

গ্রীণের কাঁধ ঝুলে পড়েছে, বোকার মতো একবার ম্যালোরি,

একবার রাহাতের দিকে তাকাচ্ছে সে। ম্যালোরি স্তব্ধ হয়ে গেছে, বুকের ভেতর ধড়াস্ ধড়াস্ ছাড়া আর কিছু অনুভব করছে না। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ওদের কাছে এসে থামলো পাপাগোপালা। কাঁদছে না সে, কিন্তু চেহারাটা এমন বিকৃত দেখালো, মনে হলো কেঁদে ফেলবে। গ্রীণের কাঁধে একটা হাত রেখে একটু দম নেবার চেষ্টা করলো সে।

বোধহয় ওদের কাছ থেকে কোনো সাড়াশব্দ না পেয়েই চোখ থেকে গ্লাস নামিয়ে দু'সেকেণ্ডের জন্যে তাকালো রাহাত। চেহারা বদলায়নি ওর, কিন্তু চোখে উদভ্রান্ত দৃষ্টি। নিষ্ঠুর, বোধ-বুদ্ধিহীন পাগল বলে মনে হলো ওকে। কিছু বললো না। ঝট করে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার গ্লাস তুললো চোখে।

মালভূমির গোটা আকাশ জুড়ে জার্মান বিমান বাহিনী যেন বিস্ময়কর এক সার্কাস দেখাচ্ছে। ট্র্যান্সপোর্ট প্লেনের সংখ্যা বিশ-বাইশটার বেশি নয়, সব মিলিয়ে গোটা ত্রিশেক।

'ওগুলো ওরা গ্লাইডার ঝুলিয়ে নিয়ে আসছে,' বললো গ্রীণ।

সায় দেবার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো রাহাত। প্লেনগুলো মালভূমির সমতল সারফেসের দিকে ছুটে আসছে, সেই সাথে রোডের সাথে সমান্তরাল রেখায় চলে আসছে ঝাঁকের প্রথম প্লেনটা। ওদিকে ট্র্যান্সপোর্ট প্লেনের ঝাঁক থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল একটা, তার তলপেট থেকে এক এক করে আকাশে উদয় হলো অনেকগুলো কালো বিন্দু। ছত্রীসেনারা নামতে শুরু করলো জার্ভোসে। এক মুহূর্ত পর একটা ক্যারিয়ার প্লেন থেকে বিচ্ছিন্ন হলো একটা মেশিন, গ্লাইডার সেটাকে নিচের

দিকে নামিয়ে আনছে।

'টেক কাভার!' চিৎকার করে অর্ডার দিল রাহাত।

আট

প্লেন থেকে বিচ্ছিন্ন গ্লাইডার আকাশে এখন অনেকগুলো। একটা বাদে বাকিগুলো সাবলীল ভঙ্গিতে সমতল মাটির দিকে নেমে আসছে। ওই একটায় নিশ্চয়ই কোনো যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিয়েছে, ঘন ঘন এদিক-ওদিক কাত হয়ে পড়ছে সেটা, সব-গুলোকে ছাড়িয়ে দ্রুত ছুটে আসছে মালভূমির কিনারা লক্ষ্য করে, খানিক আগে ওরা চারজন যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। নিরেট, ভোঁতা একটা ভাব আছে ওটার চেহারায়, দেখতে কুৎসিত। জোড়া-লেজ আর ফিউজিলাজ সাংঘাতিক মোটা আর ভারি, দেখেই বোঝা যায়, প্রচুর ভার বহনের ক্ষমতা রাখে।

'এক সেকেণ্ড, ম্যালোরি!' থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো রাহাত। মালভূমি ছেড়ে রোডের ফুটহিলের দিকে পিছিয়ে আসছিল ওরা।

রাহাতের কথা শুনে দাঁড়িয়ে পড়লো সবাই। রাহাতের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালো অস্থিরমতি গ্লাইডারটার দিকে।

আধ মাইল সামনে, রাস্তার পাশে খয়েরী মাটির ওপর ঝপাঝপ নামছে প্যারাস্যুটিস্টরা। মেইন ল্যাণ্ডিং এরিয়া হিসেবে ওটাকেই বেছে নিয়েছে ওরা। রাস্তার বাঁ দিকে মাত্র একটা ট্র্যান্সপোর্ট প্লেন ল্যাণ্ড করতে যাচ্ছে, মাটির দিকে নাক করে বড় বেশি খাড়াভাবে আর লেজটা এক দিকে বাঁকা করে নেমে আসছে সেটা। রাস্তার অপর দিকে এরই মধ্যে দু'টো প্লেন নিরাপদে মাটি স্পর্শ করেছে, আরেকটা নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

'বাঁ দিকের প্লেনটা বিপদে পড়বে,' উত্তেজিত গলায় বললো ম্যালোরি। 'ঝোপের ভেতর ওখানে শুধু কাদা আর পানি।'

'তুমি জানলে কিভাবে?' দ্রুত জিজ্ঞেস করলো রাহাত।

'ইস্তাম্বুলে যাবার পথে পাইলটকে এদিক দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। এথেন্স থেকে রওনা হবার আগে জার্ভোস সম্পর্কে আলোচনা হয়, জায়গাটা সম্পর্কে কৌতূহল ছিল। পাইলট বললো, সবুজ এলাকাটা আসলে জলা...'

ট্র্যান্সপোর্ট প্লেনগুলোর দিকে তাকিয়ে গ্রীণ বললো, 'ওগুলো জে-ইউ ফিফটি-টু/থ্রি-এস—শুনেছি, ওগুলো নাকি মাউণ্টেন গান বইতে পারে...'

'আর ওটা?' ওদের দিকে দ্রুত ছুটে আসছে গ্লাইডারটা, সেদিকে গ্রীণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানতে চাইলো ম্যালোরি।

'হয়েছে,' বললো রাহাত। 'চলো, এখান থেকে কেটে পড়ি।'

'আমার যদি ভুল না হয়, ওটা একটা গোথা...' হঠাৎ আবি-

ষ্কার করলো গ্রীণ, তাকে ফেলে ঝোপ আর বোল্ডারের দিকে ছুটছে সবাই। ওদেরকে অনুসরণ করার সময় একেবারে মাথার ওপর ট্র্যান্সপোর্ট প্লেনের ভোঁতা আওয়াজ পেল সে। কিন্তু মুখ তুলে তাকাবার প্রয়োজন বোধ করলো না। আত্মতৃপ্তির অদ্ভুত একটু হাসি ফুটে উঠলো তার ঠোঁটে। ভাবলো, শুধু বোধহয় আমি একাই মেনে নিতে পেরেছি ব্যাপারটাকে। মেজরের দিকে তাকালো সে। ঘন ঘন মাথা তুলে আকাশে চোখ বুলাচ্ছেন। সেকেণ্ড লেফটেন্যান্টও তাই করছেন। আর পাপাগোপালা আকাশের দিকে নয়, বারবার মেজরের দিকে তাকাচ্ছে, যেন তিনিই উদ্ধার করবেন। কিন্তু মনে মনে জানে গ্রীণ, পথের শেষ মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে তারা, এখান থেকে পালাবার আর কোনো উপায় নেই। ধরা পড়ার সময় যদি ওদেরকে গুলি করে মেরে ফেলা না-ও হয়, যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত জার্মান প্রিজন-ক্যাম্পে বন্দী জীবন কাটাতে হবে সবাইকে। প্রথম বোল্ডারের কাছে পৌঁছে গেছে, এই সময় কাঁধ থেকে পিছলে গেল মেশিন-পিস্তল-টা। কুড়িয়ে নেবার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার ছুটলো সে। অবাক হয়ে দেখলো, তাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল মেজর রাহাত।

গ্রীণের মেশিন-পিস্তলের ঠিক পাশে গিয়ে দাঁড়ালো রাহাত। কিন্তু তাকিয়ে আছে সেই অস্থিরমতি গ্লাইডারটার দিকে। মেশিন-পিস্তল কুড়িয়ে নিয়ে তার দৃষ্টি অনুসরণ করে গ্রীণ দেখলো, প্রকাণ্ড গোথা অ্যাসল্ট কার্গো গ্লাইডার ওদের একশো গজের মধ্যে নেমে আসছে, কিন্তু এমন তেরছাভাবে এগোচ্ছে সেটা, মালভূমির কিনারায় পৌঁছুবে কিনা সন্দেহ। রিজের মাথায় বা গায়ে যদি বাড়ি

খায়, ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। পিছন থেকে ডাকলো ম্যালোরি, কিন্তু রাহাত বা গ্রীক কেউই তার কথা শুনতে পেল না। দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে দেখে ওরা দু'জন যেন শক্ত পাথর হয়ে গেছে।

মুহূর্তের জন্যে রাহাতের দিকে তাকালো গ্রীণ। দেখলো, মেজরের চোখে এখন আর সেই আগের উদভ্রান্ত দৃষ্টি নেই। কাত হয়ে পড়া গ্লাইডারের দিকে রাজ্যের প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছেন তিনি। কারণটা বোধগম্য হলো না গ্রীণের। একটা গ্লাই-ডার বিধ্বস্ত হলে কিছু জার্মান সৈনিক মারা যাবে, আর ভেতরে যদি কিছু থাকে সেগুলো ধ্বংস হবে—তাতে এত উৎফুল্ল হবার কি থাকতে পারে?

শেষ মুহূর্তে নিজে থেকেই সোজা হবার প্রয়াস পেল গ্লাই-ডার। প্রত্যাশিত দুর্ঘটনা ঘটলো না, ওদের কাছ থেকে শ'খানেক ফিট দূরে নরম মাটির ওপর দড়াম করে বাড়ি খেয়ে ছোট দু'টো ড্রপ দিল, তারপর স্থির হয়ে গেল।

'ফর গডস সেক, টেক কাভার!' ওদের পিছন থেকে চিৎকার করে বললো ম্যালোরি। হুঁশ ফিরে পেয়ে ফেরার জন্যে দাঁড়ালো গ্রীণ, কিন্তু নিজের জায়গা ছেড়ে নড়লো না রাহাত।

দু'বার ড্রপ খেয়ে সিধে হয়ে গেছে গ্লাইডার, মাটির সাথে বাড়ি লাগায় ফিউজিলাজের কোনো ক্ষতি হয়নি। বিশাল এয়ার-ক্রাফটের গোটা নাক হুডের মতো পিছন দিকে ভাঁজ হয়ে যেতে শুরু করলো। ক্রমশ বড় হচ্ছে ফাঁক, ভেতরে চাকাওয়ালা একটা মেশিনের পাশে একজন সৈনিককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। এক মুহূর্ত পর চেনা গেল মেশিনটাকে। বড়সড় একটা কার, বেরিয়ে আসার জন্যে অপেক্ষা করছে। মাতালের মতো

দেখালো লোকটাকে, টলতে টলতে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসলো সে। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কপালে কি যেন মুছলো, বোধহয় রক্ত। স্টার্ট নিল ইঞ্জিন, ঘড় ঘড় আওয়াজ তুলে ধীরে ধীরে নাক থেকে বেরিয়ে আসছে গাড়িটা। জার্মান ড্রাইভার সামনের দিকে নেতিয়ে পড়ার ভঙ্গিতে হুইলের ওপর ঝুঁকে আছে, যেন সিধে হয়ে বসারও শক্তি নেই তার। ক্র্যাশ ল্যাণ্ডিঙের ফলে চোট পেয়েছে লোকটা।

প্রথম বোল্ডারের আড়ালে ফিরে গিয়ে উঁকি দিয়ে রাহাতের দিকে তাকিয়ে আছে গ্রীণ। তার এক পাশে ম্যালোরি, আরেক পাশে পাপাগোপালা। 'মেজরকে ডাকো,' ফিসফিস করে বললো পাপাগোপালা।

'স্যার!'

ঘড় ঘড় আওয়াজ করে এয়ারক্রাফটের নাক থেকে বেরিয়ে এল গাড়িটা। ম্যালোরির ডাক রাহাত শুনতে পেয়েছে কিনা বোঝা গেল না। জার্মান ড্রাইভারের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ও। লোকটা গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে আসছে বটে, কিন্তু পরিবেশ সম্পর্কে তাকে তেমন সচেতন বলে মনে হলো না। ওদেরকে এখনও দেখতে পায়নি সে। মাথায় ক্যাপ নেই, পরনে অ্যালপেনকরপ্‌স্‌ ইউনিফর্ম। কোটের পকেটে ধীরে ধীরে হাত ভরে গাড়িটার গায়ে চোখ বুলালো রাহাত। তারপর দৃঢ় পায়ে, মাথা উঁচু করে ঘাসের ওপর দিয়ে সামনের দিকে এগোলো। ট্রাকের মত লম্বা একটা গাড়ি, গায়ের রঙ কালচে সবুজ, সামনে সাধারণ এক জোড়া চাকা, কিন্তু পিছনে কোনো চাকা নেই—বদলে, এক জোড়া বড় আকারের ক্যাটারপিলার ট্র্যাক দেখা গেল। দেখেই

চিনলো রাহাত—এটা একটা হাফ-ট্র্যাক। অর্ধেক ট্যাংক, অর্ধেক কার।

ট্যাংকের চেইন ঘুরছে, ঘড় ঘড় আওয়াজ তুলে ঘাসের ওপর নেমে এল সেটা। এতক্ষণে মাথা তুললো ড্রাইভার, তুলেই মাত্র কয়েক ফিট সামনে দেখতে পেল রাহাতকে।

'ব্রেক!' দ্রুত বললো রাহাত। 'কর্নেল ব্রিজেলবার্ড এখানে উপস্থিত! এই গাড়ি এখুনি তাঁর দরকার।'

জার্মান ভাষায় দেয়া হলো অর্ডারটা, কর্নেল ব্রিজেলবার্ডের নামটা পরিচিত, সাথে সাথে ব্রেক করলো ড্রাইভার। রাহাতের কাঁধের ওপর দিয়ে আরও দূরে গিয়ে পড়লো তার দৃষ্টি। ইতিমধ্যে বোল্ডারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে ওরা তিনজন। দ্রুত রাহাতের দিকে এগিয়ে আসছে ম্যালোরি আর গ্রীণ, ওদের দিকে পিছন ফিরে রোডের ওপর চোখ রাখছে পাপাগোপালা। হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল জার্মান ড্রাইভারের শরীরে, কিন্তু পকেটে হাত ভরা আর হলো না তার, আগেই ল্যুগার বের করে ফেলেছে রাহাত। বাঁট দিয়ে লোকটার ঠিক কপালের মাঝখানে বাড়ি দিল ও। ড্রাইভার নেতিয়ে পড়ার আগেই দরজা খুলে তাকে ধরে ফেললো, টেনে বের করে আনলো গাড়ির বাইরে। ওদিকে ম্যালোরি আর গ্রীণও বসে নেই। গাড়ি এবং রাহাতকে ছাড়িয়ে গ্লাইডারের খোলা মুখের দিকে ছুটছে ওরা।

এক হাত দিয়ে টেনে নিয়ে এসে ঘাসের ওপর শুইয়ে দিল রাহাত ড্রাইভারকে, ল্যুগারটা রয়েছে আরেক হাতে। মুখ তুলতেই আরেকজন জার্মানকে দেখতে পেল। গ্লাইডারের খোলা নাকের সামনে এসে দাঁড়ালো সে, হাতের রাইফেল রেডি।

প্রায় একই সময় দু'টো গুলির আওয়াজ হলো। প্রথমটা ছুঁড়লো জার্মান সৈনিক, লাগলো গ্রীণকে। দ্বিতীয়টা ছুঁড়লো রাহাত, জার্মান সৈনিকের বুকে বিঁধলো। ইতিমধ্যে গ্লাইডার-টাকে ঘুরে পিছন দিকে চলে এসেছে ম্যালোরি, গুলি খাওয়া লোকটাকে ক্যাটারপিলার ট্র্যাকের মাঝখানের ফাঁকে পড়তে দেখলো সে। লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল, নিহত জার্মানের বেল্ট থেকে ছোঁ দিয়ে তুলে নিল একটা হ্যাণ্ড-গ্রেনেড। 'হেডস্ ডাউন!' চেঁচিয়ে উঠেই পিছিয়ে আসতে শুরু করলো সে, তিন পা পিছিয়ে এসে মাথার ওপর থেকে ছুঁড়ে দিল গ্রেনেড।

বাতাস চিরে ছুটে গেল গ্রেনেড, সোজা ঢুকলো গ্লাইডারের ভেতর। পরমুহূর্তে বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো। এক সেকেণ্ড আগে গ্লাইডারের ভেতর নড়াচড়ার আভাস পেয়েছিল রাহাত, বিস্ফোরণের পর আবার যখন মাথা তুলে তাকালো, গোথার ভেতর কিছুই আর অবশিষ্ট দেখলো না। এখনও যদি ওটার ভেতর কেউ বেঁচে থাকে, ওটাকে ঘিরে ধরা লেলিহান আগুনের শিখা থেকে তার পরিত্রাণ নেই।

ব্যথায় কিংবা ঘটনার আকস্মিকতায় চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে গ্রীণের, কিন্তু রাহাত আর ম্যালোরিকে ছুটে আসতে দেখে হাসি উপহার দিল সে।

'কোথায়?' জানতে চাইলো রাহাত। 'কোথায় লেগেছে?'

রাহাতের প্রশ্নের মধ্যে উদ্বেগ লক্ষ্য করে যেমন আশ্চর্য হলো, তেমনি খুশিও হলো গ্রীণ। মেজরকে এখন পর্যন্ত যতটা চিনেছে সে, ভদ্রলোকের ভেতর কোমলতা আছে বলে মনে হয়নি তার। কাজ-পাগল, নীরস, দয়ামায়াহীন কঠিন চরিত্রের একজন দুঃসা-

হসী অফিসার। মেজর সম্পর্কে এই ছিল তার ধারণা। কিন্তু এখন তাঁর গলার সুর এবং চেহারা দেখে ভুলটা ভাঙলো। না, ভদ্রলোকের মধ্যে স্নেহ-ভালবাসাও আছে তাহলে!

হাসিটা তাড়াতাড়ি চেহারা থেকে মুছে ফেলে গ্রীণ নেতিয়ে পড়লো। ব্যথায় কাতরে ওঠার ভান করে বিড়বিড় করে বললো, 'আমি বোধহয় মারা যাচ্ছি, মেজর!' হাঁটুর ওপর শরীরের ভর রেখেছিল সে, তার গায়ে মেজরের হাত পড়তেই শরীরটা ঢিল করে দিল।

ভেড়ার চামড়া দিয়ে তৈরি কোটের কাঁধ ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট, যাবার পথে গ্রীণের কিছুটা চামড়াও তুলে নিয়ে গেছে—জখম বলতে এই। গ্রীণকে ছেড়ে দিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়ালো রাহাত। বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ ছাড়লো, 'অ্যাটেনশন!'

ছেড়ে দেয়া স্প্রীঙের মতো খাড়া হয়ে গেল গ্রীণ। ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি ফুটতে যাচ্ছিলো, সেটাকে ফুটতে না দিয়ে দ্রুত বললো রাহাত, 'জলদি! এখুনি এসে পড়বে ওরা!' বলে গাড়ির পাদানিতে উঠে দাঁড়ালো ও।

গোটা ব্যাপারটা অবাক চোখে দেখলো ম্যালোরি, চোখাচোখি হতে গ্রীণ চাপা একটু হাসলো, বললো, 'মেজর রাহাতের ধমক খেয়ে মনে হচ্ছে, মরতে এখনও দেরি আছে আমার।'

হাফ-ট্রাকের পিছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো ওরা। ইতিমধ্যে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসেছে রাহাত। পিছন থেকে ম্যালোরি বললো, 'যে-কোনো গাড়ির মতোই চালাতে হয়··· ট্র্যাক জোড়া চাকা জোড়ার সাথেই ঘুরবে···'

পায়ের কাছে অ্যালপেনকরপ্‌স্‌ ক্যাপ পড়ে থাকতে দেখে

সেটা কুড়িয়ে রাহাতের কাঁধের ওপর দিয়ে বাড়িয়ে দিল গ্রীণ। 'এটা পরে নিন, স্যার।'

খপ করে ক্যাপটা নিয়ে মাথায় চাপালো রাহাত। ছুটতে ছুটতে গাড়ির পাশে চলে এল পাপাগোপালা। 'খচ্চর-বাহিনী পৌঁছে গেছে!' ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে সে। 'একটু পরই ওদের মাথা দেখা যাবে। প্রথম সারিতে সবার আগে রয়েছে···'

'ওঠো!' হুংকার ছাড়লো গ্রীণ। তার সাথে ম্যালোরির দু'হাত এগিয়ে গিয়ে ধরে ফেললো পাপাগোপালাকে, অনেকটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে গাড়িতে তুলে ফেলা হলো তাকে। ম্যালোরি আর গ্রীণের মাঝখানে লম্বা বেঞ্চির ওপর বসলো সে।

গাড়ির যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করছে রাহাত—ব্রেক, ক্লাচ-পেডাল, গিয়ার লিভার। দেখে মনে হলো, আর সব সাধারণ গাড়ির মতোই। ড্রাইভিং সীটের পিঠের পাশে স্ট্র্যাপের সাথে ঝুলছে ফার্স্ট এইড বক্স, সেটা পেড়ে নিয়ে খুললো ম্যালোরি। এই সময় ঘাসের ওপর দিয়ে কর্কশ ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে গুটি গুটি এগোলো গাড়ি। নাকটা রোডের দিকে তাক করে নিয়েছে রাহাত। গাড়িটা যে অসম্ভব ভারি আর শক্তিশালী, পিছনের চেইন জোড়ার প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও সাবলীল গতিতে ঘোরা লক্ষ্য করেই বেশ বোঝা গেল।

একই সাথে তিন দিকে মনোযোগ রাখতে হলো রাহাতকে। এই যান্ত্রিক দানব কিভাবে কাজ করে সেটা আবিষ্কার করা, পিছনের রিজের কিনারায় নজর রাখা, যে-কোনো মুহূর্তে ব্রিজেল-বার্ডের লোকজনকে দেখা যাবে ওখানে, সবশেষে মাঝেমধ্যে দক্ষিণ দিকে চোখ বুলানো, যেখানে ল্যাণ্ডিং জোনের পাশ দিয়ে

চলে গেছে রাস্তাটা। নতুন আরেক দফা ছত্রীসেনা বেরিয়ে এসেছে প্লেনগুলোর পেট থেকে, কালো বিন্দুতে ঢাকা পড়ে গেছে আকাশ। ঘন ঘন কয়েকটা ঝাঁকি খেয়ে আরেকটা ট্র্যান্সপোর্ট প্লেন ল্যাণ্ড করলো।

'তুত্তোরী ছাই!' বলে গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল রাহাত। রাস্তার ওপর উঠলো গাড়ি, সেই সাথে মালভূমির কিনারায়, রোডের পিছনে দেখা গেল অ্যালপেনকরপ্স্ সৈনিকদের প্রথম সারির প্রথম লোকটাকে।

লেফটেন্যান্ট মুলার! দেখেই চিনলো রাহাত। টাইম-বোমা বিস্ফোরিত হবার সময় টাটরাতেই ছিল সে, কিভাবে যেন বেঁচে গেছে। পরমুহূর্তে রাহাতের চোখের সামনে একসাথে অনেক-গুলো ঘটনা ঘটতে শুরু করলো। চিন্তা করার অবকাশ পাওয়া গেল না, উপস্থিত বুদ্ধি যা পারলো করিয়ে নিল ওকে দিয়ে। মুলারের পিছনে উদয় হলো আরও দু'টো খচ্চর। ছত্রীসেনাদের পা পড়লো মাটিতে, প্যারাস্যুটগুলো চুপসে যেতে লাগলো, টেনে সরিয়ে নেয়া হলো এক পাশে। বিশাল একটা গ্লাইডার খয়েরী এলাকায় ল্যাণ্ড করলো। প্লেন ইঞ্জিনের একঘেয়ে আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠলো খচ্চরের পিঠে বসা সৈনিকদের হাঁক-ডাক। একটা ক্যারাভ্যান টেনে নিয়ে আসছে, এই রকম অনুভূতি হলো রাহাতের, হাফ-ট্রাক রোডের ওপর উঠে আসতেই ধাতব ট্র্যাকের শক্ত দাঁত আলকাতরা কামড়ে ধরে এগোতে শুরু করলো। তীব্র ঝাঁকির সাথে ঘড়ঘড় আওয়াজটা হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়ায় আতংকিত হয়ে উঠলো খচ্চরগুলো। দিগ্বিদিক ছুটছে সে-গুলো, আরোহীরা হুংকার ছেড়েও বাগে আনতে পারছে না।

বাঁক নেয়া শেষ করে স্পীড বাড়াবার জন্যে কাঁধ দু'টো সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে ডান পায়ে পেডালে চাপ দিল রাহাত। দ্রুত ঘুরতে শুরু করলো চাকা, সেই সাথে দ্রুততর হলো পিছনের চেইনের গতি। ধাতুর সাথে শক্ত রোডের ঘর্ষণে বিকট আওয়াজ হতে লাগলো, আর সব শব্দ চাপা পড়ে গেল তাতে।

'কতটা স্পীড পেতে পারি ?'

সাথে সাথে কারও কাছ থেকে কোনো উত্তর পেল না রাহাত, এক মুহূর্ত পর চিৎকার করে গ্রীণ বললো, 'জানি না। বিশ···ত্রিশ·· চল্লিশ—পঞ্চাশ বোধহয় খুব বেশি হয়ে যাবে।'

ম্যালোরি আর গ্রীণের মাঝখান থেকে উঠে তিনটে বেঞ্চির শেষেরটায় বসলো পাপাগোপালা, পিছনের রাস্তার দিকে মেশিন-পিস্তল তুললো সে। অ্যালপেনকরপ্‌স্‌ সৈনিকদের প্রথম সারির প্রথম লোক লেফটেন্যান্ট মুলার, তার ওপর লক্ষ্যস্থির করে ট্রিগার টেনে দিল। সেই মুহূর্তে ছোট্ট একটা ঝাঁকি খেলো হাফ-ট্রাক। ছিটকে গাড়ি থেকে পড়েই যেত পাপাগোপালা, ম্যালোরি তাকে শেষ মুহূর্তে ধরে ফেললো বলে দুর্ঘটনাটা ঘটতে পারলো না।

'ধন্যবাদ!' ম্যালোরিকে কথাটা বলে ঝট্ করে রাহাতের দিকে ফিরলো পাপাগোপালা। 'মুলার আপনাকে আশীর্বাদ করছে, মেজর!' রেগে গেছে সে, গুলি করার মতো আর কোনো টার্গেট তার নেই। খচ্চর-বাহিনী বোল্ডারের আড়ালে পড়ে গেছে।

সামনের আকাশে আরও ট্র্যান্সপোর্ট প্লেন দেখতে পেল রাহাত। ল্যাণ্ড করার পালা আসার আগে চক্কর দিয়ে অপেক্ষা

করছে। রোডের ডান দিকটায় এরই মধ্যে জমজমাট হয়ে উঠেছে সামরিক সমাবেশ, যদিও এখনও নিজেদেরকে গুছিয়ে নিতে পারেনি। রোডের ধারে কাছে এখনও কোনো সৈনিককে দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু কয়েকশো গজ দূরে প্যারাস্যুট-মুক্ত সৈনিক-রা হাতে মেশিন-পিস্তল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাফ-ট্রাকের গর্জন শুনে তাদের অনেকেই ঘাড় ফিরিয়ে রোডের দিকে তাকালো। রাহাত লক্ষ্য করলো, এদের ইউনিফর্ম অ্যালপেনকরপস্ সৈনিকদের মতো নয়। গম্বুজ আকৃতির হেলমেট পরে আছে এরা, সবুজ আর খয়েরী রঙের শেমিজের সাথে ওভারঅল ট্রাউ-জার। তাদের তাকাবার উত্তরে হাত তুলে নাড়লো রাহাত। জার্মান সৈনিকরাও কেউ কেউ পাল্টা হাত তুলে নাড়লো।

'লুক আউট!' হঠাৎ আঁতকে উঠলো ম্যালোরি।

ঝট্ করে সামনে তাকালো রাহাত। মাদার-এয়ারক্রাফট থেকে মুক্ত হয়ে একটা গোথা অ্যাসল্ট গ্লাইডার বাঁ দিক থেকে রোডের ওপর ছুটে আসছে। এরই মধ্যে অনেক নিচে নেমে এসেছে সেটা, মাটি থেকে খুব বেশি হলে বিশ ফিট ওপরে। গতি দেখে মনে হলো, আড়াআড়িভাবে যেখানে রাস্তাটাকে পেরোবে সেখানে সে-সময় ওদেরকে নিয়ে পৌঁছে যাবে হাফ-ট্রাকও। তার-মানে সংঘর্ষ একটা ঘটতে যাচ্ছে।

পাইলট ইচ্ছে করলে রাস্তার বাঁ দিকে ল্যাণ্ড করাতে পারে গ্লাইডারটাকে, কিন্তু তা সে করাবে না। কারণ রাস্তার বাঁ দিকে রয়েছে জলা, ল্যাণ্ড করার সাথে সাথে কাদা-পানিতে ডুবে যাবে গ্লাইডার। অল্প হলেও, সময় আছে, চেষ্টা করলে ব্রেক করে গাড়ি থামাতে পারে রাহাত, কিন্তু তা ও থামাবে না। কারণ ডান

দিক থেকে জার্মান সৈনিকদের একটা লম্বা ফাইল মার্চ করে সোজা রাস্তার দিকে এগিয়ে আসছে। এখন যদি গাড়ি থামানো হয়, গাড়ির ভেতর কে আছে না আছে সব দেখতে পাবে সৈনিক-রা। কোনোরকম ইতস্তত না করে হাফ-ট্রাকের স্পীড আরও বাড়িয়ে দিল ও। শুরু হলো দুই যন্ত্রদানবের দৌড় প্রতিযো-গিতা।

আবার কাঁধ দু'টো উঁচু হয়ে গেল রাহাতের, এগিয়ে আসা গ্লাইডার আর রোডের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে। মনে মনে একটা হিসেব মিলিয়ে তারপর ঝুঁকিটা নিয়েছে ও। হাফ-ট্রাকের স্পীড জানা আছে, তার তুলনায় গ্লাইডারের গতি আন্দাজ করে নেয়া হয়েছে। কিন্তু এই দু'টোর সমান গুরুত্ব বহন করছে গ্লাইডারের অধঃপতনের তির্যক গতি। রোড এখানে হঠাৎ করে ঢালু হয়ে গেছে, ফলে হাফ-ট্রাকের কাছ থেকে আরেকটু বেশি স্পীড পাওয়া গেল। কিন্তু পিছনের বেঞ্চিতে যারা বসে আছে তাদের মনে হলো ঢাল বেয়ে এই স্পীডে নেমে যাওয়া সাংঘাতিক বিপজ্জনক, যে-কোনো মুহূর্তে উল্টে যেতে পারে গাড়ি। ক্যাটারপিলারের কর্কশ আওয়াজ আর তীব্র একনাগাড় ঝাঁকি অসহ্য লাগলো। যত কাছে এগিয়ে এল সবুজ মাঠের ওপর আকারে আরও বড় হয়ে উঠলো গ্লাইডার। সেই সাথে বিপজ্জনকভাবে নিচে নেমে এল। মেজরের মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ভাবলো ম্যালোরি। গ্লাইডার পৌঁছুবার আগেই রাস্তার নির্দিষ্ট পয়েন্ট পেরিয়ে যেতে চাইছেন উনি। সেটা যে সম্ভব নয় বুঝতে পারছেন না।

সম্ভব নয়! রাহাতও কথাটা ভাবছে। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে, এখন আর স্পীড কমানো সম্ভব নয়। উড়ন্ত দানবটা

এত কাছে চলে এসেছে, এখন স্পীড কমালে ওটার লেজের সাথে বাড়ি খাবে গাড়ি। শেষ চেষ্টা, স্পীড আরও একটু বাড়ানো।

সামনের রাস্তা আরও খাড়াভাবে নেমে গেছে। একটু নিচের দিকে চেপে দিল রাহাত অ্যাক্সিলারেটর পেডাল। মনে মনে আল্লা-খোদা করছে ও। কোথাও শোনা একটা কথা হঠাৎ করে মনে পড়ে গেল—ক্যাটারপিলার ট্র্যাক লাগানো গাড়ি খুব স্পীডে চালালে ছিঁড়ে যেতে পারে ওটা। এই স্পীডে যদি তা-ই ঘটে, বাঁচার আশা না করাই ভাল।

গায়ের কোট খুলে ফেলেছে গ্রীণ। এক হাতে ম্যালোরির কাঁধ, অপর হাতে গাড়ির কিনারা খামচে ধরে আছে সে। আরও নিচে নেমে এল গ্লাইডার, মালভূমির মাটি থেকে এখন খুব বেশি হলে দশ ফিট ওপরে সেটা। আর রাস্তা থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে। রাহাতের ধমক খেয়ে গাড়ির মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে আছে পাপাগোপালা, মারমুখো ভঙ্গিতে রাইফেল তাক করে আছে পিছনের রাস্তায়। ঘাড় ফিরিয়ে গাড়ির সামনে তাকালো একবার, চোখের সামনে প্রকাণ্ড গোথা গ্লাইডারটাকে ঝুলতে দেখে বিস্ফারিত হয়ে উঠলো চোখ জোড়া। নিজের অজান্তে বন্ধ হয়ে গেল চোখের পাতা। ম্যালোরি আর গ্রীণও চোখ বুজে আছে। অবধারিত সংঘর্ষের জন্যে শক্ত হয়ে উঠলো ওদের পেশী। গ্লাইডারের ডানা হাফ-ট্রাকের মাথার ওপর দিয়ে সরে গেল, রাস্তা পেরিয়ে অল্প একটু দূরে ল্যাণ্ড করলো সেটা।

তিনজন প্রায় একই সাথে চোখ মেললো আবার। গাড়ির সামনে গ্লাইডার দেখলো না কেউ, সবার চোখ পড়লো ভারতীয়

মেজরের চওড়া পিঠের ওপর। এখন আর তাঁর কাঁধ দু'টো উঁচু হয়ে নেই। এরই মধ্যে গাড়ির স্পীড কমিয়ে নিরাপদ মাত্রায় নামিয়ে নিয়ে এসেছে ও। ঠোঁটে আড়ষ্ট একটু হাসি নিয়ে পিছন দিকে মুহূর্তের জন্যে একবার তাকালো, আরোহীদের কাছ থেকে অপ্রীতিকর কিছু মন্তব্য শোনার জন্যে যেন তৈরি হয়ে আছে। কিন্তু আতংক আর বিস্ময়ের ঘোর এখনও ওরা কাটিয়ে উঠতে পারেনি, কাজেই টক-ঝাল বৃষ্টিপাত থেকে এ-যাত্রা রেহাই পেয়ে গেল ও। বেশ খানিকটা দূরে, রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা ট্র্যান্সপোর্ট প্লেন। সেটার ফিউজিলাজ থেকে ফিল্ড-গানের মতো কি যেন বেরিয়ে আসছে দেখে বিড়বিড় করে অভিশাপ দিল ও।

'গ্রীণ, কেমন আছো?'

'বেঁচে আছি, স্যার।' কৌতুক করার সুযোগটা ছাড়লো না স্টাফ-সার্জেন্ট। 'ফের অ্যাটেনশন?'

হাসি চাপলো রাহাত।

এবার যত্ন আর সময় নিয়ে গ্রীণের কাঁধে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে ম্যালোরি, বললো, 'রক্ত খুব সামান্যই গেছে, স্যার। শুকোবার সময় একটু হয়তো ব্যথা করবে, তাছাড়া সব ঠিক আছে।'

'শুকোবার সময় যদি জার্মানরা দেয়!'

'সামনে একটা প্লেন,' বললো রাহাত। 'ভেতর থেকে ওটা কি বেরিয়ে আসছে, বলতে পারবে, গ্রীণ?'

'সামনে নয়, ডান দিকে ওটা আমি একটা হাফ-ট্রাক দেখতে পাচ্ছি, এই মাত্র যে গ্লাইডারটা আমাদের আয়ু বাড়িয়ে দিয়ে গেল সেটার নাক থেকে বেরিয়ে আসছে,' বললো ম্যালোরি।

'আরও একটু সামনে গেলে বলতে পারবো,' রাহাতের প্রশ্নের উত্তরে জানালো গ্রীণ, তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'আমরা কি ইতিমধ্যে ওদের ভিড় থেকে বাইরে চলে আসতে পেরেছি ?'

গ্রীণের প্রশ্নের মধ্যে উদ্বেগের স্থর অনুভব করলো রাহাত। 'প্লেনটা ছাড়া আর তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। কেন বলো তো ?'

'এ পর্যন্ত ভাগ্য আমাদের সহায়তা করেছে, কিন্তু ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের কথা ভেবে দুশ্চিন্তা হচ্ছে আমার। খচ্চর-বাহিনীর ওরা যারা মালভূমির ওপর উঠে এসেছে তারা যদি কোনো মেসেজ পাঠিয়ে সতর্ক করে দিয়ে থাকে, সামনে কোথাও হয়তো আমাদের জন্যে একটা রিসেপশন কমিটি অপেক্ষা করছে।'

নয়

'ভাগ্যের সহায়তা আমরা পাবো না তো পাবে কে ? ব্রিজেল-বার্ডের দু'টো সেটই নষ্ট করে দিয়েছি আমি। একটা একেবারেই গেছে, আরেকটার টিউনিং কয়েল মেরামত না হয়ে থাকলে মেসেজ পাঠাবার জন্যে এদের কাছ থেকে আরেকটা সেট ধার করতে হবে তার।' এক সেকেণ্ড থেমে আবার বললো রাহাত, 'এবার ভাল করে দেখে নাও, গ্রীণ।'

ক্যাটারপিলার ট্র্যাক ছ'টোকে একটু বিশ্রাম দেবার জন্যে স্পীড কমিয়ে ঘণ্টায় বিশ মাইলে নামিয়ে নিয়ে এসেছিল রাহাত, এখন আবার গতি বাড়াতে শুরু করলো। রাস্তা থেকে প্রায় শ'-খানেক গজ দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্লেনটা, ওটার ওপাশে আরেক-টা এয়ারক্রাফট লুকিয়ে রয়েছে। প্লেনটার পাশে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা ফিল্ড-পীস দেখা গেল। প্লেনটাকে পাশ কাটিয়ে ছুটলো হাফ-ট্রাক, গাড়ি থেকে বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়ে ভাল করে দেখে নিল গ্রীণ। প্লেন এবং ফিল্ড-পীস দ্রুত পিছিয়ে যাচ্ছে, এই সময় মুখ খুললো সে।

'ওগুলো সেভেনটি এম এম মাউন্টেন গান—ওরা যেখানে যাচ্ছে ঠিক এই জিনিসই দরকার হবে। গোটা কয়েক এইট্টি এম এম মর্টারও দেখলাম।'

'হাফ-ট্রাকগুলো কি মাউন্টেন গান বয়ে নিয়ে যেতে পারবে?' জানতে চাইলো ম্যালোরি।

'অনায়াসে। সেই সাথে সৈনিকদেরও বয়ে নিয়ে যাবে। চমৎকার আয়োজন, যাই বলুন!'

'তাহলে ব্রিজেলবার্ডকে পাঠাবার কি দরকার ছিল?' জিজ্ঞেস করলো ম্যালোরি।

'প্রয়োজন ছিল না মানে?' ম্যালোরি থামতেই সামনের সীট থেকে বললো রাহাত। 'অন্তত মালভূমির ওপর আবহাওয়া পরিষ্কার না পেলে এই রিইনফোর্সমেন্ট ল্যাণ্ডই করতে পারতো না। সেক্ষেত্রে যা কিছু সব ব্রিজেলবার্ডকে একাই করতে হতো। তাছাড়া, কাটায়রায় ছত্রীসেনা নামাতে না পারলে পেনিনসূলা-টাকে সীল অফ করা সম্ভব হতো না।'

'আরও একটা কারণ আছে,' বললো গ্রীণ। 'গ্লাইডার বা ট্র্যান্সপোর্ট প্লেন যতোই ভার বয়ে নিয়ে আসুক, তারও একটা লিমিট আছে। ভারি জিনিস, এই যেমন মাউন্টেন গান, হাফ-ট্রাক, এগুলো, অথবা মানুষ নিয়ে আসা যায়—কিন্তু একসাথে দু'টো নিয়ে আসা সম্ভব নয়। তাই ব্রিজেলবার্ড নিয়ে এসেছে মানুষ, প্লেনগুলো নিয়ে এসেছে ভারি মেশিনারি। দু'টো মিলিয়ে চমৎকার একটা সুসজ্জিত বাহিনী তৈরি হয়ে গেল।'

'চমৎকার শব্দটা এবার নিয়ে দু'বার উচ্চারণ করলে তুমি,' হাফ-ট্রাকের মেঝে থেকে ঝাঁঝের সাথে বললো পাপাগোপালা। 'কিন্তু আমি তো ··'

ফিক্ করে হেসে ফেলে গ্রীণ বললো, 'জাস্ট এ প্রফেশন্যাল অবজার্ভেশন, মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড!'

অন্য একটা প্রসঙ্গ টানলো রাহাত। 'বললে কেউ বিশ্বাস করবে?—প্রচণ্ড ক্ষিদে পেয়েছে আমার!'

'গ্রীণ?' কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সাথে উচ্চারণ করলো ম্যালোরি।

'অ্যাট ইওর সার্ভিস, স্যার!' বলে খুলে রাখা কোটের পকেট থেকে ছোট একটা কাগজে মোড়া প্যাকেট বের করলো সে, রাহাতের কাঁধের ওপর দিয়ে বাড়িয়ে দিল সেটা।

'পানি, খাবার এসব ব্যাপারে টনটনে জ্ঞান থাকে ওর·

ম্যালোরিকে থামিয়ে দিয়ে সামনে থেকে রাহাত বললো, 'ও খুব সংসারী লোক হবে। যুদ্ধের পর দেরি করা উচিত হবে না, দেখে-শুনে ভাল একটা মেয়ের সাথে···'

'আবার?' আঁতকে উঠলো গ্রীণ।

'হোয়াট! এত অল্প বয়স তোমার, এরই মধ্যে ··?'

'আপনার দোয়ায় তিন ছেলেমেয়ের বাপ আমি, স্যার!' একগাল হেসে বললো গ্রীণ।

'ওদেরকে বোধহয় আমরা পেছনে ফেলে এসেছি,' বললো রাহাত। 'সামনে তো আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। ওই প্লেন দু'টোই বোধহয় জার্ভোসের সবচেয়ে কাছাকাছি ল্যাণ্ড করেছে।' একটু বিরতি নিল রাহাত, কাগজের মোড়ক খুলে চারটে পাতায় মোড়া ভেড়ার মাংস বের করলো ও। একটা করে বিলি করলো সবাইকে। তারপর জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি, ম্যালোরি?'

'জ্বী-স্যার?'

'তোমার ছেলেমেয়ে ক'টা?'

'বিয়েতে আমার কোনো রুচি নেই, স্যার,' ম্লান সুরে বললো ম্যালোরি। 'আমি চিরকুমার থাকবো।'

'কেন, কোথাও ধাক্কা খেয়েছো নাকি?' প্রশ্নটা এল পাপা-গোপালার কাছ থেকে।

ম্যালোরি কোনো সাড়া-শব্দ করলো না আর। পরিবেশটা একটু ভারি হয়ে ওঠায় তাড়াতাড়ি জানতে চাইলো গ্রীণ, 'আপনি, স্যার?'

'আমার কেসটা বোধহয় ম্যালোরির মতোই,' বললো রাহাত। 'মেয়েমানুষে আমার কোনো আকর্ষণ নেই, এ-কথা বললে মিথ্যে বলা হবে। তবে বিয়েতে আমার ইচ্ছে নেই। আমিও চিরকুমার থাকবো বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তোমার ব্যাপারটা কি, গোপাল ঠাকুর?'

'সন্ন্যাসীদের সাথে থাকার সময় বিয়ের কথা ভাবতে মানা।'

'তারমানে,' মন্তব্য করলো রাহাত, 'আমাদের যা হয় হোক,

গ্রীণের বেঁচে থাকাটা একান্ত জরুরী।'

মালভূমির ওপর দিয়ে এখনও একটা সরল রেখার মতো এগিয়ে যাচ্ছে রোডটা। পাহাড়ের আরও অনেক কাছে চলে এসেছে ওরা, কিন্তু ওদের এগোবার সাথে সামঞ্জস্য রেখে উঁচু এবং বড় হচ্ছে না সেটা। পুব আকাশ থেকে ভারি মেঘের বিশাল বিস্তৃতি নিচের ঢালগুলোর সামনে দিয়ে ভেসে যাচ্ছে, ফলে পাহাড়ের চূড়ার দিকটা ভিৎ এবং নিচের অংশের সাথে বিচ্ছিন্ন দেখাচ্ছে। মালভূমি থেকে উথালপাতাল ঈজিয়ান দেখা যাচ্ছে না, এদিকের আকাশে আরেক প্রস্থ কালো মেঘ গোটা সম-মালভূমিকে ঢেকে ফেলার তোড়জোর শুরু করে দিয়েছে। পাহাড়ের দিকে উঠে যাবার আগে রাস্তাটা ক্রমশ ওপর দিকে উঁচু হয়ে গেছে। শীতের কামড় আরও বেশি করে অনুভব করলো রাহাত, সেই সাথে বাতাসের বেগও আগের চেয়ে বেড়েছে বলে মনে হলো। আবহাওয়া যে খারাপের দিকে যাচ্ছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মনে একটু ভয় ধরে গেল। ফটোগ্রাফিক মেমোরির অধিকারী সে, সামনের রাস্তার অবস্থা পরিষ্কার স্মরণ করতে পারলো। কোথাও কোথাও পাহাড়ের গা পেঁচিয়ে রাস্তাটা এমন বিপজ্জনক ভাবে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে, এক চুল এদিক-ওদিক হলেই কিনারা থেকে কয়েকশো ফিট নিচের খাদে পড়ে মরতে হবে। এই রকম রাস্তা দিয়ে মানুষ চলাই যেখানে দায়, সেখানে হাফ-ট্রাক নিয়ে এগোনো রীতিমত পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়।

'পেট্রলের কি অবস্থা, স্যার?' জানতে চাইলো ম্যালোরি।

'ট্যাংক ভরা ছিল, একশো লিটার। কাজেই সমস্যা হবে বলে

মনে হয় না।'

'কিন্তু সমস্যা হবে আবহাওয়াকে নিয়ে।'

'গোপালা, তোমার কি মনে হয়?' জিজ্ঞেস করলো রাহাত। 'আবহাওয়া বার্তাটা তুমিই আমাদের পড়ে শোনাও দেখি।'

এই খানিক আগেও জেগে ছিল পাপাগোপালা, কিন্তু ম্যালোরি আবিষ্কার করলো, সে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। না হেসে পারলো না সে। কিছুক্ষণ আগে বেঞ্চের তলা থেকে পাওয়া ক্লাইম্বিং রোপের একটা কয়েল আগ্রহের সাথে পরীক্ষা করছিল পাপাগোপালা, সেটার ওপরই মাথা রেখে শুয়ে আছে সে। মাথার কাছে পড়ে আছে একটা জার্মান আর্মি ব্যাগ। ক্যাটারপিলারের কর্কশ ঘড় ঘড় আওয়াজ আর এই ঝাঁকির মধ্যে কিভাবে ঘুম আসে, ভেবে পেল না ম্যালোরি। 'আপনার গোপাল ঠাকুর ঘুমাচ্ছে, স্যার।'

'জাগাও ওকে,' হুকুম করলো রাহাত।

উঠে বসে চোখ রগড়াতে শুরু করলো পাপাগোপালা। ম্যালোরির প্রশ্ন শুনে চোখ থেকে হাত নামিয়ে মালভূমির ওপর দিয়ে দূরে তাকালো। বাঁ হাত তুলে গোঁফের একটা প্রান্ত ধরে কিছুক্ষণ পাকালো সেটা, তারপর চোয়ালে হাত বুলাতে শুরু করলো। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো গাড়ির সামনের দিকে। মেঘে মেঘে ঢাকা পড়ে আছে পাহাড়, মাঝে মধ্যে চূড়া বা মাঝখানের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো সে। বললো, 'খারাপ। খুব খারাপ। ঘন্টাখানেকের মধ্যে হেভি তুষার পড়বে।'

'কি দেখে বলছো কথাটা?' সামনে থেকে জানতে চাইলো রাহাত।

‘পুবদিকটা। দেখছেন না, মেঘগুলো কত নিচে? পোয়াতী গাভীর মতো লাগছে না দেখতে? ওই মেঘের পেটে ঠাসা আছে তুষার···’

‘মেঘকে পোয়াতী গাভীর সাথে তুলনা করতে এই প্রথম শুনলাম,’ পাপাগোপালার ভবিষ্যদ্বাণী হালকা করার জন্যে হেসে উঠে বললো ম্যালোরি। কিন্তু পাপাগোপালাকে বরং আরও সিরিয়াস দেখালো।

‘মালভূমি থেকে এখন আর সাগর দেখা যাচ্ছে না, এটা আরেকটা লক্ষণ। পাহাড়ের মাথাটাও ঢাকা পড়ে গেছে, আরেকটা লক্ষণ। যত ওপরে উঠবো, পরিস্থিতি ততোই খারাপের দিকে মোড় নেবে। হেভি তুষার, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা···’

‘ধন্যবাদ,’ পাপাগোপালার গম্ভীর সুর নকল করে বললো ম্যালোরি। ‘তোমাকে বরখাস্ত করা হলো! এবার বি.বি.সি.-র আরেকজন আবহাওয়া বিশেষজ্ঞকে অনুরোধ করবো আমরা···’

‘জিজ্ঞেস করেছো, বললাম।’ কাঁধ ঝাঁকালো পাপাগোপালা। ‘পাহাড়ে ধসও নামতে পারে। রাস্তার ওপর বরফ থাকবে···’

‘এবং সেই সাথে সাগর উঠে এসে ঘিরে ধরবে আমাদের, কাজেই আমাদের উচিত হবে নোয়ার মতো একটা নৌকো যোগাড় করা, যাতে···যত্তোসব! তোমার হলোটা কি, পাপাগোপালা? তোমার কাছ থেকে আমরা আবহাওয়ার খবর জানতে চেয়েছি, কেয়ামতের নয়।’

‘ওকে ক্ষেপিয়ে লাভ নেই,’ সামনে থেকে চিন্তিতভাবে বললো রাহাত। রাস্তার ওপর বরফ থাকবে, এটা ওকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। বছর কয়েক আগে দেখা জার্ভোসে ওঠার রাস্তায় বরফ

ছিল না, গাড়ি যাবে কিনা সন্দেহ হয়েছিল তখনই। সেবার নিচে দিয়ে ভেসে যাওয়া মেঘের আড়ালে শুধু মালভূমিটাই ঢাকা পড়েছিল।

'আমাদের অসুবিধে হলে জার্মানদেরও অসুবিধে হবে...'

গ্রীণের কথাটা শুনলো রাহাত, কিন্তু খুশি হবার মতো কিছু পেল না। কারণ, দুর্গম পথটা আগে পেরোতে হবে ওকেই, জার্মানদেরকে নয়। পুরানো প্রবাদটা মনে পড়ে গেল, আগে গেলে বাঘে খায়।

'কথায় বলে, বিপদ কখনও একা আসে না।' এইটুকু বলে চুপ করে গেল ম্যালোরি। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে ফেলে আসা পিছনের রাস্তায় তাকালো গ্রীণ আর পাপাগোপালা।

'কি ব্যাপার, ম্যালোরি?' সামনে চোখ রেখে জানতে চাইলো রাহাত। 'আরও হাফ-ট্রাক নামতে দেখেছি আমরা। সেগুলোর একটা আসছে নাকি? এত তাড়াতাড়ি?'

'জ্বী।'

'মাই গড!'

'মুলারও থাকতে পারে ওটায়। দেখতে পাচ্ছি না, কারণ গাড়িটা এখনও অনেক পেছনে...'

'ক'জন?' গাড়ির স্পীড আরও বাড়িয়ে দিল রাহাত।

'তিন কি চার। ঠিক করে বলা কঠিন। সমতল জায়গায় রয়েছে, কিন্তু চড়াই বেয়ে উঠতে শুরু করলে স্পীড কমাতে বাধ্য হবে ওরা...'

একটা ঢালের মাথায় উঠছে গাড়ি। সামনে পাহাড়ের ভিৎ এখন আর খুব বেশি দূরে নয়, কিন্তু ঢাকা পড়ে আছে ঘন কুয়াশা

আর মেঘের আড়ালে। একটু পরই স্পীড কমিয়ে আনতে হবে রাহাতকে, অথচ পিছনের হাফ-ট্রাকের সামনে এখুনি কুয়াশা থাকবে না, কাজেই ফুল স্পীডে এগিয়ে এসে মাঝখানের ব্যবধান দ্রুত কমিয়ে আনবে মুলার। হয়তো ওদেরকে নাগালের মধ্যে পেয়ে যাবে। আর যাই হোক, এই আবহাওয়াকে বন্ধুত্বপূর্ণ বলা যায় না। ঢালের মাথায় উঠে এল গাড়ি। রাস্তাটা এখানে হঠাৎ বাঁক নিয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে একটা গভীর খাদে। খাদের দু'পাশে পাথুরে পাঁচিল, মাঝখান দিয়ে রাস্তা। খানিকদূর এগিয়ে আবার রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে। সেখানে বেশ অনেকগুলো গরুর গাড়ি দেখা গেল। গোটা রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

কি হয়েছে কে জানে, ষাঁড়গুলো মালিকদের কথা শুনছে না। হাতে ছড়ি নিয়ে ছুটোছুটি করছে গ্রাম্য লোকগুলো, কিন্তু কোনোরকম সুবিধে করতে পারছে না তারা। হতে পারে গাড়ির আওয়াজই ষাঁড়গুলোকে বিচলিত করে তুলেছে, আন্দাজ করলো রাহাত। গাড়িটাকে এগিয়ে আসতে দেখে আরও অস্থির হয়ে উঠলো তারা। জানে পিছনের হাফ-ট্রাক দ্রুত নাগালের মধ্যে চলে আসছে, তবু স্পীড না কমিয়ে পারলো না রাহাত। গরু আর গাড়িগুলোর সামনে এসে আর কোনো উপায় দেখলো না ও, ব্রেক করে গাড়ি থামাতে বাধ্য হলো। 'কিছু একটা করো, পাপাগোপালা।' হাঁক ছাড়লো ও। 'কুইক! বাঁকের একটু ওদিকে খেদিয়ে নিয়ে যেতে পারো কিনা দেখো, রাস্তার পাশে ওখানে ঘাস আছে।' পাপাগোপালা গাড়ি থেকে নেমে যাচ্ছে দেখে আবার বললো রাহাত, 'ওদেরকে বলবে, আমরা চলে গেলে আবার যেন রোডটা ব্লক করে রাখে।'

গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে মহা চেঁচামেচি শুরু করে দিল পাপাগোপালা। লাভের মধ্যে এই হলো, শিং তুলে তাকে গুঁতো মারতে এল একটা ষাঁড়, আর গাড়োয়ানের দল পাল্টা মহা চেঁচামেচি আরম্ভ করলো। লাফ দিয়ে পিছিয়ে নাগালের বাইরে চলে এল পাপাগোপালা, ক্ষেপে ওঠা ষাঁড়টা তাকে ছেড়ে হাফ-ট্রাককে নিয়ে পড়লো এবার। শিং বাঁকা করে ছুটে এল সে, দড়াম করে গুঁতো দিল গাড়ির গায়ে। বোধহয় খুব ব্যথা পেয়েই দ্রুত পিছিয়ে গেল সেটা, তারপর মাথা তুলে কটমট করে তাকিয়ে থাকলো গ্রীণের দিকে।

'দেখো বাপু, তিন তিনটে ছেলেমেয়ের বাপ ও...' গ্রীণের হয়ে ওকালতি শুরু করলো ম্যালোরি।

ওদিকে ভারি, কর্কশ গলায় গালিগালাজ শুরু করেছে পাপাগোপালা। গ্রাম্য লোকগুলোর চিৎকারে তার একটা কথাও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। এভাবে পনেরো সেকেণ্ড পেরিয়ে যাবার পর ধৈর্য হারিয়ে ফেললো রাহাত। সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ও, এক ঝটকায় পকেট থেকে ল্যুগারটা বের করে মানুষ আর গরুগুলোর মাথার ওপর দিয়ে ফাঁকা গুলি করলো একটা। কাজ হলো যাদুমন্ত্রের মতো। গুলির আওয়াজ শুনে পড়িমরি করে পিছিয়ে গেল ষাঁড়গুলো, লোকগুলো তাদেরকে বাঁকের পাশে ঘাসের মধ্যে খেদিয়ে নামিয়ে নিয়ে গেল। গর্জে উঠলো হাফ-ট্রাক, বাঁক নিয়ে ছুটে চললো আবার সামনের দিকে। লাফ দিয়ে চলন্ত গাড়িতে উঠে পড়লো পাপাগোপালা।

'জার্মানদের কথা বলেছি ওদেরকে,' জানালো সে। 'ওরা কথা দিয়েছে, রোড আবার ব্লক করে রাখবে।'

রাখবে না।—ভাবলো রাহাত। জার্মানদের কথা বলা উচিত হয়নি গ্রামের সহজ-সরল লোকগুলোকে। পিছনের হাফ-ট্রাক ওদেরকে পাশ কাটিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত রাস্তার ওপর আসবেই না ওরা। তারমানে, গাড়ি দু'টোর মাঝখানের দূরত্ব বাড়াতে হলে কিছু একটা ওর নিজেকেই করতে হবে। খাদ থেকে উঠে আবার সমতল জায়গার ওপর দিয়ে এগিয়েছে রাস্তা। রাস্তার দু'পাশে মাটির নিচু পাঁচিল দেখা যাচ্ছে। খানিক পর উতরাই বেয়ে আবার নামতে শুরু করলো গাড়ি। আবার দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে থাকলো হাফ-ট্রাকের গতি। এদিক থেকে ওদিকে এলোমেলো ভাবে ভেসে যাচ্ছে কুয়াশা, দূরে মাঝে মধ্যে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের পাঁচিল, বিশাল দুর্গ-প্রাচীরের মতো উঁচু হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। স্পীডোমিটারের ওপর চোখ বুলালো রাহাত। ঘণ্টায় প্রায় পঞ্চাশ মাইল গতিতে ছুটছে হাফ-ট্রাক। মুহূর্ত কয়েকের জন্যে আবার কুয়াশা সরে যেতে অনেক নিচে পাথরের তৈরি ব্রিজটা দেখতে পেল ও। অনেক দিন আগে দেখা রাস্তার ছবিটা ভেসে উঠলো চোখের সামনে। ব্রিজের পরে রাস্তাটা ডান দিকে বাঁক নিয়েছে। তারপর বিপজ্জনক ভাবে উঠতে শুরু করেছে পাহাড় বেয়ে। ব্রিজের আগেও একটা বাঁক আছে, সেটা পেরোবার সময় স্পীড একেবারে কমিয়ে আনতে হবে, কারণ রাস্তাটা ওখানে সরু হয়ে গেছে এবং বাঁকটাও অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, প্রায় চুলের কাঁটার মতো। স্পীড কমাতে হবে, কাজেই সময়ের অপচয়টা পুষিয়ে নেবার জন্যে স্পীড আরও একটু বাড়িয়ে দিল রাহাত।

পিছনে ওরা তিনজনই শক্ত মুঠোয় বেঞ্চি অথবা গাড়ির কিনারা ধরে আছে, এই একনাগাড়ে ঝাঁকির মধ্যে একটু অন্য-

মনস্ক হলেই গাড়ি থেকে পড়ে যাবে ওরা। রাস্তার দু'পাশে মাটির পাঁচিল, ঘেরা জায়গায় ক্যাটারপিলার ট্র্যাকের ঘড়ঘড় আওয়াজ একটানা বিস্ফোরণের মতো শোনালো।

রাহাতের চোখের সামনে থেকে নিচের ব্রিজটাকে আড়াল করে রেখেছে কুয়াশা। খানিক পর আবার যখন ব্রিজটা দেখতে পেল ও, ছ্যাঁৎ করে উঠলো বুকের ভেতরটা। ব্রিজসহ ডানদিকে ঘুরে যাওয়া বাঁকটা দেখতে পেল ও, যতটা ভেবেছিল তারচেয়ে অনেক, অনেক সামনে—প্রতি মুহূর্তে ছুটে আরও সামনে চলে আসছে। দেরি করে ফেলেছে জেনেও শেষ রক্ষার জন্যে স্পীড কমাবার চেষ্টা করলো রাহাত। কিন্তু মনে কোনো সন্দেহ নেই, বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে ব্রিজে ওঠার সময় গাড়ির গতি এত বেশি থাকবে যে আবার ডানদিকে বাঁক নিতে গেলে নির্ঘাৎ উল্টেপড়বে বা সামনের পাথুরে পাঁচিলের গায়ে ধাক্কা খাবে। ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত দ্রুত স্পীড কমালো রাহাত। পিছনের আরোহীরা যে-যার বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। বেঞ্চির প্রান্ত ধরে ঝাঁকির সাথে ঠকঠক করে কাঁপছে পাপাগোপালা। ম্যালোরির গায়ে ঠেস দিয়ে আছে গ্রীণ, দু'হাত দিয়ে ধরে আছে গাড়ির কিনারা। আর ম্যালোরি তার দিকে পিছন ফিরে আঁকড়ে ধরেছে রাহাতের সীটের মাথা। মেজর রাহাতের ওপর ওদের যে অগাধ আস্থা জন্মেছে, কেউ কোনো প্রতিবাদ করলো না দেখে বোঝা গেল সেটা। কিন্তু রাহাতের মতো ওরা তিনজনও উপলব্ধি করলো, ব্রিজের পাঁচিল ভেঙে নিচের নদীতে পড়তে যাচ্ছে গাড়ি।

উভয় সংকটে পড়ে গেল রাহাত। ব্রেক করতেও দেরি হয়ে গেছে, স্পীড কমাতেও দেরি হয়ে গেছে। সমস্যাটা ছেড়ে দিল

তাৎক্ষণিক উপস্থিত বুদ্ধির ওপর। প্রথমে বাঁ দিকে, তারপর ডান দিকে, সবশেষে সোজাসুজি রাস্তার দিকে গাড়ির নাক তাক করলো ও। এই মুহূর্তে গতি তুমুল বলে, পিছনের ক্যাটারপিলার ট্র্যাক সাড়া দিতে একটু দেরি করলো। ঠিক সেটাই আশা করে-ছিল ও। বাঁ দিকের ট্র্যাক মাটির পাঁচিলের গায়ে প্রচণ্ড এক ঘষা খেলো। রাহাতের সীটের মাথা ছুটে গেল ম্যালোরির হাত থেকে, গাড়ির ভেতর দিকের দেয়ালে দুম করে ঠুকে গেল মাথাটা। মাটির সাথে ঘষা খেয়ে বাঁ দিকের ট্র্যাকটা ব্রেকের কাজ করলো। সেই সাথে ঘুরে গেল গাড়ির নাক। ট্র্যাকের ঘোরার সাথে ঝর্ণার পানির মতো ওপর দিকে উঠলো মাটি। শিলাবৃষ্টির মতো পড়তে লাগলো গাড়ির ছাতে। গাড়ি এখন ডান পাঁচিলের দিকে ছুটছে।

এবারের ঘষাটা আরও তীব্র, প্রায় মুখোমুখি সংঘর্ষের মতো। কয়েক মুহূর্ত মাটির ভেতর আটকে থাকলো ডান দিকের ক্যাটার-পিলার ট্র্যাক। নতুন একটা শব্দ পেল ওরা। মাটির নিচে পাথর, সেঁটে থেকে ঘুরছে ধাতব ট্র্যাক। এই সুযোগে স্পীড অনেক কমিয়ে আনতে পারলো রাহাত। ইতিমধ্যে তীব্র ঝাঁকির ফলে হাত থেকে দু'বার ছুটে গেছে হুইলটা। ডান দিকের ট্র্যাক মাটির ভেতর নাক সেধিয়ে দিয়ে ভয়ংকর ভাবে ঘুরছে, কিন্তু বেরিয়ে আসছে না। তারপর, কোনোরকম আভাস না দিয়ে হঠাৎ মুক্ত হয়ে সামনের দিকে লাফ দিল হাফ-ট্রাক। হুইলটা ঘুরিয়েই রেখেছিল রাহাত, মুক্ত হয়ে সোজাসুজি বাঁক নিতে শুরু করলো গাড়ি। শক্ত রোডের সাথে ধাতব চেইনের ঘষায় তীক্ষ্ণ আওয়াজ উঠলো। দ্রুত হুইল ঘুরিয়ে গাড়ি সোজা করে নিল রাহাত। সামনে ব্রিজ, তারপরই ডান দিকে ঘুরে যাওয়া বাঁক। গাড়ির

স্পীড অনেক কমে গেছে, কাজেই বিপদের ঝুঁকি এখন আর ততটা নেই। কিন্তু সেই মুহূর্তে বরফের খানিকটা চেহারা দেখতে পেয়ে আঁতকে উঠলো রাহাত।

দশ

ব্রিজের এদিকে, মাটির পাঁচিল খানিকটা ধসে গিয়ে নিচের খাদে পড়ে গেছে, সেখান থেকে শুরু হয়ে বরফের বিস্তৃতিটা ব্রিজের কিনারায় গিয়ে ঠেকেছে। স্পীড কমাবার কোনো তাগিদ অনুভব করলো না রাহাত, ভুলটা হলো সেখানেই। সামনের চাকা কোনো গোলমাল না করে উঠে এল ব্রিজের ওপর। কিন্তু পিছ-নের ক্যাটারপিলার ট্র্যাক রাহাতের সম্পূর্ণ আয়ত্তের বাইরে চলে গেল। বরফে উঠেই হড়কে গেল সেগুলো, চোখের পলকে ব্রিজের ওপর প্রায় আড়াআড়ি হয়ে গেল হাফ-ট্রাক। কিছু বুঝে ওঠার আগেই মাটির সাথে গাঁথা পাথরের পাঁচিলে ধাক্কা খেলো গাড়ির পিছনটা। সংঘর্ষের আওয়াজ, প্রচণ্ড ঝাঁকি, যন্ত্রণাকাতর গোঙা-নির শব্দ। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো পাঁচিল। বড় বড় বোল্ডার ছিটকে পড়লো নদীতে, কিন্তু বেশিরভাগ পড়লো রাস্তার ওপর। গাড়িটাকে সোজা করতে গিয়ে আবিষ্কার করলো রাহাত, ডান দিকের ট্র্যাক প্রায় সবটা ভাঙা পাঁচিল পেরিয়ে নদীর ওপর ঝুঁল-ছে। ইচ্ছে হলো, গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে প্রাণ বাঁচায়। কিন্তু

ঝোঁকটা কাটিয়ে উঠে ডান পা-টা নিচের দিকে চেপে দিল ও। ফল হলো উল্টো। হঠাৎ একটা লাফ দিয়ে সামনে বাড়তে চাইলো হাফ-ট্রাক, তাতে পাঁচিলের এবড়োখেবড়ো কিনারার সাথে পিছনের ট্র্যাক ধাক্কা খেলো আবার, সাথে সাথে পাঁচিলের আরও খানিকটা অংশ হুড়মুড় করে ধসে গেল। পরমুহূর্তে অনুভব করলো রাহাত, সামনের চাকা ব্রিজের মেঝে থেকে ওপরে উঠতে শুরু করেছে। তারমানে, নিচের নদীতে পড়তে যাচ্ছে গাড়ি।

শেষ মুহূর্তে ব্রেক করলো রাহাত। মুহূর্তের জন্যে গাড়ির সামনের চাকার উত্থান বন্ধ হলো বটে, কিন্তু তারপরই আবার উঠতে শুরু করলো। শেষ চেষ্টা, ব্রেক ছেড়ে দিয়ে ডান পা-টা আবার নিচের দিকে চেপে দিল ও। পাঁচিলটা দ্বিতীয়বার ভেঙে যাওয়ায় এখন আর পিছনের ট্র্যাককে বাধা দেবার জন্যে ব্রিজের ওপর ছড়ানো ছিটানো বোল্ডার ছাড়া কিছু নেই। গোঁ গোঁ কর্কশ আওয়াজ তুলে অলসভঙ্গিতে এগোলো হাফ-ট্রাক, সেই সাথে হুইল ঘুরিয়ে গাড়িটাকে সিধে করে নিতে চেষ্টা করলো রাহাত।

ব্রিজ পেরিয়ে এসে ডান দিকে বাঁক নিতে শুরু করে হঠাৎ ব্রেক চাপলো রাহাত, গাড়ি দাঁড় করিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো আরোহীদের দিকে।

কেউ তাকালো না ওর দিকে। সবাই যে যার ক্ষত থেকে রক্ত মুছতে ব্যস্ত। ম্যালোরি আর পাপাগোপালার কপাল কেটে গেছে। আলুর মতো ফুলে উঠেছে গ্রীণের ভুরুর কাছটা। জিভের ডগা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে ওর দিকে তাকালো পাপাগোপালা। 'ধন্যবাদ!' বিদ্রূপের সুরটা ঠিকই বাজলো রাহাতের কানে।

'দুঃখিত,' আর কিছু বলার মতো খুঁজে পেল না রাহাত।

'এখানে অপেক্ষা করে লাভ কি?' ব্যস্ত স্বরে বললো ম্যালোরি। 'ওরা যে-কোনো মুহূর্তে এসে পড়তে পারে।'

'লাভ হয়তো আছে···' ব্রিজের দিকে তাকিয়ে থেকে বললো রাহাত, খানিক ইতস্তত করলো, তারপর আবার বললো, 'দাঁড়াও, দেখতে দাও আমাকে।' ব্রিজের পাঁচিল প্রায় বিশ ফিট ভেঙে গেছে। পাঁচিল ছুঁয়ে এখনও ভেসে যাচ্ছে ঘন ধোঁয়ার মতো কুয়াশা। ব্রিজের মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বোল্ডার। হঠাৎ কেউ দেখলে মনে করবে, এখানে একটা খণ্ড-যুদ্ধ হয়ে গেছে। এবার উল্টো দিকে তাকালো রাহাত। বাঁক নিয়েই রাস্তাটা প্রায় সোজা আর খাড়াভাবে ওপর দিকে উঠে গেছে। কিন্তু বাঁকের বাঁ দিকে যে ঢালটা রয়েছে সেটা ততটা খাড়া নয়, আবার বেশ মসৃণ-ও। গজ পঞ্চাশেক ওপরে কিছু গাছ দেখা গেল, হাফ-ট্রাকটাকে আড়ালে লুকিয়ে রাখার জন্যে কাজে লাগতে পারে। ব্রিজের ওপর থেকে ঢালের মাথা, গাছ, গাছের আড়ালে লুকানো হাফ-ট্রাক, এসব কিছুই পরিষ্কার দেখতে পাবে না জার্মান সৈনিকরা। ধোঁয়াটে ভাব ওদিকেও কম নয়।

'মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে,' শান্ত স্বরে বললো রাহাত। 'এখানেই ওদেরকে আমরা বাধা দেবো। গাড়ি থেকে নেমে কাছেপিঠে কোথাও পজিশন নাও তোমরা।'

'কিন্তু স্যার···' বলে আর কোনো কথা খুঁজে পেল না গ্রীণ।

'গ্রীণ বোধহয় বলতে চাইছে, এখানে দেরি না করে এগিয়ে গেলে আমরা বোধহয় জার্মানদের চেয়ে অনেক আগে থাকতে পারবো,' বললো ম্যালোরি।

ঝট্ করে পিছন দিকে ফিরলো রাহাত। 'সামনের মাউন্টেন

রোড সম্পর্কে তোমাদের কোনো ধারণা নেই। এত সরু, এই হাফ-ট্রাকের হয়তো জায়গায়ই হবে না। আর যদি হয়ও, দু'-পাশে এক ইঞ্চি জায়গাও অবশিষ্ট থাকবে না। চুলের কাঁটার মতো বাঁক, যত এগিয়েছে রাস্তাটা, তারচেয়ে বেশি পিছিয়েছে —একদিকে খাড়া পাঁচিল, আরেকদিকে গভীর খাদ। আরও ওপর দিকে উঠে পাবো বরফ, রাস্তার গায়ে শক্ত পাথর হয়ে আছে। ছারপোকার মতো গুটি গুটি এগোতে হবে, বুঝলে?'

গ্রীণের বদলে রাহাতের সাথে তর্কে নামলো ম্যালোরি। 'তবু ওদের আগে থাকবো আমরা,' বললো সে। 'আর যদি অ্যামবুশ পাততেই হয়, এর চেয়ে ভাল স্পট দরকার আমাদের।'

'এর চেয়ে ভাল তুমি পাচ্ছো কোথায়?' শান্ত গলায় জানতে চাইলো রাহাত। ঘাড় সোজা করে নিয়ে বাঁ দিকের ঢালে নজর বুলালো ও। 'এখানে ফাঁদ পাতার অতিরিক্ত একটা সুবিধে হলো, ভাঙা পাঁচিল দেখে ওরা ধরে নেবে আমরা নদীতে পড়ে গেছি...'

হার মানতে রাজি নয় ম্যালোরি। বললো, 'না। নদীতে কিছু ভাসছে না দেখে ওরা বুঝতে পারবে আমরা ডুবিনি।'

'বুঝতে খানিকটা, দু'চার সেকেণ্ড হলেও, সময় নেবে ওরা। এই সময়টা কাজে লাগাতে চাই আমি।'

'হাফ-ট্রাকটা লুকাতে হবে আপনার। তা না হলে ফাঁদ পাতা না পাতা সমান কথা...'

'রাইট!' শেষ তিনটে চুরুটের একটা ধরালো রাহাত। 'আমি যেভাবে ভাবছি সেভাবে যদি ঘটে, যখন দেখেও বিশেষ কিছু করার উপায় থাকবে না, শুধু তখনই ওটাকে দেখতে পাবে

ওরা।' ঘন ঘন চুরুটে কয়েকটা টান দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লো ও, তারপর হাত তুলে ঢালের দিকটা দেখালো ওদেরকে। 'ওই গাছগুলোর আড়ালে থাকবো আমি। সময় হলে নিজেরাই বুঝতে পারবে, তার আগে গুলি করো না কেউ। আশা করি আমাদের চেয়ে লো স্পীডে ব্রিজের দিকে আসবে ওরা। বরফের সামনে এসে স্পীড আরও কমাবে। ভাঙা পাঁচিলটা দেখতে না পাবার কোনো কারণই নেই। তারপর রয়েছে ছড়ানো বোল্ডার, ব্রিজের ওপর উঠে এসে ভাঙা পাঁচিলের পাশে হাফ-ট্রাক ওদেরকে থামাতেই হবে। ঠিক তখন ওই গাছগুলোর আড়াল থেকে বেরিয়ে আসবো আমি। তোমরাও তখন যত খুশি গুলি ছুঁড়তে পারবে।'

'আপনি···আপনি ওই ঢালের মাথায় চড়তে চাইছেন?' নিখাদ বিস্ময় আর অবিশ্বাসের সুরে জানতে চাইলো ম্যালোরি। 'অসম্ভব! ঢালটা কিভাবে একদিকে কাত হয়ে আছে, দেখেছেন? কক্ষণও উঠতে পারবেন না! কাত হয়ে উল্টে যাবে গাড়ি···'

রাহাতের চেহারা থেকে শান্ত ভাবটা উবে গেল। রেগে গেছে ও। 'তোমার ভয়ের কিছু নেই, তুমি আমার সাথে থাকছো না! যা বলছি বুঝেই বলছি। এবার নামো সবাই, কুইক! পজিশন নেবার আগে ওরা পৌঁছে গেলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।'

কথা কাটাকাটির ফলে অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে, অনুভব করলো ম্যালোরি। তাছাড়া, ওর জন্যে অপেক্ষায় না থেকে গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে এরই মধ্যে পজিশন নেবার জন্যে জায়গা বাছাবাছি শুরু করেছে গ্রীণ আর পাপাগোপালা, কাজেই অনিচ্ছা-

সত্ত্বেও পরাজয় মেনে নিল সে। লাফ দিয়ে নেমে পড়লো রাস্তার ওপর। সাথে সাথে গাড়ি ছেড়ে দিল রাহাত।

যতোটা মনে করেছিল ঢালটা তারচেয়ে একটু বেশি খাড়া, তবে সারফেস একবার আঁকড়ে ধরার পর পিছনের ক্যাটারপিলার ট্র্যাক সহজেই হাফ-ট্রাককে ঠেলে ওপরে নিয়ে চললো। ব্রিজের ওপর ষাট ফিটের মতো উঠে পিছন ফিরে তাকালো রাহাত। কুয়াশা আগের চেয়ে ঘন হয়ে উঠেছে, অস্পষ্ট দেখালো ব্রিজটাকে।

হেডলাইট জ্বাললো রাহাত। কুয়াশায় প্রায় ঢাকা পড়েছিল, আলো জ্বালতে ঢালের মাথায় দেখা গেল গাছগুলোকে। স্পীড কমে এল হাফ-ট্রাকের। ঢালটা বাঁ দিকে কাত হয়ে আছে এখানে, সীটের ওপর বসে থাকতে অসুবিধে হতে লাগলো ওর, এক পাশে কাত হয়ে পড়লো শরীর। এখন যদি হড়কে বা পিছলে যায় পিছনের ট্র্যাক, ডিগবাজি খেতে খেতে সোজা নিচের খাদে গিয়ে পড়বে গাড়ি। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটলো না। ঢালের মাথায় উঠে এল রাহাত। দু'সারি গাছের ভেতর দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গাড়ি থামালো। চোখ তুলে নিচে ব্রিজের দিকে তাকাতেই মেজাজ হয়ে গেলো তেতো। কোথায় ব্রিজ! ঘন কুয়াশায় সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেছে সেটা।

ব্রিজটাকে পরিষ্কার দেখতে না পেলে ফাঁদের কোনো মানেই নেই। জার্মানরা যখন আসবে, তখনও যদি কুয়াশা সরে না যায়, কিছুই করার থাকবে না তার, যা করার ওদের তিনজনকেই করতে হবে। চুরুটটা ঠোঁট থেকে নামালো ও। শার্টের আস্তিন দিয়ে মুখ মুছলো। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে কে জানে!

প্রায় মিনিট চারেক পর আরেকটা ইঞ্জিনের আওয়াজ পেল রাহাত। আওয়াজ শুনে বুঝলো, জার্মানরা খুব সাবধানে, ধীর গতিতে আসছে। কিন্তু ব্রিজটা এখনও ঢাকা পড়ে আছে কুয়াশায়। এই রকম হবে জানলে ঢালের আরও নিচে কোথাও পজিশন নিত ও। কিন্তু এখন আর পজিশন বদলানো সম্ভব নয়। কাজেই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। ধীরে ধীরে হাফ ট্রাকের আওয়াজ বাড়ছে। হাত বাড়িয়ে ব্রেকটা ধরলো ও। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে নিচের দিকে। কুয়াশা কি একটু হালকা লাগছে আগের চেয়ে? বুঝতে পারলো না। ইঞ্জিনের আওয়াজ কমে যেতে যেতে একেবারে অস্পষ্ট লাগলো কানে। বুঝলো, ব্রিজের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে জার্মানদের হাফ-ট্রাক। হঠাৎ চমকে উঠে আবিষ্কার করলো ও, ওর নিজের গাড়ির হেডলাইট জ্বালা রয়েছে। হাত-ঝাপটা দিয়ে অফ করলো সুইচ। এ-ধরনের মারাত্মক ভুল করা উচিত হয়নি।

কি হচ্ছে নিচে? কুয়াশা কি সরবে না? ভাবতে না ভাবতেই বাতাসে ভর করে চোখের পলকে ব্রিজের সামনে থেকে সরে গেল কুয়াশা। ব্রিজের ওপর, ছড়ানো বোল্ডারগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে জার্মানদের হাফ-ট্রাক। ইতিমধ্যে গাড়ি ছেড়ে নেমে পড়েছে তিনজন জার্মান। তাদের মধ্যে একজনকে দেখে মুলার বলে সন্দেহ হলো ওর। ঠিক চিনতে পারলো না, তবে নড়াচড়ার ভাবভঙ্গি মুলারের সাথে মিলে যায়। ভাঙা পাঁচিলের পাশেই গাড়ি থামিয়েছে ওরা, ঠিক যেখানটায় আশা করেছিল ও। এইবার!

ব্রেক রিলিজ করে দিল রাহাত, চাপ দিল অ্যাক্সিলারেটরে।

ঢাল বেয়ে পিছু হটতে শুরু করলো গাড়ি। প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে গতি। নিচের ওরা যদি সাথে সাথে সতর্ক হয়ে ওঠে, ঠাণ্ডা রাখে মাথা, গুলি করার আগে শান্তভাবে লক্ষ্য স্থির করে, রাহাতকে এই মুহূর্তে খুন করা ওদের জন্যে কোনো সমস্যাই নয়। কিন্তু ওরা হতভম্ব হয়ে পড়বে, এই ভরসাতেই এত বড় ঝুঁকিটা নিয়েছে সে। কোথাও কিছু দেখতে পায়নি জার্মানরা, কোনো আওয়াজও পায়নি, হঠাৎ সেখানে ইঞ্জিনের আওয়াজ হলে অন্তত কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে ঘাবড়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। বিশেষ করে কুয়াশায় চারদিক ঢাকা পড়ে আছে, গাড়িটা কোন্‌দিক থেকে আসছে ঠাহর করা সহজ নয়। স্পীড বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে দাঁড়ালো, গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হয়ে উঠলো রাহাতের জন্যে। কোর্স একটু বদল করে নিচের হাফ-ট্রাকের গায়ে নিজের গাড়ির পিছনটা তাক করলো ও। দু'টো গাড়ির মাঝখানে ব্যবধান যখন আর মাত্র গজ দশেক, নিজেদের পজিশন থেকে গুলি করতে শুরু করলো ম্যালোরি, গ্রীণ আর পাপাগোপালা। সীটের ওপর বসে পিছন ফিরে আছে রাহাত, কঠিন মুঠোয় থর-থর করে কাঁপছে হুইল। জার্মানদের মধ্যে সবার আগে নড়ে উঠলো মুলার, হোলস্টার থেকে পিস্তল তুলে লক্ষ্য স্থির করলো, কিন্তু ওই পর্যন্তই। পাপাগোপালার অব্যর্থ বুলেট তার বুক আর পিঠ এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিল।

ব্রিজের ওপর একটা পাথরের আড়াল থেকে গুলি করছে ওরা। লেফটেন্যান্টকে পড়ে যেতে দেখে বাকি দু'জন জার্মান সৈনিক দাঁড়ানো হাফ-ট্রাকের আড়ালে বসে পড়ে গা ঢাকা দিল, কিংবা আহত হয়ে পড়ে গেল। পরমুহূর্তে দাঁড়ানো গাড়ির মাঝ-

খানে ঝাঁপিয়ে পড়লো রাহাতের হাফ-ট্রাক।

সংঘর্ষটা দেখতে পেল না রাহাত। ঠিক আগের মুহূর্তে ঘাড় সোজা করে নিয়ে ঝাঁকিটা সামলাবার জন্যে হুইলের ওপর বুক চেপে ধরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। তৈরি ছিল, তা না হলে মারাই যেত। ধাক্কাটা লাগার সাথে সাথে ব্রেক টেনে দিল ও। একটা ধাক্কাই যথেষ্ট, রাস্তা থেকে ছিটকে ভাঙা পাঁচিলের কিনারায় পৌঁছে গেল জার্মানদের হাফ-ট্রাক। কিনারা থেকে ঝুপ ঝুপ করে প্রথমে নদীতে পড়লো অ্যালপেনকরপ্স্ সৈনিক দু'জন, এক সেকেণ্ড পর তাদেরকে অনুসরণ করলো হাফ-ট্রাকটা। লাফ দিয়ে ব্রিজের কাছাকাছি উঠে এল পানি। ভয়ে ভয়ে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে রাহাত দেখলো, ভাঙা ব্রিজের কিনারায় ওর নিজের গাড়িও পৌঁছে গেছে, তবে কিনারা ছাড়িয়ে বিপদ-সীমা পেরোয়নি। গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ালো ম্যালোরি।

'স্যার?'

'ঠিকই আছি। এক মিনিট সরে থাকো!' প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে শরীরের ভেতর সব যেন নড়ে গেছে রাহাতের। কোথাও মারাত্মক কোনো জখম হয়নি, কিন্তু সারাশরীরে একটা ঝিমঝিমে ভাব। চিন্তা-শক্তিও যেন দুর্বল হয়ে পড়েছে, পরিষ্কার ভাবে সব বুঝতে অস্বাভাবিক বেশি সময় লাগছে।

এরপর কিভাবে ধীরে ধীরে গাড়ি নিয়ে ব্রিজের ওপরের রাস্তা ধরে উঠে এসেছে রাহাত, বলতে পারবে না। অনেকটা ঘোরের মধ্যে ছিল ও। আবার সেই আগের জায়গায় এসে গাড়ি দাঁড় করিয়েছে। ম্যালোরি এবং পাপাগোপালা ওকে সাহায্য

করতে চেয়েছে, কিন্তু হাত নেড়ে তাদেরকে সরিয়ে দিয়ে নিজের চেষ্টাতেই নেমেছে গাড়ি থেকে। টলতে টলতে রাস্তার ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। তাকিয়েছে নদীর দিকে।

পানিতে এখনও দেখা যাচ্ছে হাফ-ট্রাকের ছাদ। হু'টো বোল্ডারের মাঝখানে আটকে গেছে সেটা। একটা বোল্ডার কাত হয়ে গিয়ে জায়গা ছেড়ে দিল, ভুস করে ডুবে গেল গাড়ি। কিছুক্ষণের জন্যে পানির ওপর ভেসে উঠলো একজন জার্মান সৈনিকের লাশ। স্রোতের মধ্যে পড়ে আবার ডুবে গেল সেটা, পানির নিচে দিয়ে ভেসে চললো গালফ অব জার্ভোসের দিকে। দ্বিতীয় লাশটা ভাসলো আরও এক মিনিট পরে। পানির নিচ দিয়ে এটাও অনুসরণ করলো প্রথমটাকে।

'হ্যাঁ, এখানে অপেক্ষা করে আর কোনো লাভ নেই,' মৃহু গলায় বললো রাহাত। 'আরেক দল হাজির হওয়ার আগেই কেটে পড়া দরকার। ব্রিজ আর নদীর দিকে পিছন ফিরলো ও। 'মনে কেউ দুঃখ নিও না। আমি হয়তো তোমাদের সাথে রূঢ় ব্যবহার করেছি!' বলে গাড়ির দিকে এগোলো ও।

ওরা তিনজন নিঃশব্দে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো। তারপর অনুসরণ করলো মেজর রাহাতকে।

এগারো

পাহাড়ের গায়ে সরু কার্নিশ, তার ওপর দিয়ে চলে গেছে রাস্তাটা। ওরা আবিষ্কার করলো, নির্ভুল ছিল মেজরের বর্ণনা। ডান দিকে পাহাড়ের খাড়া পাঁচিল, সেই অনেক উঁচু পর্যন্ত উঠে গেছে। বাঁ দিকে খাদ। কতটা গভীর, বোঝার কোনো উপায় নেই, কুয়াশায় ঢাকা পড়ে আছে নিচের দিকটা। বিধ্বস্ত ব্রিজ থেকে রওনা হবার পর পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেছে, কিন্তু এগিয়েছে সামান্যই। বিপজ্জনক রাস্তা, একটু এদিক-ওদিক হলেই দুর্ঘটনা ঘটবে, ঘন্টায় কয়েক মাইলের বেশি স্পীড তোলার সাহস হলো না রাহাতের। ব্রিজ থেকে রওনা হবার আগে মেজরকে অসুস্থ মনে করে ম্যালোরি একটা প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু যুক্তি দিয়ে সেটা বাতিল করেছে রাহাত। ম্যালোরি বলেছিল, 'স্যার, আপনার ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে, বরং আমাকে ড্রাইভ করতে দিন।'

'ইজি ফিল করছি না, এ-কথা ঠিক,' বলেছিল রাহাত। 'কিন্তু গাড়িটা চালাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি আমি, সেটা কাজে

লাগবে। এই হাফ ট্রাক আমার মনের কথা বুঝতে পারছে এখন, আমিও এর মন-মর্জি টের পাচ্ছি। তোমাদের কারও সাথে এর সখ্যতা হতে সময় লাগবে।'

পনেরো মিনিট আর কোনো কথা হয়নি।

'স্যার!' হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভাঙলো ম্যালোরি।

'জানি,' বললো রাহাত।

এতক্ষণ রাস্তার চেহারা ছিল ধূসর, ধুলো-মাখা। কিন্তু সামনে এখন চকচকে একটা ভাব লক্ষ্য করা গেল। পাহাড়-পাঁচিলের গোড়া থেকে খাদের কিনারা পর্যন্ত রাস্তার ওপর জমে আছে বরফের পুরু স্তর। ক্যাটারপিলার ট্র্যাক বরফ স্পর্শ করলে কি ঘটে, জানা হয়ে গেছে ওদের।

'যেতে পারবো বলে মনে হয়?' আশ্বস্ত হতে চাইলো গ্রীণ।

'এই স্পীডে দুর্ঘটনা ঘটার কোনো ভয় নেই,' বললো বটে, কিন্তু নিজেকে আশ্বস্ত করতে পারলো না রাহাত। প্রতি মুহূর্তে শীতের প্রকোপ বাড়ছে, অনুভব করলো ও। কারণ প্রতি মুহূর্তে আরও ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে ওরা। সামনের রাস্তা এখন খানিকটা দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে আছে। তবু ভাগ্যই বলতে হবে, এখন পর্যন্ত বাতাসের গতি বাড়েনি। ওদের নিচে একঘেয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে ঘুরে চলেছে ক্যাটারপিলার ট্র্যাক, একটু একটু করে বরফের দিকে এগোচ্ছে গাড়ি। আরও একটা অসুবিধে চোখে পড়লো ওর। এমন এক জায়গা থেকে শুরু হচ্ছে বরফ, রাস্তাটা যেখানে হঠাৎ করে আগের চেয়েও সরু হয়ে গেছে। গাড়ির দু'দিকে সব মিলিয়ে খুব বেশি হলে ফুট খানেক থাকবে জায়গা।

জায়গা এমনিতেই কম বলে সহজ হতে পারছে না রাহাত। জানে, এখন ভুল করার কোনো ক্ষমা নেই, তাই হুইলের ওপর ঝুঁকে সামনের রাস্তার প্রতিটি ইঞ্চি সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখছে সে। প্রতি মুহূর্তে ভয়, প্রতি মুহূর্তে টেনশন। বরফের ওপর উঠতে যাচ্ছে গাড়ি। সীটের ওপর দাঁড়িয়ে পড়লো রাহাত। বিপদের সামান্যতম লক্ষণও যদি দেখা যায়, সাবধান হবার চেষ্টা করবে। ভয় ক্যাটারপিলার ট্র্যাক দু'টোকে নিয়ে। শেষ রক্ষা ওগুলোই করতে পারে, আবার সর্বনাশও ওদেরই হাতে। একঘেয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ চাপা দিয়ে নতুন আরেকটা আওয়াজ শুরু হলো। কাঁচের মতো শব্দ করে বরফ ভাঙছে। ধীরে ধীরে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো ও। যাক, বরফে দাঁত বসাতে পারছে ট্র্যাক জোড়া। তবু বসলো না রাহাত। কেন যেন খুঁত খুঁত করছে মন। এক মিনিট পরই কারণটা বুঝলো ও। আসলে বরফের ভেতরে দাঁত বসাতে পারছে না ট্র্যাক। কয়েক ইঞ্চি পুরু বরফ, ভাঙছে শুধু ওপরের স্তর। ভেতরের পিচ্ছিল, কঠিন বরফের স্তর অটুট থাকছে। দাঁত বসাতে না পেরে হড়কে যাচ্ছে ট্র্যাক। এদিকে, সামনে এগিয়ে আসছে একটা বাঁক। সেই সাথে, এই প্রথম অনুভব করলো ও, বাতাসের গতি বাড়ছে। আর বাতাসের সাথে সূক্ষ্ম কণার মতো ভেসে আসছে তুষার।

'স্যার!' সাবধান করে দেবার সুরে বললো ম্যালোরি।

উত্তরে বললো রাহাত, 'তোমরা সবাই পেছনের বেঞ্চিতে সরে যাও। জাস্ট ইন কেস।'

'তাতে কোনো লাভ হবে বলে মনে করি না, স্যার,' বললো ম্যালোরি। 'আমরা যদি পড়তে শুরু করি, পেছন দিকেই পড়বো,

কাজেই ওদিক দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে যাবার সুযোগ হবে না।'

ঠিক, মনে মনে সায় দিল রাহাত। খাঁচার ভেতর আটকা পড়েছে ওরা। একপাশে পাহাড়, একপাশে খাদ, সামনে দরজা নেই, গাড়ি পিছু হটতে শুরু করলে বেরোবার উপায় কি? আরেকটা অসুবিধের কথা ম্যালোরি বোধহয় এখনও টের পায়নি। এই পরিস্থিতিতে ব্রেক করার উপায় নেই রাহাতের। থামার পর আবার গাড়ি ছাড়লে ক্যাটারপিলার ট্র্যাক বরফের ভেতর ডেবে গিয়ে অসহায়ভাবে ঘুরবে শুধু, ঠেলে গাড়িটাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে না। শুধু খাঁচার ভেতর বন্দী নয়, থামারও কোনো সুযোগ নেই ওদের। যাই ঘটুক না কেন, এগিয়ে যেতে হবে। অসম্ভব ধীর গতিতে বাঁকটা ঘুরলো রাহাত। প্রায় দাঁড়ানো অবস্থায় সামনে ঝুঁকে গাড়ি ড্রাইভ করতে গিয়ে পা আর পিঠের পেশী ব্যথায় টনটন করতে লাগলো। একসময় বসে পড়লো ও।

বেঞ্চির এক প্রান্তে বসেছে ম্যালোরি, তার পাশেই খাদ। গ্রীণ বসেছে মাঝখানে। তারপর পাপাগোপালা, তার পাশেই পাহাড়-পাঁচিল। তাকিয়েও আছে সে পাঁচিলের দিকে। ধীরে ধীরে সেটা ওর একেবারে ডান কাঁধের কাছে চলে আসছে। তারমানে, বুঝতে অসুবিধে হলো না, কার্ণিশটা ক্রমশ আরও সরু হয়ে আসছে। খাদের ধারে বসে দস্তানা পরা ম্যালোরির হাত দু'টো শক্ত ভাবে গাড়ির কিনারা ধরে আছে, ঝাঁকির সাথে গোটা শরীর কাঁপছে তার। অনেকক্ষণ থেকেই চোয়ালে কোনো সাড়া পাচ্ছে না সে, ঠাণ্ডায় অসাড় মতো হয়ে গেছে। রাস্তাটা যত ওপরে উঠছে ততোই খাদের দিকে সরে আসছে হাফ-ট্রাক, সেদিকে তাকাতে না চাইলেও বার বার নিজের অজান্তেই চোখ

পড়ছে তার। এই অবস্থায় প্রায়ই উঁচু-নিচু বরফের ওপর পড়ে কাত হয়ে যাচ্ছে গাড়ি, ভয়ে ছ্যাঁৎ করে উঠছে বুকের ভেতরটা। ভয় পেলেও, মাথাটা ঠাণ্ডা রাখতে পেরেছে সে। সারাক্ষণ একটাই দুশ্চিন্তা কুরে কুরে খাচ্ছে তাকে, আর কতক্ষণ টিকবেন মেজর রাহাত ? উৎকণ্ঠা সহ্য করারও তো একটা সীমা আছে ! যদি এমন হয়···নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়লেন ? চিন্তাটা দ্রুত মাথা থেকে বের দিল সে। তাকালো গ্রীণের দিকে। তার হাত দু'টো পড়ে আছে কোলের ওপর, মুঠোগুলো লোহার মতো শক্ত। মুখের চেহারা পাথর। আর পাপাগোপালা ঝুঁকে আছে সামনের দিকে, রাস্তাটা তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করছে, যেন নতুন আর কি বিপদে পড়তে যাচ্ছে তারা, আগে থাকতে দেখতে চায়। রাস্তা থেকে মনোযোগ সরাবার জন্যেই বেঞ্চের তলা থেকে লূপ তৈরি করা এক প্রস্থ রশি বের করলো ম্যালোরি। সেটা পরীক্ষা করতে গিয়ে আবিষ্কার করলো, রশির এক প্রান্তে একটা লোহার হুক লাগানো রয়েছে। এরপর জার্মান আর্মি ইস্যু ব্যাগটা খুললো সে। এটার ভেতর আরও ক্লাইম্বিং রোপের সাথে পিটন এবং হাতুড়ি রয়েছে। সব আবার বেঞ্চের তলায় রেখে দিয়ে সোজা হয়ে বসতে যাবে, এই সময় ভিজে মতো কি যেন পড়লো তার মুখে।

আরেকটা বাঁক নিতে শুরু করছে রাহাত, এই সময় শুরু হলো তুষারপাত। সেই সাথে হঠাৎ করে আরও বেড়ে গেল বাতাসের গতিবেগ। বাতাসের গায়ে ভর করে কার্ণিশের ওপর নেচে বেড়াতে শুরু করলো তুষার কণা, কোথাও কোথাও তারা সংখ্যায় এত বেশি যে কুয়াশার মতো ঝাপসা করে দিচ্ছে দৃষ্টিকে।

কিনারা আর পাঁচিল, এই দুই সীমার মধ্যে আটকা পড়েছে রাহাত। নড়াচড়ার জায়গা এতোই কম, দম বন্ধ হয়ে আসছে ওর। এতক্ষণ যে কার্ণিশের ওপর গাড়িটাকে রাখতে পেরেছে ও, সেটাই ভারি আশ্চর্য লাগছে। নিরেট বরফে হড়কে গিয়ে ক্যাটারপিলার ট্র্যাক পিছু হটতে শুরু করেনি, সেটা নিতান্তই ওদের ভাগ্যের গুণ। একমাত্র সুবিধে যেটা ভোগ করছিল, সেটাও কেড়ে নিল তুষারকণাগুলো। মাঝে মধ্যে দশ হাত সামনের রাস্তাও দেখতে পাচ্ছে না। হেডলাইট অন করলো ও। তুষার-ঝড়ের প্রকোপ ক্রমশ বাড়ছে অনুভব করে ভয়ে কাঁপুনি ধরে গেল বুকে। বাতাসের আর্তনাদ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। ওর পিছনের আরোহীদের উঁচু মাথা নিচু হয়ে গেছে, ঝড়ের ছোবল থেকে বাঁচবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে তারা। পাপাগোপালা শুধু মাথাই নিচু করেনি, হাত দিয়ে মুখটা ঢেকেও রেখেছে, আঙুলের ফাঁক দিয়ে পাঁচিলটাকে দেখছে সে। আরও, আরও কাছে সরে এসেছে সেটা। এখন যদি ওটার সাথে ধাক্কা খায় হাফ-ট্রাক, ছিটকে খাদের দিকে সরে যাবে। তারপর···আর ভাবতে সাহস হলো না তার।

গাড়িটাকে পাহাড়ের দিকে আরও কয়েক ইঞ্চি সরিয়ে নিয়ে এল রাহাত। এর মধ্যে ঝুঁকি আছে, তবে আরও বড় ঝুঁকি এড়াবার জন্যেই এই ব্যবস্থা। পাহাড়ের সাথে ঘষা বা বাড়ি খেলে সেটা সামলে নেবার তবু হয়তো একটা সুযোগ পাওয়া যাবে, কিন্তু গাড়ির চাকা বা ট্র্যাক যদি কিনারা ছাড়িয়ে খাদের দিকে সরে যায়, ভুলটা শুধরে নেবার কোনো সুযোগ পাওয়া যাবে না। রাস্তাটা এখানে আরও খাড়াভাবে উঠে গেছে, কাজেই

গাড়ি থামাবার চিন্তাটা এই নিয়ে পঁচিশ বারের মতো বাতিল করে দিল ও। রাস্তার ওপর নিরেট বরফ না থাকলে সেটা সম্ভব ছিল, তারপর ঝড় থামলে আবার ছাড়তো গাড়ি। কিন্তু তারপরই মনে পড়ে গেল, পিছু পিছু নিশ্চয়ই জার্মানরা আসছে। ঝড় থামার অপেক্ষায় কোথাও ঠাঁই নেয়া মানে ওদের ওপর শত্রুদেরকে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ করে দেয়া।

'আর কত দুর, পাপাগোপালা?' জানতে চাইলো রাহাত।

'চওড়া বাঁকের পর খুব বেশি নয়, এই এক কিলোমিটারের মতো।'

'কোথায় সেই বাঁক?'

'কাছেই।'

'এই ঝড়ের মধ্যে তুমি জানছো কিভাবে?'

'ওই ফাটল দেখে।'

ফাটল? ডান দিকে তাকালো রাহাত। নিশ্ছিদ্র পাহাড় পাঁচিলের গায়ে এই প্রথম একটা ফাঁক দেখলো ও। ফিট খানেক চওড়া, তিন ফিটের মতো লম্বা। তুষার দৃষ্টি ঝাপসা করে রাখলেও ফাঁকটা থেকে বেরিয়ে আসা পানির সরু ধারাটা দেখতে পেল ও। ফাটলটা থেকে বেরিয়ে প্রায় খাড়াভাবে নেমে আসছে পানি, মাঝপথে পৌঁছুবার আগেই বরফ হয়ে যাচ্ছে। সেটাকে পাশ কাটিয়ে এল গাড়ি। হ্যাঁ-বাবা, একেই বলে ঠাণ্ডা! চিন্তায় বাধা পড়লো সামনে আরও একটা বাঁক দেখে। বাঁক নিতে শুরু করলো ও, কিন্তু এর যেন শেষ নেই। পাহাড়ের গা পেঁচিয়ে ডান দিকে ধনুকের মতো বেঁকে গেছে রাস্তা, সোজা হবার লক্ষণ দেখা গেল না। মনে মনে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল রাহাত। অন্তত ঘন ঘন এঁকে-

বেঁকে চলার অসুবিধে থেকে রেহাই পাওয়া গেল। পাহাড়ের নিচের দিকে কম করেও গোটা পঞ্চাশেক চুলের কাঁটার মতো বাঁক নিতে হয়েছে ওকে। সে-সময় ওখানে যদি বরফ থাকতো, এখানে আর পৌঁছুতে হতো না ওদেরকে।

ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে গাড়ি। পাহাড় বেঁকে গেছে, সেই সাথে বেঁকে গেছে কার্ণিশ। হুইল ঘোরাবার কোনো প্রয়োজন পড়লো না। ডান দিক ঘোরানো আছে, তাই থাকলো। তবু পাঁচিলের গোড়া আর খাদের কিনারা থেকে মনোযোগ ফেরালো না রাহাত। এতোই মগ্ন হয়ে ছিল ও, খেয়ালই করেনি যে আবহাওয়া বদলে গেছে। তুষারপাত থামেনি, কিন্তু বাতাস শান্ত হয়ে এসেছে। এবার নিয়ে বোধহয় একশো বার হলো হাত দিয়ে উইণ্ডস্ক্রীনের তুষার সরালো ও। কিছুক্ষণ আগে দু'টো ওয়াই-পারই অকেজো হয়ে গেছে। উইণ্ডস্ক্রীনের অপর দিকের কাঁচ পরিষ্কার করার সময় সীট ছেড়ে বার বার দাঁড়াতে হলো ওকে। ঝড় থেমে যাওয়ায় তুষার কণা এখন প্রায় খাড়া ভাবে পড়ছে। দৃষ্টি সীমা অবশ্য আগের চেয়ে বেড়েছে। স্বস্তিবোধ ফিরে আসছে ধীরে ধীরে। পাপাগোপালা যদি ভুল না করে থাকে, নিরাপদ রাস্তা আর মাত্র এক কিলোমিটার দূরে। চিন্তাটা শেষ করতে পারেনি রাহাত, নতুন আরেকটা বিপদ দেখতে পেয়ে শক্ত হয়ে উঠলো পেশী। হাত দু'টো যেন শিউরে উঠে আরও শক্তভাবে চেপে ধরলো হুইলটাকে। বেশি দূরে নয়, পাহাড়-পাঁচিলের গায়ে একটা বোল্ডার হেলান দিয়ে রয়েছে। প্রায় গোল আকৃতির একটা পাথর, বেশ খানিকটা বরফে মোড়া। হেডলাইট যত এগোলো, ততোই বড় হতে লাগলো সেটা। এতক্ষণে বোঝা

গেল, খানিক আগে পেরিয়ে আসা নালার মতোই সামনেও ওখানে একটা নালা আছে। সেটা দিয়ে গড়িয়ে নেমে এসে, পাহাড়-পাঁচিলের ফাঁক গলে, কার্ণিশ পেরিয়ে কিনারা থেকে খাদে পড়ে যাবার কথা ছিল পাথরটার। কিন্তু পাহাড়-পাঁচিল ভেদ করার সময় নালাটা সরু হয়ে গেছে, সেই তুলনায় পাথরটা অনেক বড়, তাই ফাঁকের মুখে আটকে আছে সেটা। দ্রুত একটা আন্দাজ পাবার চেষ্টা করলো রাহাত। কার্ণিশের অনেকটা জায়গা দখল করে রেখেছে বোল্ডার, ওটাকে পাশ কাটিয়ে এগোতে হলে খাদের একেবারে কিনারায় পৌঁছে যাবে গাড়ি। কিংবা হয়তো কিনারা ছাড়িয়ে যাবে ক্যাটারপিলার ট্র্যাক।

'অসম্ভব, স্যার।' আর কিছু বলার শক্তি পেল না ম্যালোরি।

গাড়ির স্পীড ওঠা-নামা করলো না। পাথরটার দিকে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে শান্ত কিন্তু তাগাদার সুরে বললো রাহাত, 'ম্যালোরি, পিছনে সরে বসে ট্র্যাকের ওপর নজর রাখো—ট্র্যাক কিনারার বাইরে যায় কিনা দেখবে তুমি। যদি যায়, হাত নেড়ে সিগন্যাল দেবে গ্রীণকে। গ্রীণ, বাঁ কাঁধে টোকা দিয়ে আমাকে সাবধান করে দেবে।' পিছন থেকে পায়ের আওয়াজ পেল ও। তুষারে পা পড়ায় কে যেন পিছলে গেল, ধরাধরি করে তোলা হলো তাকে। নিজের ইচ্ছেতেই পাঁচিলের দিকের ট্র্যাকটার মতিগতি বোঝার জন্যে গাড়ির পিছনে চলে গেল পাপাগোপালা। স্পীড কমাতে শুরু করলো রাহাত। এক সময় ভয় হলো, গাড়ি বোধহয় নিজে থেকেই দাঁড়িয়ে পড়বে। প্রথম যতবড় দেখেছিল তারচেয়ে আকারে তিন গুণ বেড়েছে পাথরটা। প্রতি মুহূর্তে আরও বড় হচ্ছে। পাঁচিলের দিক থেকে গাড়ি সরিয়ে খাদের দিকে

নিয়ে আসছে রাহাত। বাঁ দিকের ট্র্যাক এরই মধ্যে পৌঁছে গেছে কিনারায়।

উইণ্ডস্ক্রীনের কাঁচ ঝাপসা হয়ে গেছে, বেশ কিছুক্ষণ পরিষ্কার করা হয়নি। হেডলাইটের আলো পড়ে পাঁচিলের গায়ে লেগে থাকা বরফ মুক্তোর মতো চোখ-ধাঁধানো দ্যুতি ছড়াচ্ছে। ইঞ্জিনের এক-ঘেয়ে ঘড়ঘড় শব্দ স্নায়ুর ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচারের মতো লাগলো। তুষারের অবিরাম পতন দিনটাকে প্রায় অন্ধকার করে রেখেছে। দস্তানা পরা হাতে কোনো সাড়া পেল না রাহাত। আন্দাজে যদি ভুল হয়ে থাকে? কথাটা মনে হতেই শিউরে উঠলো ও। চোখ পিট পিট করলো ও। ঠোঁট কামড়ে ব্যথা পেতে চাইলো। অস্থির হবার সময় নয় এটা, স্মরণ করিয়ে দিল নিজেকে। পাথরটা কয়েক গজের মধ্যে চলে এসেছে। ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোচ্ছে হাফ-ট্রাক। আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ওটাকে পাশ কাটাতে শুরু করবে তারা।

গাড়ির পিছন থেকে বাইরের দিকে ঝুঁকে ট্র্যাকের ওপর চোখ রাখছে ম্যালোরি। ইচ্ছে হলো মেজরকে অনুরোধ করে স্পীড বাড়িয়ে দ্রুত পেরিয়ে যায় জায়গাটা। কিন্তু ট্র্যাকটাকে কিনারা ছাড়িয়ে খাদের দিকে চলে যেতে দেখে এক নিমেষে শরীরের সব রক্ত যেন তার জমে বরফ হয়ে গেল। ট্র্যাক ঘুরছে, কিন্তু তার খানিকটা অংশ ঝুলছে খাদে। গ্রীণকে সিগন্যাল দিতে গিয়েও ক্ষান্ত হলো সে, আরও দু'এক সেকেণ্ড দেখতে চায়।

আরেক দিক থেকে বোল্ডারের ওপর চোখ রেখেছে পাপাগো-পালা। পাশ কাটাবার শুরুতেই হাফ-ট্রাকের ক্যাটারপিলার ট্র্যাক ক্ষুরের ভূমিকা পালন করলো—দাড়ি কামিয়ে দিল পাথ-

রের। বরফ সরে যাওয়ায় পাথরটার চেহারা আশ্চর্য রকম কদাকার হয়ে উঠলো।

গাড়ির পিছন থেকে খাদের ওপর ঝুলে আছে ম্যালোরি। ক্যাটারপিলার ট্র্যাকও কিনারা ছাড়িয়ে গেছে বেশ খানিকটা। প্রথমে বমি বমি ভাব হলো তার, কিন্তু পাত্তা দিল না। পরমুহূর্তে চক্কর দিয়ে উঠলো মাথা। হঠাৎ বুঝতে পারলো, জ্ঞান হারাচ্ছে সে। এই সময় অপর দিকের ক্যাটারপিলার ট্র্যাক পাশ কাটাতে গিয়ে ঘষা খেলো বোল্ডারের সাথে। ঝাঁকি খেলো ম্যালোরি, পা দু'টো ছিল তুষারের ওপর, পিছলে গেল। হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল সে, মাথাটা ঠুকে গেল বেঞ্চির ভোঁতা কোণার সাথে। গাড়ির কিনারা এক হাতে এখনও ধরে আছে, কিন্তু মুঠোর ভেতর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সেটা। পাপাগোপালা নিজের কাজে মগ্ন, গ্রীণ তাকিয়ে আছে রাহাতের মাথার ওপর দিয়ে সামনের রাস্তায়। পতনের কোনো শব্দ ওদের কানে পৌঁছায়নি।

ভেতর দিকের ট্র্যাক বোল্ডারের সাথে ঘষা লাগলো, সাথে সাথে বাঁ কাঁধে টোকা অনুভব করার জন্যে তৈরি হয়ে গেল রাহাত। তার ধারণা, বাইরের দিকের ট্র্যাকের ওপর নজর রাখছে ম্যালোরি। হাফ-ট্রাক অসম্ভব ঝাঁকি খেতে শুরু করলো, ট্র্যাক বোধহয় বোল্ডারের গা থেকে শক্ত পাথর ভেঙে নিয়ে এগোচ্ছে। একবার ইচ্ছে হলো পিছন দিকে তাকায়। কিন্তু চিন্তাটা সাথে সাথে বাতিল করে দিল ও। তার কাজ গাড়ি চালানো, তদারকি করা নয়। এই সময় কর্কশ আওয়াজের সাথে তীব্র একটা ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো হাফ-ট্রাক। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রাহাত যা দেখলো, আত্মারাম খাঁচা ছাড়া

হবার অবস্থা হলো ওর। খাদের দিকে ট্র্যাক কিনারা থেকে প্রায় অর্ধেকটা বেরিয়ে আছে শূন্যে। ঝট্ করে পিছনে তাকালো ও। মেঝের ওপর পড়ে আছে ম্যালোরি। ঢালু মেঝে থেকে ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে শরীরটা।

'আগে বাড়ুন!' গাড়ি পিছু হটতে শুরু করতেই রুদ্ধশ্বাসে আবেদন জানালো পাপাগোপালা।

'ম্যালোরি!' বলেই অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিল রাহাত। আবার সেই কর্কশ আওয়াজ, আবার সেই তীব্র ঝাঁকি, বোল্ডার-টা এবার হাফ-ট্র্যাককে ঠেকিয়ে রাখতে পারলো না। পাথরের পুরু একটা ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে চললো সামনের দিকে। পিছনে ওরা ব্যস্ত হয়ে উঠলো ম্যালোরিকে নিয়ে।

'সরো...উঠে বসতে দাও আমাকে...' বিড়বিড় করে বললো ম্যালোরি।

বোল্ডারটাকে পাশ কাটিয়ে এসে হুইল ঘোরাতে শুরু করলো রাহাত, খাদের দিক থেকে পাঁচিলের দিকে সরিয়ে নিয়ে এল গাড়ি। কিছুই ঘটেনি, কিন্তু ঘটতে পারতো, ভাবলো ও। ম্যালোরি অসুস্থ হয়ে পড়ায় বিপদটা না ঘটার কোনো কারণ ছিল না, তবু নিতান্ত ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছে ওরা।

'কেমন আছে ও?' পিছন দিকে না তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

ম্যালোরি নিজেই কথা বললো, 'আমি দুঃখিত, স্যার...'

'দুঃখ জিনিসটা বিশ্রামের সহায়ক নয়,' শান্ত সুরে বললো রাহাত। 'তাছাড়া, তুমি কোনো দোষ করোনি যে দুঃখ প্রকাশ করতে হবে। তোমাকে আমি ঘুমাতে বলতে পারি না, এই পরি-

স্থিতিতে তা সম্ভবও নয়। কিন্তু শরীরটা ঢিল করে দিয়ে মাথাটা খালি করে ফেলো—ঝেড়ে ফেলো সমস্ত উদ্বেগ। দেখবে, ভাল লাগছে।'

বেঞ্চের ওপর উঠে বসলো ম্যালোরি। চোখ বুজলো। 'ধন্য-বাদ, স্যার।'

'ভুলো না, তোমাকে আমাদের দরকার।'

এক মিনিট পর রাস্তাটা চওড়া হতে শুরু করলো। ডান দিকে আরও দূরে সরে গেল পাহাড়, বাঁ দিকে খাদের কিনারাও দূরে সরে যেতে যেতে এক সময় আর দেখাই গেল না। বাতাস আগেই নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল, এখন তুষারপাতও কমে আসতে শুরু করলো। শুধু সামনের রাস্তাটা আগের চেয়ে খাড়া হয়ে উঠছে। গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল রাহাত। এতক্ষণে মনে হলো, হ্যাঁ, এগোচ্ছে তারা।

'একটু পরই আশ্রম দেখতে পাবো,' রাহাতের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে পাপাগোপালা, কথাটা সেই বললো। 'এরপর নিচের দিকে নেমে গেছে রাস্তা। ওখানে বড় একটা পাথর আছে। তার-পরই।'

'বেঞ্চির ওপর পড়েছিলেন সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট, তবে রক্ত বেরোয়নি, শুধু ফুলে উঠেছে কপালটা,' রিপোর্ট করলো গ্রীণ।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালো রাহাত। কিভাবে যেন বুঝতে পেরে ম্যালোরিও চোখ মেললো। মৃদু হাসলো সে। 'আমি ঠিক আছি, স্যার। যে-কোনো কাজে লাগতে পারবো।'

'ধন্যবাদ!' খুশি দেখালো রাহাতকে। তাকালো পাপাগো-পালার দিকে। 'যতদুর মনে করতে পারি, রাস্তার ওপর পাথ-

রটা ঝুলে আছে, তাই না ?’

‘হ্যাঁ। ওটা পেরোলেই আশ্রম।’

কয়েক মুহূর্ত পর নিচের দিকে নামতে শুরু করলো গাড়ি। দক্ষিণ দিকটা ঢাকা পড়ে আছে বরফ-মোড়া ঢালের আড়ালে। দ্রুত বিশাল একটা খোলের ভেতর নেমে আসছে গাড়ি, চারদিকে উঁচু পাথুরে বর্ডার। বর্ডারের কার্ণিশে জমে থাকা তুষার বাতাসের সাথে উড়ে উড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। মাথার ওপর পরিষ্কার নীল আকাশ, রোদে কোনো উত্তাপ নেই। আগে কখনও এ ধরনের অনুর্বর, নিঃস্ব জায়গা দেখেনি রাহাত। চারদিকে আজব সাইজের পাথুরে বিস্তৃতি ছাড়া আর কিছু নেই। একটা বিদঘুটে আকৃতির বড় পাথরের দিকেই এই মুহূর্তে এগোচ্ছে হাফ-ট্রাক। পাথর না বলে ছোট পাহাড় বলাই ভাল। এই একটা পাথরই রাস্তা ছাড়িয়ে টাওয়ারের মতো মাথাচাড়া দিয়ে আছে।

‘কে ও ?’ বলেই পিছন থেকে রাহাতের কাঁধ খামচে ধরলো পাপাগোপালা।

‘কোথায় ?’ সাথে সাথে জানতে চাইলো রাহাত।

সামনের টাওয়ারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে পাপাগোপালা। ‘ওই পাথরের ওপর···এখন আর দেখতে পাচ্ছি না !’

দেরি হয়ে গেছে, পাথরটার দিকে তাকিয়ে রাহাতও কাউকে দেখতে পেল না। রাস্তার ওপর পাথরের ছায়া পড়েছে, এরই মধ্যে সেই ছায়ার ভেতর চলে এসেছে গাড়ি। স্পীড কমিয়ে ব্রেক করলো ও। নেমে পড়লো গাড়ি থেকে। পাপাগোপালা আগেই নেমেছে। ঘন ঘন মুঠো খুলে আর পাকিয়ে আঙুলে রক্ত চলাচল বাড়িয়ে নিচ্ছে রাহাত।

মাত্র কয়েক ফিট উঠেছে ওরা, এই সময় চোখ ইশারায় পাথরটার কাছে রাহাতকে ডেকে নিয়ে গেল পাপাগোপালা। 'আমি এদিক দিয়ে উঠছি, আপনি উল্টো দিকে পৌঁছে অপেক্ষা করুন,' ফিসফিস করে বললো সে। উত্তেজনায় চোখ দু'টো জ্বলজ্বল করছে তার। 'আমার পায়ের আওয়াজ পেয়ে আপনার দিকে নেমে যাবে ব্যাটা···ক্যাঁক করে ধরে ফেলবেন!'

সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকালো রাহাত। হাঁটু সমান বরফের ওপর দিয়ে রাস্তায় নেমে এল ও, গাড়িতে ওরা যারা রয়েছে তাদেরকে ইঙ্গিতে নড়াচড়া করতে নিষেধ করে পাথরের গা ঘেঁষে এগোলো উল্টোদিকে।

পাথরের পিছনটা আরও বেশি খাড়া, আরও শক্ত বরফে ঢাকা পড়ে আছে। নিচে অপেক্ষা না করে পঞ্চাশ ফিটের মতো উঠলো রাহাত, তারপর একটা বোল্ডার দেখতে পেয়ে সেটার আড়ালে গা-ঢাকা দিল। পকেট থেকে ল্যুগার বের করে বোল্ডা-রের গায়ে হেলান দিল ও। কান দু'টো সজাগ, কিন্তু তাকিয়ে আছে নয়ন-জুড়ানো অদ্ভুত একটা দৃশ্যের দিকে।

প্রথমেই চোখে পড়লো আশ্রম। আবহাওয়ার ঝামেলা স্পর্শ করতে পারে না মাউন্ট জার্ভোসকে, আরেক বার তার প্রমাণ পেল রাহাত। প্রথম দেখা স্মৃতির সাথে হুবহু মিলে গেল আশ্রম এবং আর চারদিকের দৃশ্য। বিশাল পাহাড়ের কাঁধ থেকে মস্ত একটা ঝুল-পাথর বেরিয়ে এসেছে, তার একটা প্রান্ত ঝুলে আছে সাগরের ওপর, আরেক প্রান্ত কয়েকশো ফিট নেমে গিয়ে সেই একেবারে নিচের লেকে গিয়ে পড়েছে। আশ্রমের পাঁচিলটা

ঝুল-পাথরের চূড়া থেকে খাড়াভাবে উঠে গেছে, জানালা সহ প্রকাণ্ড চারটে স্ল্যাব আকাশ-ছোঁয়া ওয়াচ-টাওয়ারের মতো লাগ-লো দেখতে, পরস্পরের সাথে জোড়া লাগানো রয়েছে দুর্গ-প্রাচী-রের মতো দেয়াল দিয়ে। দেখে মনে হয় কঠিন ঝুল-পাথর থেকে, তারই একটা অংশ হিসেবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে আশ্রমটা, সাগরের গায়ে গুরু-গম্ভীর, রহস্যময় আরেক জগতের পাথুরে কাঠামো, আরও পিছনে আভাস পাওয়া যাচ্ছে মেইনল্যাণ্ডের। ইউরোপের সবচেয়ে নির্জন আর দুর্গম আশ্রম এটা। কর্নেল ব্রিজেলবার্ডের অতি সাধের স্বপ্ন।

সাগরে ছোট ছোট ঢেউ আছে, কিন্তু তবু তাকে শান্তই বলা যায়। তুষারঝড়ের লেজটা এখনও গালফ পেরিয়ে যায়নি। ঝুল-পাথরে ঝড়ের ধাক্কা পৌঁচেছে কিনা সন্দেহ হলো রাহাতের, কারণ তুষারের সাদা আভাস কোথাও ওর চোখে পড়লো না। তারমানে, মেইনল্যাণ্ডের সাপ্লাই রোডটা পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাবে আশ্রম থেকে। ওর নিচে জায়গাটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে লেকের দিকে। গরমের দিনে আধ মাইল লম্বা-চওড়া একটা লেক এটা, এখন শীতের দিনে জমাট বরফ হয়ে আছে। রাস্তাটা নেমে গিয়ে পুব তীরের দিকে চলে গেছে, নিরেট বরফের উত্তুরে কিনারা ধরে বেঁকে গিয়ে অদৃশ্য হয়েছে, তারপর আবার বেরিয়ে এসেছে দূর প্রান্তে, সাগরের দিকটায়, যেখান থেকে ঝুল-পাথরের দিকে উঠে আসার পথটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। রাহাত যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেই ঢালের গোড়ায় স্তূপ হয়ে জমে থাকা তুষারে হারিয়ে গেছে প্রায় আধ মাইলটাক রাস্তা। এগুলো ধসে পড়া তুষার, সাধারণত বিশ থেকে ত্রিশ ফিট পুরু হয়। এর

ওপর দিয়ে চলতে পারে এমন গাড়ি এখনও তৈরি হয়নি। জমাট লেকের দিকে তাকালো ও। সারাটা শীতকাল ধরে লেকের পানি বরফ হয়েছে, ওটা কি হাফ-ট্রাক এবং মাউন্টেন-গানের মতো ভারি জিনিসের ওজন বইতে পারবে? নুড়ি পাথর খুট-খুট করে গড়িয়ে গেল। বুঝলো, শিকার আসছে।

'গুলি করবেন না, আমি গোপালা!'

ল্যুগারটা শরীরের পাশে নামিয়ে নিল রাহাত। বেরিয়ে এল বোল্ডারের আড়াল থেকে। খানিকটা দুরে পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাপাগোপালা, কাঁধের রাইফেল কাঁধেই ঝুলছে। 'কি ব্যাপার?' জানতে চাইলো রাহাত।

'মরে রয়েছে। আসুন, আপনার দেখা দরকার।'

'কে মরে রয়েছে?'

রাহাতের দিকে পিছন ফিরে তুষারের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে ফিরতি পথ ধরলো পাপাগোপালা। কাঁধ ঝাঁকিয়ে তাকে অনুসরণ করলো রাহাত।

পাথরের মাথায় উঠে আসতেই চোখেমুখে তীব্র বাতাসের ঝাপটা খেলো রাহাত। চূড়া থেকে সমতল একটা পাথুরে চাতাল কিনারা ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে, ঝুলছে রাস্তার ওপর। এখান থেকে নিচের রাস্তাটা দেখতে পেল ওরা। গ্রীণ এখনও হাফ-ট্রাকের পিছনের বেঞ্চে বসে আছে, হাতে মেশিন-পিস্তল নিয়ে ওদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে ম্যালোরি। চাতালের কিনারায় বসে রয়েছে অ্যালপেনকরপ্‌স্‌ ইউনিফর্ম পরা একজন সৈনিক। বসার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায়, নিচের রাস্তার ওপর নজর রাখাই তার একমাত্র দায়িত্ব ছিল। কাঁধ থেকে রাইফেল

নামিয়ে মাজল দিয়ে লোকটার পাঁজরে খোঁচা দিল পাপাগোপালা, কাত হয়ে পড়ে গেল নিষ্প্রাণ শরীর। চোখ দু'টো খোলা, দৃষ্টিটা ঢুলুঢুলু, মুখের চেহারা নীল হয়ে গেছে। পাহারায় বসা অবস্থায় বরফ হয়ে মারা গেছে সে। হাত দু'টো এখনও আঁকড়ে ধরে আছে রাইফেলটা, বরফ জমে আছে ব্যারেলে।

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো রাহাত। ওদের আগেই তাহলে আশ্রমে পৌঁছে গেছে জার্মানরা।

বারো

কিভাবে হামলা চালানো হবে তার একটা প্ল্যান তৈরি করা হলো। খুঁটিনাটি সমস্ত ব্যাপারে একমত হলো ওরা। কার কি ভূমিকা থাকবে, পরিষ্কার বুঝে নিল সবাই। প্ল্যানটা এল রাহাতের কাছ থেকে, ও নিজেই সেটার নাম দিল, দুঃসাহসী প্ল্যান। ঠিক হলো, মন্দিরের একেবারে হৃৎপিণ্ডে ঢুকতে হবে। কোনো প্রমাণ নেই, আন্দাজের ওপর ধরে নেয়া হলো জার্মান সৈনিকদের সংখ্যা একেবারে কম হবে আশ্রমের ভেতর, এটা ধরে নিয়েই রচনা করা হলো প্ল্যানটা। সবচেয়ে বেশি কাজে লাগলো পাপাগোপালা। আশ্রমের ভেতরটা হাতের উল্টোপিঠের মতো চেনা আছে তার। তাকে নিয়ে নোট বুকের পৃষ্ঠায় একটা নকশা

আঁকলো রাহাত। আশ্রমের ভেতর এবং বাইরেটা মুখস্থ করে নিল ওরা।

এত কিছুর পরও সন্দেহ ঘোচে না ম্যালোরির। বললো, 'কিন্তু লোক যদি ওখানে বেশি থাকে, আমাদের কোনো আশা নেই।'

'নেই,' মেনে নিয়ে বললো রাহাত। 'কিন্তু যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখো, বেশি লোক থাকতে পারে না ওখানে। নিশ্চয়ই সিভিল ড্রেসে এসেছে ওরা—যুদ্ধ ঘোষণার আগে নিরাপদে ট্র্যাভেল করার সেটাই একমাত্র উপায় ছিল ওদের। সিভিল ড্রেসে বেশি লোক আসতে পারে না, তাহলে সন্দেহ জাগানো হবে। এখানে ওরা শুধু সন্ন্যাসীদের সামনে পড়বে, কাজেই লোক কম হলেও চলে।' রিস্টওয়াচ দেখলো ও। 'প্ল্যান করতেই একুশ মিনিটে বেরিয়ে গেছে! আল্লাই জানে ব্রিজেলবার্ড এসে পড়লো কিনা!'

স্টার্ট দেয়াই ছিল, ব্রেক রিলিজ করে দিয়ে হাফ-ট্রাক ছেড়ে দিল ও। ধীরে ধীরে লেকের দিকে নেমে যেতে শুরু করলো গাড়ি। তার পিছনে বেঞ্চিতে নয়, মেঝের ওপর বসে আছে আরোহীরা, গাড়ির দু'পাশের দেয়ালে পিঠ দিয়ে। বলতে হয়নি, যে-যার মাথা নিচু করে রেখেছে। দূর থেকে দেখে মনে হবে, গাড়িতে ড্রাইভার ছাড়া আর কেউ নেই। অ্যালপেনকরপ্‌স্‌ ক্যাপটা এখনও পরে আছে রাহাত।

কয়েক মিনিট পর রাস্তার ওপর তুষার-ধসের স্তূপ দেখতে পেল ওরা। রাস্তা ছেড়ে উঁচু-নিচু দিয়ে লেকের পুব তীরে পৌঁছুলো গাড়ি। বরফের কি অবস্থা দেখার একটা সুযোগ পেল রাহাত।

জমাট লেকের ওপর দিয়ে খানিকটা হেঁটে এলে পরীক্ষাটা তবু কিছুটা নিয়ম-মাফিক হতো, কিন্তু অত সময় নেই হাতে। পাহাড়-কার্ণিশের ওপর সেই পাথরটা জার্মানদেরকে বেশিক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে বলে বিশ্বাস করে না সে। লোক বল আছে, ইকুইপমেন্ট আছে, চেষ্টা করলেই সেটাকে ওরা হয় নালার ভেতর ঠেলে সরিয়ে দিতে বা ভেঙে বের করে আনতে পারবে। তার ওপর, আবহাওয়া এখন অনেক শান্ত হয়ে গেছে, পথ চলতে তাদের খুব একটা অসুবিধে হবে না। একেই বলে জার্মান ভাগ্য!

পিছন দিকে তাকালো রাহাত। মেঝে থেকে ওর দিকে তাকিয়ে আছে ম্যালোরি।

'কি মনে হচ্ছে, স্যার?'

'বুঝতে পারছি না। গোপালা তো আগেই বলে রেখেছে, কিছু হবে না, দিব্যি পেরিয়ে যাবো আমরা। কিন্তু আমি ভাবছি, খানিকদূর পর্যন্ত হয়তো গেলাম, তারপর যদি তলিয়ে যাই? বরফ কোথায় কতটা পুরু, জানার উপায় কি!'

'শীতকালে সন্ন্যাসীরা গরুর গাড়ি নিয়ে এই লেকের ওপর দিয়ে চলাচল করে,' বললো পাপাগোপালা। 'শীত এলেই তুষার পড়ে বন্ধ হয়ে যায় রাস্তা...'

'কিন্তু শীতের এটা শেষ, পাপাগোপালা,' মনে করিয়ে দেবার সুরে বললো রাহাত। 'সময় মতো বদলায়নি ঋতু, তা না হলে কবেই বসন্তের এসে পড়ার কথা।'

ইতস্তত করতে লাগলো পাপাগোপালা। সেটা লক্ষ্য করে বুকে ভয় ধরে গেল গ্রীণের, ঝট্ করে রাহাতের দিকে তাকালো সে। খকখক করে কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিল পাপাগো-

পোলা, তারপর দৃঢ় সুরে বললো, 'এতদিন শীত থাকে না, সত্যি। কিন্তু বছর চারেক আগে ঠিক এই রকম হয়েছিল, সেবার এপ্রিল মাসেও সন্ন্যাসীরা গরুর-গাড়ি নিয়ে লেক পাড়ি দিয়েছে। কেউ মারা যাওয়া তো দূরের কথা, কোনো দুর্ঘটনাই ঘটেনি।'

শেষ চুরুটটা ধরালো রাহাত। 'ঠিক আছে, গোপাল ঠাকুর, মেনে নিলাম বছর চারেক আগের মতোই এবারের বরফও বেশ পুরু। তোমার সাথে তর্কে যেতে হলে লীগ অব নেশনসকে সালাম দিতে হবে। এবার, সবাই যে-যার আল্লা খোদার নাম নাও। আমার হাতে তোমাদের যদি মরণ হয়, ক্ষমা করো...' হাসতে হাসতে ব্রেক রিলিজ করে দিল রাহাত। তীর থেকে নেমে এল গাড়ি।

স্পীড কমের দিকেই রাখলো রাহাত, ঘণ্টায় দশ মাইল। বরফের ওপর দিয়ে অদ্ভুত একটা ফাঁপা আওয়াজ তুলে গুটি গুটি এগোলো হাফ-ট্রাক। ট্র্যাকের চাপে মড়মড় করে ভাঙছে জমাট লেকের বরফ। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে বসন্ত, এখনই গলে গিয়ে পাতলা হবার সময় বরফের। শক্ত, নিরেট থাকার সময় পেরিয়ে এসেছে। লেকের গভীরতা সম্পর্কে পরিষ্কার কোনো ধারণা ছিল না ওর। খানিক আগে আলোচনার সময় পাপাগোপালা জানিয়েছে, 'পঞ্চাশ মিটার। কোথাও কোথাও কিছু বেশি হতে পারে।' পঞ্চাশ মিটারই ধরা যাক। দেড়শো ফিটেরও বেশি। জমাট সারফেসের নিচে দেড়শো ফিট সাব-জিরো পানি। কাত হয়ে গেল হাফ-ট্রাক। বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল, পরমুহূর্তে বুঝলো ডান দিকের ক্যাটারপিলার ট্র্যাক ফুলে থাকা বরফের ওপর দিয়ে এগোচ্ছে। সামনে খানিকটা অসমতল সারফেস,

হুইল ঘুরিয়ে গাড়িটাকে আরেকদিকে নিয়ে চললো রাহাত। এত ভয় করলে চলে না, ভাবলো ও। যা হয় হবে! কপালে যদি লেখা থাকে, কেউ ঠেকাতে পারবে না, যাবে তলিয়ে। তাই নিয়ে দুর্ভাবনা করে কোনো লাভ আছে?

পিছনে ওদের অবস্থা রাহাতের চেয়ে খারাপই বলতে হবে। কোথায় যাচ্ছে, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ওরা। গাড়ি কাত হলে ভাবছে, বরফ ভেঙে লেকের নিচে ডেবে যাচ্ছে। কত দুর এল, আর কতটা বাকি, তাও বোঝার কোনো উপায় নেই। লেক পাড়ি দেবার শুরুতে রাহাত ভেবেছিল তুষার মোড়া রোডের পাশে পাশে থাকবে তারা। কিন্তু রোডটা ধনুকের মতো বেঁকে যাওয়ায় রাস্তায় পৌঁছুতে অনেক বেশি সময় লেগে যাবে তাতে। তাই আরেকটা ঝুঁকি নিয়েছে ও। গাড়ির কোর্স বদলে চলে এসেছে লেকের মাঝখানে। তুষারের নিচ থেকে আবার যেখানে বেরিয়ে এসেছে রাস্তাটা, সেখানে তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে হলে এটাই শর্টকাট।

চমৎকার এগোচ্ছে ওরা। মাঝে মধ্যে ঝাঁকি খাচ্ছে হাফ-ট্রাক, সেটা কি কারণে বলা মুশকিল। বরফের রঙ উজ্জ্বল সাদা, চোখ ধাঁধিয়ে যায়, উঁচু-নিচু ঠিক মতো ঠাহর করা যায় না। ঝাঁকি যে-কারণেই হোক, প্রতিবার মনে হলো, বরফের নিচে ডেবে যেতে গিয়েও বেঁচে গেছে ট্রাক।

ভুরু কুঁচকে উঠলো। এতক্ষণ ধবধবে সাদা বরফের ওপর দিয়ে এসেছে ওরা, কিন্তু সামনে এখন দেখা যাচ্ছে ফ্যাকাসে, অনুজ্জ্বল সাদা রঙের বিস্তৃতি। গাড়ির স্পীড আরও কমিয়ে আনলো ও। রঙের এই পার্থক্য কি কারণে, জানা নেই ওর।

জানার কোনো ইচ্ছেও নেই। ধীরে ধীরে হুইল ঘোরাতে শুরু করলো, এলাকাটা এড়িয়ে যেতে চায়।

দুরের তীর-রেখা একটু একটু করে এগিয়ে আসছে। বিশাল ঝুল-পাথরটাকে পাশ কাটালো হাফ-ট্রাক, পাশ কাটালো ঝুল-পাথর থেকে সোজা লেকে নেমে আসা বাহুটাকে। আশ্রমের তুর্গ-প্রাচীরের সাথে সমান্তরাল রেখা ধরে এগোলো ওরা। এতক্ষণে একটা প্রাণের সন্ধান পেল রাহাত। টাওয়ারের মাথায় ক্ষুদে একটা মূর্তি, এত দুর থেকে বোঝার কোনো উপায় নেই লোকটা জার্মান সৈনিক নাকি আশ্রমের কোনো সন্ন্যাসী। আরোহীদের মেঝেতে বসতে বলেছিল ও, কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় নিজের বুদ্ধির একটু তারিফ না করে পারলো না। সূর্য পশ্চিম দিগন্ত-রেখার দিকে নেমে গেছে, গাড়ির ভেতর ঘন ছায়া, চোখে ফিল্ড-গ্লাস থাকলেও দুর থেকে কেউ ওদেরকে দেখতে পাবে না। যাকে দেখবে তার মাথায় অ্যালপেনকরপ্‌স্ ক্যাপ আছে।

নিরাপদ রাস্তার কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা, আর মাত্র তু'শো গজ। রাস্তার ওপর উঁচু হয়ে জমে থাকা তুষার স্তূপের কিনারা দেখতে পেল রাহাত, যেখানে আবার বেরিয়ে এসেছে রাস্তাটা। চোখের কোণে কি যেন নড়ে উঠতে দেখলো ও। সেই সাথে বিস্ফোরণের মতো আওয়াজ শুরু হলো। নিজের অজান্তেই গাড়ির স্পীড কমিয়ে আনলো রাহাত। ডান দিক থেকে দ্রুত ছুটে আসছে মস্ত অজগরের মতো একটা ফাটল, ভেতরটা অন্ধকার। দিক না বদলালে হাফ-ট্রাকের, সামনে দিয়ে যাবে সেটা। নিজের ভুল বুঝতে পেরে দাঁতে দাঁত চাপলো রাহাত, অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিয়ে স্পীড বাড়িয়ে দিল ও। হঠাৎ

একটা ঝাঁকি খেলো হাফ-ট্রাক, লাফ দিয়ে ছুটলো সামনের দিকে। ওদিক থেকে ফাটলটাও ধেয়ে আসছে। ফাটলের গতি-পথ লক্ষ্য করে খানিকটা স্বস্তিবোধ করলো ও। সোজা এলে তাড়াতাড়ি গাড়ির সামনে পৌঁছে যাবে ওটা, কিন্তু তা আসছে না। সাপের মতোই এঁকেবেঁকে, নরম জায়গা বেছে পথ করে নিচ্ছে। ফাটলটা বিশ গজের মতো দূরে থাকতে সেটাকে পাশ কাটিয়ে এল হাফ-ট্রাক। লেকের বাকিটা পেরোতে কোনো অসুবিধে হলো না। ঢালু তীর বেয়ে লেক থেকে ওপরে ওঠার সময় বিপজ্জনকভাবে কাত হয়ে পড়লো গাড়ি, কিন্তু কোনো দুর্ঘটনা ঘটলো না। রাস্তার ওপর উঠে এল ওটা। খানিক সামনে থেকে আবার ওপর দিকে উঠে গেছে পথ। কাত হয়ে থাকা ঝুল-পাথরে বসানো আশ্রম থেকে এক সময় ওদেরকে আর দেখা গেল না। রাস্তার ধারে গাড়ি থামালো রাহাত। হুইলের ওপর হাত, হাতের ওপর মাথা রেখে চোখ বুজলো ও।

'ইউ হ্যাভ মেড ইট, স্যার!' পিছনের মেঝে থেকে বেঞ্চের ওপর উঠে বসলো ম্যালোরি।

চোখ মেলে গাড়ির বাইরে, দক্ষিণ দিকে তাকালো রাহাত। আগেই দেখেছে ও, কিন্তু বলার সময় পায়নি। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে গালফের দিকে তাকালো ম্যালোরি। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রাহাতের মনোকিউলার গ্লাসটা বের করে চোখে তুললো। সরু, খয়েরী রঙের একটা জলযান। স্টার্ণের দু'পাশে ঢেউ তুলে এগিয়ে আসছে সাবলীল ভঙ্গিতে, ফানেল থেকে কালো মেঘের মতো বেরিয়ে আসছে ধোঁয়া। চিনতে অসুবিধে হলো না। ওটা একটা ব্রিটিশ ডেস্ট্রয়ার, পেনিনসূলার দিকে আসছে। ডেকে সার

সার দাঁড়িয়ে রয়েছে সৈনিকরা। ক্যাপ আর ইউনিফর্ম দেখে ভুরু কুঁচকে উঠলো তার। ব্রিটিশ নয়, সৈনিকরা সবাই অস্ট্রেলিয়ান, কিছু নিউজিল্যাণ্ডারও থাকতে পারে। সোজাসুজি কেপ জার্ভোসের দিকে আসছে ডেস্ট্রয়ার। সৈনিকরা পাহাড়-প্রাচীরের গোড়ায় ল্যাণ্ড করবে। জার্মানরা এড়িয়ে গেলেও মিত্রপক্ষ পাহাড় পেঁচিয়ে ওঠা রাস্তাটা ব্যবহার করতে চাইছে।

'শুধু যদি সময় থাকতে পৌঁছুতে পারে ওরা!'

'পারবে না।' গাড়ি থেকে নেমে পড়লো রাহাত। তার পাশে এসে দাঁড়ালো ম্যালোরি। 'এক ঘণ্টার মধ্যে এখানে পৌঁছে যাবে ব্রিজেলবার্ড।' গাড়ির দিকে তাকালো ও। গ্রীণের পাশে বসে আছে পাপাগোপালা। 'পাহাড়ী রাস্তা ধরে আশ্রমে পৌঁছুতে একজন লোকের কতক্ষণ লাগতে পারে?'

'তিন থেকে চার ঘণ্টা,' বললো পাপাগোপালা। 'পায়ে কতটা জোর, তার ওপর নির্ভর করে। খচ্চরের জন্যে খুব কঠিন পথ ওটা।'

'শুনলে তো!' ম্যালোরির দিকে ফিরলো রাহাত। 'তাছাড়া এখনও ল্যাণ্ড করেনি ওরা। আরও সময় নেবে। তারপর, আমরা ধরে নিচ্ছি পাহাড়ের গোড়ায় নামবে ওরা, এমনও তো হতে পারে কোর্স বদলে কাটায়রার দিকে যাবে, কোর্স বদল করার সময় পেরিয়ে যায়নি...'

ম্যালোরির চেহারা ম্লান হয়ে গেল। 'ভেরে পিস্তল থাকলে সিগন্যাল দেয়া যেত। আয়না! কারও কাছে আয়না আছে?'

নেই।

লেদার কোটের কাঁধ থেকে তুষার ঝেড়ে ফেললো রাহাত,

তারপর এগোলো। নিচের দিকে, ফেলে আসা পথ ধরে নেমে যাচ্ছে, লম্বা লম্বা পা ফেলে ওর পাশে চলে এল গ্রীণ। তার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে উঠলো ওর। 'কি ব্যাপার? চেহারা এমন নিরানন্দ কেন? বউ-ছেলে-মেয়ের কথা মনে পড়ে গেছে?'

সাথে সাথে কিছু বললো না গ্রীণ, তারপর তাকালো রাহাতের দিকে। 'শুনতে বোধহয় অদ্ভুত লাগবে, তবু কেন যেন কথাটা আপনাকে বলার জন্যে মনটা সেই কখন থেকে ছটফট করছে।'

'কি কথা, সার্জেন্ট?'

'যুদ্ধ আমার ভাল লাগছে না।'

প্রায় দাঁড়িয়ে পড়েছিল রাহাত, কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার আগের মতো আড়ষ্ট ভঙ্গিতে পা ফেলে হাঁটতে লাগলো। 'যুদ্ধ বোধহয় এক ম্যানিয়াক ছাড়া আর কারুরই ভাল লাগে না, গ্রীণ। ভাল না লাগাটাই তো স্বাভাবিক।'

'আমাদের ওপর না হয় যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে,' জিজ্ঞেস করলো গ্রীণ, 'কিন্তু আপনি একজন ভারতীয় হয়ে এ-যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেন কেন?' রাহাত কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি আবার বললো সে, 'উত্তরটা আপনি আগেই দিয়েছেন, জানি। কিন্তু সেটাই কি একমাত্র কারণ। আমরা ব্রিটিশরা আপনাদেরকে স্বাধীনতা দেবো বলে কথা দিয়েছি, সেই কথায় আপনার মতো একজন মানুষ নাচছেন, এ আমি যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না।'

মুচকি একটু হাসি দেখা গেল রাহাতের ঠোঁটে। 'তোমার মাথাটা পরিষ্কার, তাই এ-ধরনের একটা প্রশ্ন করতে পারলে।

ঠিকই ধরেছো, যুদ্ধে যোগ দিলে স্বাধীনতা পাবো শুধু এই কারণে আমাকে তুমি এখানে দেখছো না। তোমরা ব্রিটিশরা সহজে ভারত ছেড়ে চলে যাবে, এ আমি বিশ্বাস করি না। তবে ভারত তোমাদেরকে ছাড়তেই হবে। যাতে ছাড়ো, যাতে ছাড়াতে পারি, তার জন্যেই এই যুদ্ধে লড়তে এসেছি আমি। শুধু আমি নই, আমার মতো আরও অনেক ভারতীয় তোমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ছে। উদ্দেশ্য, তোমাদের বিরুদ্ধে কিভাবে লড়তে হবে সেটা আয়ত্ত করা।'

কখন যেন ওদের পিছনে চলে এসেছে ম্যালোরি, হাসির শব্দে জাহির হয়ে পড়লো তার উপস্থিতি।

'রাজনীতি আমি বুঝি না, স্যার,' বললো গ্রীণ। 'কিন্তু এটুকু বুঝি যে কোনো জাতিকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে দাবিয়ে রাখা যায় না। আপনার সাথে আমিও একমত, ভারত আমাদের ছাড়তেই হবে। কে কি ভাবছেন জানি না, কিন্তু ভারতে আপনার মতো আরও কিছু মানুষ যদি থেকে থাকেন, আমাদের আর দেরি করা উচিত হবে না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্বাধীনতার দাবি মেনে নিয়ে বিপদ কাটানো দরকার।'

একটানা অনেকক্ষণ বসেছিল রাহাত, আড়ষ্ট হয়ে গেছে শরীর, ঠিক যেখানে ফেলতে চাইছে সেখানে পড়ছে না পা। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি ওর পিছনে চলে এসেছে ম্যালোরি, মেজরের কোনো অসুবিধে হলে তাকে ধরে ফেলার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। ঝুল-পাথরের নিচে রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে এসে থামলো ওরা। এরপর রাস্তাটা লেকের কিনারা ঘেঁষে এগিয়েছে। রাহাতের পাশে এসে দাঁড়ালো

ম্যালোরি। 'সময় যে নেই, নিজের চোখেই দেখো।' ওদের মাথার ওপর ঝুলে আছে বিশাল ঝুল-পাথর, তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে ওয়াচ-টাওয়ারের মতো আশ্রমের দেয়াল। কিন্তু রাহাত তাকিয়ে আছে লেকের ওপর দিয়ে বহু দূরে, উল্টোদিকের তীরে। তুষার ঢাকা ঢালের ওপর ছোট একটা ছারপোকার মতো কি যেন দেখা যাচ্ছে সেখানে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে বোঝা গেল, ওটা সচল। বুঝতে কারও অসুবিধে হলো না, জার্মানদের প্রথম হাফ-ট্রাক পৌঁছে গেছে।

ম্যালোরির চেহারা ম্লান হয়ে গেল। 'হুঁ। ডেস্ট্রয়ারের ওরা সময় মতো পৌঁছুতে পারবে না।'

ঘুরে দাঁড়ালো রাহাত, নিজেদের হাফ-ট্রাকের দিকে হাঁটা শুরু করে বললো, 'প্ল্যান বদল করার দরকার নেই। যেভাবে হোক, ডেস্ট্রয়ারটাকে সাবধান করে দিতে হবে। ওরা যদি ল্যাণ্ড করে আর পাহাড়ী পথে লোকজন পাঠায়, নিজেদের পজিশন থেকে ম্যাসাকার করে ছাড়বে জার্মানরা।'

'আর সেই পজিশনে পৌঁছুতে জার্মানদের বেশি সময়ও লাগবে না,' বললো ম্যালোরি। 'ট্র্যাকের দাগ দেখে বুঝতে পারবে ব্রিজেলবার্ড, ভারি গাড়ি নিয়েও লেক পেরোনো সম্ভব।'

'তা বুঝতে পারবে না। বাতাস এরই মধ্যে ট্র্যাকের দাগ মুছে ফেলেছে। লেকের ওপর দিয়ে গাড়ি চালানো সম্ভব কিনা সেটা তাকে নিজে থেকে বুঝে নিতে হবে। তাতে কিছু সময় পাবো আমরা। হয়তো বেশি নয়, তবে পাবো।'

দ্রুত আরেকবার ডেস্ট্রয়ারটাকে দেখে নিয়ে আবার ওরা হাফ-

ট্রাকে উঠে বসলো। স্টার্ট দেয়াই ছিল, গাড়ি ছেড়ে দিল রাহাত। রাস্তাটা উঠে গেছে ওপর দিকে। খানিকটা রাস্তা ওদের ডান এবং পশ্চিম দিকে বেশ খাড়াভাবে নেমে গেছে, আরও নিচে পাহাড়ের ঢাল সোজা ঝপ্ করে সাগরে গিয়ে পড়েছে। ওদের বাঁ দিকে ঝুল-পাথরের পাঁচিল, ওদের দিকে কাত হয়ে আছে। রাস্তায় বেশ উঁচু হয়ে জমে আছে তুষার, তবে অল্প আগে পড়েছে এগুলো, এখনও জমাট বাঁধেনি। ঝুল-পাথরের পাঁচিলের গায়েও সাদা তুষার জমে আছে। গালফের দিকে তাকালো রাহাত। মেইনল্যাণ্ডের দিক থেকে এগিয়ে আসা পাথরের চেইনটা পানির ওপর পরিষ্কার দেখতে পেল ও। এই চেইনটাই জাহাজডুবির কারণ ঘটায়। শেষ হয়েছে করাতের দাঁতের কাছে। এই করাতের দাঁতই আরেকটু হলে টাটরাকে ডুবিয়ে দিচ্ছিলো।

মেইনল্যাণ্ড দেখা গেলেও, মিত্রপক্ষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাপ্লাই রোডটা দেখতে পেল না রাহাত। রাস্তার ধারে আরেকটা পাথুরে পাঁচিল পড়লো, আড়ালে পড়ে গেল গালফ। রাস্তাটা এরপর সরু হয়ে গেছে। আশ্রমের দিকে যেতে এটাই রাস্তার শেষ অংশ। ওরা আসলে একটা খাদের ভেতর রয়েছে, খাদের পাঁচিলের গায়ে এই রাস্তা। এদিকের পাঁচিলটা ওদের মাথার ওপর থেকে খাড়াভাবে আরও অনেক উঁচু পর্যন্ত উঠে গেছে। রাস্তা ধরে আরও দু'শো ফিটের মতো উঠলো ওরা, এই সময় সামনে পড়লো এক টুকরো মেঘ। দৃষ্টিসীমা কমতে কমতে একেবারে নেই হয়ে গেল। হেডলাইট জ্বাললো রাহাত। ঘন ধোঁয়ার মতো মেঘের ভেতর আটকা পড়েছে গাড়ি, স্পীড কমিয়ে আনলো ও। হঠাৎ করে নেমে গেছে তাপমাত্রা। গুটি গুটি এগোলো গাড়ি।

সামনের বাঁকটা অত্যন্ত সাবধানে ঘুরলো রাহাত। হেডলাইটের আলো কোনোরকমে কাজ চালাবার মতো ভেদ করতে পারলো ভেসে যাওয়া মেঘের টুকরোটাকে। আরেকটা বাঁক। এরপর রাস্তাটা এঁকেবেঁকে উঠে গেছে ঝুল-পাথরের চূড়ার দিকে। ওপ-রের রাস্তা থেকে পানির ধারা গড়িয়ে নামছে, নিচের রাস্তার তুষারও সেই পানির স্পর্শে এসে গলে যাচ্ছে। মেঘের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে ওরা, কাপড়-চোপড় ভিজে নাস্তানাবুদ হয়ে গেল। ক্যাটারপিলার ট্র্যাক একবারও কোনো অসুবিধের কারণ ঘটায়নি, সেজন্যে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল রাহাত। ওর পিছনে আরোহীরা সবাই তৈরি হয়ে আছে। গাড়ির লেজের কাছে দাঁড়িয়ে আছে পাপাগোপালা, কাঁধে ঝুলছে ক্লাইম্বিং রোপ। লম্বালম্বিভাবে ফেলা একটা বেঞ্চের ওপর বসে আছে ম্যালোরি আর গ্রীণ, দু'-জনেই মেশিন-পিস্তল হাতে রেডি, তাকিয়ে আছে পাপাগোপালার দিকে। আরেকটা বাঁক ঘুরলো রাহাত। সামনে রাস্তাটা সম-তল। হেডলাইট অফ করলো ও। ঠক্ ঠক্ আওয়াজ পেল পিছন থেকে। গাড়ির গায়ে রাইফেল ঠুকে থামার সিগন্যাল দিচ্ছে পাপাগোপালা।

গাড়ি থামালো রাহাত। ইঞ্জিন চালু থাকলো। লোনা বাতাস ঢুকলো নাকে। লক্ষ্য করলো, ধীরে ধীরে পাতলা হয়ে যাচ্ছে মেঘ। ম্লান, ঝাপসা সূর্য দেখা গেল। ঝুপ ঝুপ করে গাড়ির পিছনে নামলো পাপাগোপালা, গ্রীণ আর ম্যালোরি। হালকা মেঘের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা তিনজন। হুইলের পিছনে বসে রিস্টওয়াচের কাঁচে লেগে থাকা পানি মুছলো রাহাত। কাঁটায় কাঁটায় পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করবে ও। পাতলা হতে

হতে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে মেঘ। সামনের খানিকদুর এগিয়ে রাস্তাটা আবার উঠে গেছে, সেই ঢালে ঢাকা পড়ে গেছে আশ্রম।

চার মিনিট ত্রিশ সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল। মেঘ সম্পূর্ণ কেটে গেছে। একটু পরই শুরু হবে হামলা।

তেরো

গরম নয়, কিন্তু শীতের ঝলমলে রোদ লাগলো রাহাতের গায়ে। ওর ডান দিকে ঈজিয়ান সাগর দেখতে পেল ও, কিন্তু মাথাচাড়া দিয়ে থাকা ঢালের আড়ালে পড়ে গেছে ডেস্ট্রয়ার। মাউন্ট জার্ভোসের কঠিন তেকোণা আকৃতিটাও দেখতে পেল, ধবধবে সাদা, রোদ লেগে ঝলমল করছে। কিন্তু আশ্রমটা চোখের আড়ালেই রয়ে গেছে। অদুরে দেখা গেল গভীর নালা, এর ভেতর দিয়েই লেফটেন্যান্ট আর সার্জেন্টকে নিয়ে গেছে পাপাগোপালা। যতদুর দেখা যাচ্ছে নালাটা, খালি। আবার রিস্টওয়াচ দেখলো রাহাত। পাঁচ মিনিট পুরো হতে এখনও দশ সেকেণ্ড বাকি। ভিজে পকেটে হাত ভরে ল্যুগারটা বের করলো ও, উরুর পাশে সীটের ওপর রাখলো সেটা। পাঁচ সেকেণ্ড বাকি। গিয়ার দিয়ে ক্লাচ চেপে ধরে থাকলো ও। অপেক্ষা করলো ক'সেকেণ্ড, তারপর রিলিজ করে দিল। রওনা হলো রাহাত।

প্রতি মুহূর্তে স্পীড বাড়িয়ে চললো ও। ঢালের মাথায় উঠে আসতেই আশ্রমটা দেখতে পেল। সরল একটা রেখার মতো পড়ে আছে রাস্তা, প্রায় দু'শো গজ। টাওয়ার আর ওগুলোর মাঝখানের পাঁচিল এদিকটায় বেশ নিচু। গম্বুজ আকৃতির একটা সবুজাভ কাঠামো দেখলো, দেখেই বুঝলো ওটা উপাসনালয়। একটা পাঁচিলের পিছন থেকে মাথা চাড়া দিয়ে আছে গম্বুজটা। মান্ধাতা আমলের গেট-হাউজটা কাঠের তৈরি, পাঁচিলের মাঝখানে পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাঁচিল ঘেঁষে উঠে গেছে তিন-চার তালা কাঠের ঘর, দেখতে অনেকটা বাক্সের মতো। প্রতিটি ঘরের সামনে একটা করে লম্বা শাটার, সামনের ছোট ঝুল-বারান্দায় বেরিয়ে আসার পথ ওগুলো। আশ্রমের সামনে রাস্তার এক পাশে কিছু নেই, আরেক পাশে রাজ্যের বোল্ডার। একশো গজের মতো এগিয়ে রাস্তা ছেড়ে মাঠে নেমে পড়লো গাড়ি। বড় একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করে আবার রাস্তায় উঠলো রাহাত, কিন্তু এবার হাফ-ট্রাকের পিছনটা থাকলো আশ্রমের দিকে। এখন পর্যন্ত কোথাও কোনো প্রাণের চিহ্ন দেখতে পায়নি ও। রিভার্স গিয়ার দিয়ে গাড়িটাকে পিছিয়ে নিয়ে চললো বন্ধ গেটের দিকে। শরীরটাকে মুচড়ে বাঁকা করে তাকিয়ে আছে রাস্তার ওপর। গেটটা দ্রুত কাছে চলে আসছে।

চোখের কোণ দিয়ে লোকটাকে দেখতে পেল রাহাত। গেট-হাউজের দোতালার বারান্দায় এইমাত্র বেরিয়ে এল। ফিল্ড-গ্রে রঙের পোশাক পরা একটা মূর্তি, তার বেশি কিছু ঠাহর করতে পারলো না ও। কিন্তু মূর্তির হাতে লম্বা জিনিসটা কি আন্দাজ করতে অসুবিধে হলো না। রাইফেল তুলে ওর দিকে

লক্ষ্য স্থির করছে লোকটা। কোথাও নিশ্চয়ই মারাত্মক, কোনো ত্রুটি ঘটেছে। অ্যালপেনকরপ্‌স্‌ ক্যাপ দেখেও লোকটা থামবে বলে মনে হলো না। নাকি শেষ মুহূর্তে ওদের কাউকে দেখে ফেলেছে? গুলি যদি লোকটা আরও ক'সেকেণ্ড পর করে, তার ব্যর্থ হবার কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না। উঁচু থেকে নিচে, সচল টার্গেটের ওপর গুলি করা পানির মতো সহজ।

হাফ-ট্রাকের ইঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠলো তীক্ষ্ণ গুলির শব্দ। রাস্তার পাশে বোল্ডার, তার আড়াল থেকে রাইফেল চালালো পাপাগোপালা। ঝুল-বারান্দাটা রাস্তার ঠিক ওপর ঝুলছে, ঝাঁকি খেয়ে রেলিঙের ওপর পড়লো লোকটা, পোকায় খাওয়া কাঠের রেলিঙটা হু'বার মট মট করে উঠে ভেঙে গেল, লাশটাকে নিয়ে সোজা নেমে এল রাস্তার ওপর। ঠিক সেই মুহূর্তে বন্ধ গেটের ওপর প্রচণ্ড গুঁতো দিল রাহাতের হাফ-ট্রাক। পিছন দিকে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো গেট, খিলানের নিচ দিয়ে যেমন ছুটছিল তেমনি ঝড়ের বেগে ছুটে চললো গাড়ি।

মস্ত উঠোন। কোথাও নেই কেউ। ধরাশায়ী কবাটের ওপর দিয়ে গড়িয়ে এল গাড়ির চাকা। ফেলে আসা গেট ফ্রেমের দিকে তাকালো রাহাত। কবাটের সাথে ধরাশায়ী অবস্থায় দেখতে পেল একজন জার্মান সৈনিককে, গেটের ভেতর দিকে পাহারায় ছিল, একেবারে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে।

চারদিক থেকে চারটে পাথুরে রাস্তা এসে উঠোনের মাঝখানে এক হয়েছে, সেই চৌ-মাথার দিকে সগর্জনে ছুটলো হাফ-ট্রাক। এই চৌ-রাস্তার কথা মনে ছিল রাহাতের, কিন্তু এত বড় দেখেছিল কিনা মনে নেই। মাঝখানে একটা বুড়ো গাছ।

ডান দিকে উপাসনালয়। গাছটাকে ছাড়িয়ে আরও সামনে অতি প্রাচীন একটা সাদা পাথর দিয়ে ঘের দেয়া। গোটা উঠানটা এত বড় যে ছোট একটা সামরিক বাহিনীকে জায়গা দেয়া যায়। চারদিকে উঁচু বারান্দা আর জানালা, সেগুলো থেকে উঠানটা পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। সোজা বুড়ো গাছটার দিকে ছুটে যাচ্ছে হাফ-ট্রাক, এই সময় স্পীড কমালো রাহাত, গিয়ার বদল করলো, তারপর আবার গর্জন তুলে ছুটলো সামনের দিকে। রাস্তাগুলো ধরে ছুটে বেড়ানোই এখন একমাত্র কাজ রাহাতের। অ্যালপেনকরপ্স্ ক্যাপটা এখনও পরে আছে ও।

গুলির আওয়াজ হলো। উপাসনালয়ের পিছন থেকে তীর বেগে বেরিয়ে এল হাফ-ট্রাক, চৌ-মাথায় পৌঁছে ডান দিকে বাঁক নিল, রাস্তা থেকে নেমে গিয়ে মাঠের ওপর দিয়ে ছুটলো একটা দোতালা ঘরের দিকে। গ্রাউণ্ড ফ্লোরের বারান্দাটা রেলিঙ দিয়ে ঘেরা, ক্যাটারপিলার-ট্র্যাকের ঘর্ষণ খেয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল সেটা। আশ্রমের ভেতর যারাই থাকুক, হাফ-ট্রাকের এই উদ্ভট আচরণ খানিকক্ষণের জন্যে হলেও তাদেরকে সম্মোহিত না করে পারবে না। ওদের মনোযোগ নিজের দিকে টেনে রাখতে চাইছে রাহাত। চাইছে সেই ফাঁকে অন্য দিকে আর কিছু ঘটে যাক।

নালার ভেতর দিয়ে ওদেরকে আশ্রমের দিকে নিয়ে চললো পাপা-গোপালা। নালাটা সাত ফিটের মতো গভীর, কাজেই আশ্রমের পাঁচিলে কেউ যদি থাকেও, দেখতে পাবে না ওদেরকে। টাওয়ার-গুলোর একটার দিকে এগোচ্ছে ওরা, পাঁচিল থেকে ফুলে বেরিয়ে আছে যেটা। পাঁচিলের বাইরেও টাওয়ারটা ফুলে আছে বলে

তার আড়ালে দাঁড়ালে গেট-হাউস থেকে কেউ ওদেরকে দেখতে পাবে না।

পাপাগোপালার কাঁধে ক্লাইম্বিং রোপ, ত্ন'হাতের মাঝখানে রাইফেল। শিরদাঁড়া সামনের দিক বাঁকা করে ছুটছে সে। তার পিছনে গ্রীণ, পাপাগোপালার খুঁড়িয়ে ছোটার ভঙ্গিটা দেখে হাসি পাচ্ছে তার। সবশেষে ম্যালোরি। সজাগ, সতর্ক হয়ে আছে সে, কিন্তু মেজরের কথা ভুলতে পারছে না। একটা লোক আর কত করতে পারে? ভদ্রলোক না থাকলে এখানে পৌঁছু-বার কথা ভাবতেও সাহস পেত না ওরা। সত্যি কথা বলতে কি, যা করার একাই করেছেন তিনি। কিন্তু আফটারঅল রক্ত-মাংসের মানুষ, ধকল সহ্য করার ক্ষমতা যতোই থাক, তারও তো একটা সীমা আছে? শক্রদের মনোযোগ অন্য দিকে সরাবার দায়িত্ব তাঁর একার নেয়া উচিত হয়নি।

এখানে পাঁচিলের গা ঘেঁষে এগিয়েছে নালাটা। নালার ভেতর দিকের গা বেয়ে খানিকটা উঠলো পাপাগোপালা। বড় একটা বোল্ডারের আড়ালে চলে এল, যাতে গেট-হাউস থেকে তাকে কেউ দেখতে না পায়। চারদিকটা ভাল করে দেখে ঝুপ করে আবার নালায় পড়লো সে। ওই বোল্ডারের আড়ালেই পজিশন নিতে হবে তাকে। মেজরকে কাভার দেবার জন্যে এর চেয়ে ভাল জায়গা আর হয় না। সামনের দিকে ছুটলো সে। বেশিদুর যেতে হলো না, খানিক পরই পাঁচিলের গোড়ায় সমাপ্তি ঘটেছে নালার। একটা কোণার আড়ালে রয়েছে ওরা, পাঁচিলের ভেতর দিকের ঝুল-বারান্দায় কেউ বেরিয়ে না এলে দেখে ফেলার ভয় নেই। রশিটা ছুঁড়ে দেবার জন্যে তৈরি করতে এক মিনিটও

লাগলো না তার। ওদের বিশ ফিট ওপরের বারান্দায় উঠে গেল হুক লাগানো রশি, আটকে গেল শাটারের মাথার সাথে। রশিটা টেনেটুনে পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলো সে। ওদিকে পাঁচিলের দিকে মেশিন-পিস্তল তুলে পাহারায় রয়েছে গ্রীণ, আর ম্যালোরির রাইফেল তাকিয়ে আছে বারান্দাগুলোর দিকে।

'তাড়াতাড়ি করো।' তাগাদা দিল পাপাগোপালা। 'কোথা দিয়ে কোন্ দিকে যেতে হবে সব মনে আছে তো?'

মেশিন-পিস্তলটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে রিস্টওয়াচ দেখলো ম্যালোরি। 'তোমার নকশায় ভুল না থাকলে ওখানে চোখ বন্ধ করে ঘুরে বেড়াতে পারবো আমি।' ক্লাইম্বিং রোপ ধরে উঠতে শুরু করলো ও। ধীরে ধীরে কাছে চলে আসছে ঝুল-বারান্দা। যদিও থরথর করে কাঁপছে সেটা, তবে ভেঙে পড়বে বলে মনে হলো না। নিচ থেকে চাপা গলায় অভয় দিল গ্রীণ, 'আমি কাভার দিচ্ছি, স্যার। শাটার খুলে কেউ বেরিয়ে এলে তার আর রক্ষে নেই।'

'ভাল হবে,' আশীর্বাদ করলো ম্যালোরি, 'তোমার বউ-ছেলে-মেয়ের ভাল হবে!'

বারান্দায় উঠে এসে ম্যালোরি দেখলো, এক জোড়া কাঠের পাটাতনের ফাঁকে রশির হুকটা আটকে রয়েছে। এবার রশি টেনে গ্রীণকে ওপরে তোলার পালা। নালা ধরে পিছিয়ে গেছে পাপা-গোপালা, খানিকটা উঠে সেই বোল্ডারের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে আছে সে, ওখান থেকে কাভার দেবে মেজর রাহাতকে।

বারান্দায় উঠে এল গ্রীণ। 'সন্ন্যাসীদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা আছে, স্যার?' জানতে চাইলো

সে। 'ওরা যদি অন্তর থেকে অভিশাপ দিত, পুড়ে ছাই হয়ে যেত জার্মানরা—আমাদের আর এত কষ্ট করতে হতো না।'

'কিন্তু তুমি জানছো কিভাবে সন্ন্যাসীরা ওদের নাকি আমাদের দলে ?'

হতভম্ব দেখালো গ্রীণকে। 'তাই তো!'

'আতংকিত হবার কিছু নেই,' আশ্বাস দিয়ে বললো ম্যালো-রি। 'আমার বিশ্বাস, ওরা নিরপেক্ষ, কারও সাতেও নেই পাঁচেও নেই। এসো, ভেতরে ঢোকা যাক। হাফ-ট্রাকের আওয়াজ পাচ্ছি।'

ভারি মেশিন-পিস্তলের বাঁট দিয়ে গোটা চারেক বাড়ি দিতেই শাটারের গায়ে ফাটল ধরলো। ফাটলটাকে বড় করতে অসুবিধে হলো না। ভেতরে হাত গলিয়ে হুড়কো খুলে ফেললো ম্যালোরি।

ঘরের ভেতর ঢুকে থামলো না ওরা। উল্টো দিকের দরজার দিকে যেতে যতটুকু সময় পাওয়া গেল তার মধ্যে দেখে নিল চারদিক। পাথরের দেয়ালে ঝাপসা হয়ে যাওয়া ধর্মীয় ম্যুরাল, কাপড় ঢাকা একটা টেবিল আর একটা আইকন চোখে পড়লো। ঘরের ভেতর ভ্যাপসা গন্ধ, অনেক দিন ব্যবহার না করলে যা হয়। দরজাটা খোলার সময় সম্ভাব্য সব রকম সাবধা-নতা অবলম্বন করলো ম্যালোরি। কোনো শব্দ না করে করিড়রে বেরিয়ে এলো ওরা। পিছনের ঝুল-বারান্দা হয়ে ওদের কাছে হাফ-ট্রাকের গর্জন ভেসে এলো। করিডর ধরে বাঁ দিকে ছুটলো ম্যালোরি, তাকে অনুসরণ করলো গ্রীণ। খানিক পর পর একটা করে কাঠের খিলান, আর ডান দিকে বড় বড় জানালা। জানালা দিয়ে তাকালেই আশ্রমের সামনের দিকের মস্ত চৌ-রাস্তা আর

উঠান দেখা যায়। করিডরের শেষ মাথায় সিঁড়ি। তরতর করে উঠতে শুরু করলো ওরা। দুই প্রস্থ সিঁড়ির ধাপ টপকে উঠে এল তিন তালায়। কোণা থেকে দু'দিকে এগিয়ে গেছে দু'টো করিডর। এখানেও ডান দিকে সার সার জানালা, তারই একটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ম্যালোরি।

বিশ সেকেণ্ড অপেক্ষা করার পর রাহাতের হাফ-ট্রাকটাকে দেখতে পেল ও। গেট ভেঙে উল্টোমুখো হয়ে উঠানের দিকে ছুটে আসছে। হাফ-ট্রাকের দিকে একবার মাত্র তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল ও। চোখ বুলালো উঠানের চারদিকের জানালা আর ঝুল-বারান্দাগুলোর ওপর। চৌ-রাস্তায় পৌঁছে এলো-পাতাড়ি চক্কর দিতে শুরু করলো মেজরের হাফ-ট্রাক। ম্যালোরির উল্টোদিকের একটা বারান্দায় কি যেন নড়ে উঠলো। ঝট্ করে তাকালো সে। শাটার খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এল একজন জার্মান সৈনিক। রেলিঙের ওপর ঝুঁকে নিচের চৌ-রাস্তার দিকে তাকালো সে। হাফ-ট্রাকের কাণ্ড দেখে মুহূর্তের জন্যে বোকা বনে গেল সে, কিন্তু পরক্ষণেই কাঁধ থেকে রাইফেল নামাতে শুরু করলো।

মেশিন-পিস্তলের ব্যারেল ঠুকে জানালার কাচ ভাঙলো ম্যালোরি। দেখলো, হাফ-ট্রাকের দিকে লক্ষ্যস্থির করছে জার্মান সৈনিকটা। গুলি করলো ম্যালোরি। যেন পাঁজরে গুঁতো খেয়ে শিরদাঁড়া বাঁকা হয়ে গেল লোকটার, বুক নাকি পেট ঠিক বুঝতে পারলো না ম্যালোরি, চেপে ধরে ঘুরে দাঁড়ালো সে, আস্তে আস্তে এগোলো-দরজার দিকে। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল ঘরের ভেতর। নিজের সাথে একটু কৌতুক করার জন্যেই দ্বিতীয় গুলিটা করতে

অযথা বেশি সময় নিল ম্যালোরি। লোকটা ঘরের ভেতর ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেছে, এই সময় আবার গুলি করলো সে। প্রথম কিছুই ঘটলো না। তারপর দোরগোড়ার কাছে মেঝেতে লোকটার মাথা দেখা গেল। নড়ছে না।

টপ-ফ্লোরের জানালায় আরেকজন জার্মান সৈনিককে দেখা যাচ্ছে। তার কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে আরেকজন। এবার ব্রাশ করলো ম্যালোরি। উত্তর এল উল্টোদিকের দোতালার একটা জানালা থেকে, ম্যালোরির সামনে জানালার কাচ চুরমার হয়ে গেল। ভাগ্যিস কার্ণিশের নিচে মাথা নামিয়ে রেখেছিল ও। মাথা তুলে উঁকি দিয়ে দেখলো, ওর গুলি খেয়ে জানালার গায়ে হেলান দিয়ে পড়েছে একজন জার্মান, দ্বিতীয় লোকটাকে কোথাও দেখা গেল না। গুলি তাকেও লেগেছে, জানে সে, কিন্তু জখমটা মারাত্মক কিনা বলা কঠিন, এই সময় প্রথম বারের মতো পাশের জানালা থেকে গর্জে উঠলো গ্রীণের মেশিন-পিস্তল।

পিছনে খসখসে আওয়াজ শুনে বিদ্যুৎ গতিতে ঘুরে দাঁড়ালো ম্যালোরি।

'না!' আঁতকে উঠে গুলি করতে নিষেধ করলো পাপাগোপালা।

'ভূত নাকি?' মুচকে হাসলো ম্যালোরি। 'এত তাড়াতাড়ি এলে কিভাবে?'

উত্তর দেবার সুযোগ হলো না পাপাগোপালার। ওর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে এল একটা হ্যাণ্ড গ্রেনেড, করিডরে পড়ে ড্রপ খেতে খেতে ছুটে গেল ম্যালোরি আর গ্রীণের দিকে।

বোধহয় পাপাগোপালার পিছু পিছু একজন জার্মান সিঁড়ির প্রথম ফ্লাইট পর্যন্ত উঠে এসে অপেক্ষা করছে, এটা তারই কাজ।

তিন তালার করিডরে আরও লোক আছে বুঝতে পেরে সিঁড়ির সবগুলো ধাপ টপকে করিডরে উঠে আসেনি সে।

এগিয়ে আসার গতি মন্থর হয়ে আসছে গ্রেনেডের। চট করে দু'পা এগিয়ে গ্রেনেডের পথে দাঁড়ালো ম্যালোরি। তারপর নাগালের মধ্যে চলে আসতেই সেটা লক্ষ্য করে পা ছুঁড়লো। লাথি খেয়ে ফিরতি পথে ছুটলো গ্রেনেড। লাফ দিল পাপাগোপালা, তার পায়ের নিচে দিয়ে বেরিয়ে গেল সেটা, সোজা গিয়ে পড়লো সিঁড়িতে।

বিস্ফোরণের আওয়াজ ভেসে এল দু'সেকেণ্ড পর। তারপর একজন আহত লোকের গোঙানি শোনা গেল। ছুটে সিঁড়ির মাথায় গিয়ে দাঁড়ালো ওরা। দেখলো, ল্যাণ্ডিঙে শুয়ে আছে লোকটা, নাক-মুখ দিয়ে হড় হড় করে রক্ত বেরিয়ে আসছে।

'পরের জন্যে কুঁয়ো খুঁড়লে এভাবেই পড়ে মরতে হয় নিজেকে!' দেশী একটা প্রবাদ আওড়ালো পাপাগোপালা। 'কিন্তু সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট, আরেকটু হলে আমার পায়ের নিচে ফাটতে যাচ্ছিলো ওটা!'

'ফাটতো না,' মাথা নেড়ে সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললো ম্যালোরি, 'আমি নিষেধ করে দিয়েছিলাম!'

চোদ্দ

গ্রাউণ্ড ফ্লোরের বারান্দার রেলিঙ একটাও আস্ত রাখলো না রাহাত। ক্যাটারপিলার ট্র্যাক দিয়ে এক এক করে সবগুলো ভাঙলো ও। হঠাৎ উপলব্ধি করলো, গোলাগুলির শব্দ থেমে গেছে। চালু গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে বনেটের ওপর পড়লো, সেখান থেকে ডিগবাজি খেয়ে রাস্তার কিনারায়। হাফ-ট্রাক দিব্যি এগিয়ে যাচ্ছে। হাসি পেল তার। দেখলো, বাঁকের কাছে পৌঁছে রাস্তা থেকে নেমে গেল গাড়ি। হেলে-দুলে উঠে পড়লো একটা বারন্দায়, হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো কাঠের ঘর। ঘরের ভেতর অর্ধেক ঢুকে থেমে গেল হাফ-ট্রাক। উঠানটার চারদিকে দ্রুত একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল ও। কেউ নেই কোথাও। চোখ ফিরিয়ে নেবে, এই সময় দোতালার একটা জানালা দিয়ে উঁকি দিতে দেখলো ম্যালোরিকে। চোখাচোখি হলো, কিন্তু দেরি না করে মাথাটা জানালার ভেতর আবার টেনে নিল সেকেণ্ড-লেফটেন্যান্ট।

আশ্রমের ভেতর ঢুকলো রাহাত। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে পাপাগোপালা, পাশে দাঁড়ানো একজন বৃদ্ধের দিকে রাহা-

তের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো সে। বুড়োর মাথার চুল ধবধবে সাদা, বুক পর্যন্ত লম্বা দাড়ি, তাও ধবধবে সাদা। চেহারায় সৌম্য একটা ভাব, কিন্তু তাঁকে খুব ক্লান্ত দেখালো। বয়স সত্তরের কম হবে না। পরে আছেন ঢোলা আলখেল্লা, মাথায় সাদা টুপি। বলে দিতে হলো না, ইনিই আশ্রমের গুরু। মনে আছে, ইনি ইংরেজী জানেন।

'দোতালায় ওঁর ঘরে আটকা পড়েছিলেন ইনি,' নিচু গলায় বললো পাপাগোপালা। গুরুর পিছনে, সিঁড়ির মাথায় দেখা গেল ম্যালোরিকে।

'তুমি কে?' রাহাতের দিকে এগিয়ে এলেন আচার্য। 'তোমাকে কোথায় দেখেছি বলো তো?'

'কয়েক বছর আগে এখানে একবার এসেছিলাম,' মৃদু কণ্ঠে বললো রাহাত। 'আমাকে আপনার মনে থাকার কথা নয়, কিন্তু আপনাকে আমার বেশ মনে আছে। কেমন আছেন, আচার্য?'

'ভালোই ছিলাম, কিন্তু ওরা আর ভাল থাকতে দিল কোথায়!' অসহায় দেখালো আচার্যকে।

প্রথম সুযোগেই কাজের কথা পাড়লো রাহাত। 'জার্মানরা এখানে মোট ক'জন বলতে পারেন?'

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন আচার্য। 'বারোজন। সিভিল ড্রেসে তিনটে গাড়িতে করে কাল এসেছে ওরা। আমাকে বললো...'

'প্লিজ, এক মিনিট,' আচার্যকে বাধা দিয়ে ম্যালোরির দিকে ফিরলো রাহাত। 'তোমারা ক'জনকে দেখেছো?'

'নয়,' বললো ম্যালোরি। 'গ্রীণকে সাথে নিয়ে সবগুলো ঘর

ঘুরে দেখেছি আমরা…'

'বাইরের পাহারাদারকে নিয়ে দশ হলো, গেটের মাথায় ছিল আরও একজন, এগারো, গেটের ভেতর দিকে ছিল…'

'নয়জন,' আবার বললো ম্যালোরি। 'ওদেরকে ধরেই গুণেছি আমি।'

'বাকি তিনজন আছে উত্তর দিকের টাওয়ারে,' নিজের বুকে ক্রশ চিহ্ন এঁকে বললেন আচার্য। ইউনিট কমাণ্ডার একজন ক্যাপ্টেন, নাম ব্রুন। দু'জন সঙ্গীকে নিয়ে বেশিরভাগ সময় ওখানেই কাটিয়েছে সে। টাওয়ারের ছাদে ওরা একটা অবজার্ভেশন পোস্ট মতো তৈরি করেছে, ওখান থেকে লক্ষ্য রাখছে মেইনল্যাণ্ড রোডের ওপর। ওদের কাছে টেলিস্কোপ, ওয়্যারলেস সেট আর একটা মর্টার আছে…'

'মর্টার!' মুখ তুলে সিঁড়ির মাথায় তাকালো রাহাত, অক্ষত কাঁধে মেশিন-পিস্তল ঝুলিয়ে নেমে আসছে গ্রীণ। প্রশ্নটা তাকেই করলো ও, 'টাওয়ারের ওপর মর্টার আছে, ওটা কি ডেস্ট্রয়ারের কোনো ক্ষতি করতে পারে?'

'মালভূমিতে আমরা যেমন দেখেছি, ওটা যদি একটা এইট-সি এম হয়, তাহলে খুব একটা ভয় নেই ডেস্ট্রয়ারের। রেঞ্জ ঠিক হতে হবে, মর্টার-ম্যানকে দক্ষ হতে হবে—অ্যালপেনকরপ্সের লোক যখন, দক্ষ হবেই। তবে ভাগ্যের সহায়তাও দরকার। ফানেলের ভেতর দিয়ে যদি বয়লার রূমে ফেলতে পারে গোলাটা, তাহলে ডেস্ট্রয়ারের কপাল মন্দ। টাটরার কি অবস্থা হয়েছিল সে তো আপনি নিজের চোখেই দেখেছেন।'

'ওখানে উঠতে হবে,' দ্রুত বললো রাহাত। ফিরলো পাপা-

গোপালার দিকে। 'নিয়ে চলো, কুইক!'

গলার সাথে লটকানো ক্রুশে বেঁধা যীশুর প্রতিকৃতি আঙ্গুল দিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন আচার্য, রাহাত থামতেই মুখ খুললেন তিনি, 'আমার একটা ছোট্ট অনুরোধ।'

'বলুন!' তাগাদা দিল রাহাত।

'এটা আশ্রম, এখানে আমি রক্তপাত আশা করিনি।' রাহাত কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন আচার্য। 'জানি, সব দোষ জার্মানদের। তারা আমার দেশে হামলা চালিয়েছে। ওদের অপরাধ সম্পর্কে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তবু আমি চাই আর রক্তপাত না ঘটিয়ে যদি পারা যায় ওদেরকে বরং আপনারা বন্দী করার চেষ্টা করুন। ক্যাপ্টেন ব্রুন আমার অফিসরূমে আছেন, চারতালায়—পাপা-গোপালা আপনাদেরকে নিয়ে যেতে পারবে। আমার মনে হয় টাওয়ারে নয়, ওই অফিসরূমেই তাকে পাওয়া যাবে

'সন্দেহ আছে, বিশেষ করে এত গোলাগুলির পর।' ভুরু কুঁচকে দু'সেকেণ্ড কিছু ভাবলো রাহাত। 'তবে, গোলাগুলি থামার পর আমাদের কাউকে উঠানে দেখা যায়নি, ক্যাপ্টেন ব্রুন হয়তো ভেবে নিয়েছে আমরা সবাই মারা গেছি।' আচার্যের দিকে ফিরলো ও। নরম সুরে তাঁকে বললো, 'আপনি আপনার কামরায় চলে যান, আচার্য। যাই ঘটুক না কেন, ওখান থেকে আপনি বেরোবেন না।' পাপাগোপালাকে অনুসরণ করে সবার সাথে সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে ও, ঘাড় ফিরিয়ে শেষ আরেকটা প্রশ্ন করলো আচার্যকে, 'এখানে আপনার যারা শিষ্য, তাদের খবর কি?'

'তাদের সবাইকে রিফেকটরিতে ভরে বাইরে থেকে তালা দিয়ে রাখা হয়েছে।' জানালার দিকে একটা হাত তুললেন আচার্য। উপাসনালয়টা দেখালেন তিনি।

'আপাততঃ ওখানেই থাকুন ওঁরা,' বললো রাহাত। 'আমরা চলে গেলেই নিজের ঘরে ফিরে যাবেন আপনি, প্লিজ।' আবার পাপাগোপালাকে অনুসরণ করলো ও।

ম্যালোরি বললো, 'আর মাত্র তিনজন বাকি থাকলে,কি হবে, ওদেরকে কাবু করা সহজ হবে না। ওরা সাবধান আর তৈরি হয়ে আছে।'

চারতালায় ওঠা পর্যন্ত কিছুই ঘটলো না। চারতালায় ওঠার পরপরই সবার আগে চলে এল রাহাত, তার এক পা পিছনেই পাপাগোপালা। ওরা টাওয়ারে পৌঁছুবার আগেই যদি মর্টারের রেঞ্জের মধ্যে চলে আসে ডেস্ট্রয়ার, তাহলেই সর্বনাশ! চিন্তাটা অস্থির করে তুলছে রাহাতকে। সিঁড়ির মাথায় উঠে থামলো ও, পিছনের ধাপে অপেক্ষা করছে বাকি সবাই। এই সময় পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। টপ ফ্লোরের করিডর ধরে এগিয়ে আসছে কেউ। পায়ের আওয়াজটা সিঁড়ির মাথার কাছে এল, কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে না নেমে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। রাহাতের পিছন পিছন করিডরে উঠলো সবাই।

নির্জন করিডর ডান দিকে চলে গেছে, বাঁ দিকে ছোট একটা প্যাসেজ। প্যাসেজের শেষ মাথায় লোহার পাত দিয়ে মোড়া একটা দরজা। নিশ্চয়ই ওই পথেই টাওয়ারে ওঠা যায়। কবাট দু'টো ভিড়ানো রয়েছে, কিন্তু দরজাটা খোলা। পা টিপে টিপে সেটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো রাহাত। কান পাতলো দরজার

গায়ে। কোনো শব্দ পেল না। এক চুল এক চুল করে ফাঁক করলো কবাট দু'টো। ভেতরে একটা পাথরের সিঁড়ি, ওপর দিকটা অন্ধকারে ঢাকা পড়ে আছে। ঠক্ ঠক্ করে কিছু ঠোকার আওয়াজ নেমে এল সেদিক থেকে। কেউ যেন সিগন্যাল দিল। ধাতুর সাথে ধাতুর ঘষা লাগলো, বোধহয় লোহার দরজা থেকে লোহার বোল্ট সরানো হলো। পাথরের সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ, বাকি ক'টা ধাপ টপকে কেউ যেন উঠে গেল। পরমুহূর্তে আবার ধাতুর সাথে ধাতুর আওয়াজ, লোকটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়ে ট্র্যাপ ডোর বন্ধ করে দেয়া হলো আবার।

'কে?' ফিসফিস করে জানতে চইলো পাপাগোপালা। ম্যালোরি আর গ্রীণ করিডরের ওপর নজর রাখছে।

ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ করে থাকার ইঙ্গিত করলো রাহাত। পাথরের সিঁড়ি বেয়ে ওপর দিকে উঠতে শুরু করলো ও। অন্ধকারে ধাপগুলো দেখা যায় না, স্পর্শ দিয়ে পথটা অনুভব করে এগোলো ও। ধাপগুলো অস্বাভাবিক সরু, দেয়ালগুলো কর্কশ। শক্ত কিছুর সাথে মাথা ঠেকতে বুঝলো, সিঁড়ির শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে সে। কয়েক ধাপ নেমে এসে টর্চ জ্বাললো ও। ট্র্যাপ-ডোরটা সাংঘাতিক মোটা কাঠের একটা তক্তা দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে, এমন আঁটসাঁট ভাবে ফিটিং করা যে ওপাশে দিনের আলোর ক্ষীণ আভাস পর্যন্ত পেল না ও। মনটা একটু দমে গেল। অত্যন্ত সাবধানে আবার নিচে নেমে এল ও।

'ট্র্যাপ-ডোর ভাঙা আমাদের সাধ্যের বাইরে,' ম্যালোরিকে বললো ও। 'গুলি করলেও কাজ হবে না। আমার সাথে চলো তুমি, ক্যাপ্টেন ব্রুনের কামরায় একবার ঢুঁ মারতে চাই। হঠাৎ

কি মনে করে টাওয়ারে গেল সে, জানতে ইচ্ছে করছে। যে গেল, ব্রুন ছাড়া আর কে হতে পারে? গ্রীণ, তুমি এখানেই অপেক্ষা করো, পাপাগোপালা নিচে যাওয়ার সিঁড়ির ওপর নজর রাখবে। কেউ যদি ওপরের সিঁড়ি বেয়ে টাওয়ার থেকে নামতে শুরু করে, পাপাগোপালার কাছে চলে এসো তুমি। আমাদের দু'জনের কথা তোমাদের ভাবতে হবে না।'

ভেতরে গার্ড থাকতে পারে, তাই আচার্যের অফিস কামরার দিকে সন্তর্পণে এগোলো ওরা দু'জন। খালি কামরা, কিন্তু টেবিলের ওপর ওয়্যারলেস ট্রান্সমিটারটাকে জ্যান্ত একটা প্রাণী বলে মনে হলো রাহাতের। সেটের পিছনে একজোড়া হেডফোন দেখা গেল, চেয়ারের কাছাকাছি। 'বোঝা গেল ব্যাপারটা।' বললো ও। 'এখান থেকে ব্রিজেলবার্ডের সাথে কথা বলছিল ক্যাপ্টেন। তার ধারণা আমরা সবাই মারা গেছি—দরজাটা পর্যন্ত বন্ধ করে যায়নি।'

'বন্ধ করা সম্ভব ছিল না,' সকৌতুকে রাহাতের ভুলটা ধরিয়ে দিল ম্যালোরি। 'দরজায় কী-হোল নেই। আপনার কি মনে হয় আবার ফিরে আসবে সে?' জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে সে, কিন্তু টাওয়ারের দেয়াল লেকের দিকটা সম্পূর্ণ আড়াল করে রেখেছে।

'আশা করি। টাওয়ারের ছাদে পৌঁছুতে না পারলে এত খাটনি কোনো কাজেই আসবে না। এখন যদি দশ কিলোগ্রাম ডিমোলিশন চার্জ পেতাম! ট্র্যাপ-ডোরের নিচে আটকে দিলে গোটা ছাদ নিচের লেকে ধসে পড়তো। ক্যাপ্টেন আবার নিচে নেমে এলে আমাদের টাওয়ারে ওঠার পথটা সুগম হয়। বোধহয়

আসবে। অন্তত হেডফোন জোড়ার পজিশন দেখে তাই মনে হচ্ছে।' বলে দেয়ালের গায়ে হেলান দিল রাহাত।

'আপনি ক্লান্ত, খানিকটা বিশ্রাম না নিলে আপনাকে আমরা আর কোনো কাজে হাত লাগাতে দেবো না,' জেদের সুরে বললো ম্যালোরি।

ঠিক হলো, সিঁড়ির ওপর নজর রাখবে গ্রীণ। টাওয়ারে উঠে যাবার সিঁড়ি-ঘরের বাইরে, দরজার দু'পাশে ওত পেতে থাকবে ম্যালোরি আর পাপাগোপালা। প্যাসেজের শেষ মাথায় হাতে ল্যুগার নিয়ে অপেক্ষা করবে রাহাত, যদি কোনো ইমার্জেন্সী দেখা দেয় তাহলে আলাদা কথা, তা না হলে নিজের জায়গা ছেড়ে নড়াচড়া করতে পারবে না ও। প্ল্যানটা ম্যালোরির, রাহাত সেটা অনুমোদনও করলো না, আপত্তিও জানালো না।

এক দুই করে বেশ কয়েক মিনিট কেটে গেল। টাওয়ারের সিঁড়ি-ঘর থেকে কেউ বেরিয়ে আসছে না। রাহাত ভাবলো, তবে কি ছাদ থেকে আর নিচে নামার কোনো ইচ্ছে নেই ক্যাপ্টেন ব্রুনের? আশ্রমে হামলা চালানো হয়েছে, ব্রিজেলবার্ডকে এই খবর দিয়ে ছাদে উঠেছে সে, এখন চৌ-রাস্তায় প্রথম হাফ-ট্রাক না দেখা পর্যন্ত ওখানেই হয়তো অপেক্ষা করবে। নাকি ডেস্ট্রয়া-রের সর্বশেষ পজিশন জানাবার জন্যে আর একবার নিচে নামবে সে?

ভোঁতা একটা আওয়াজ পাওয়া গেল সিঁড়ি-ঘর থেকে। ট্র্যাপ-ডোরটা এবার অত্যন্ত সাবধানে খোলা হলো। বন্ধ করার সময় প্রায় কোনো শব্দই হলো না। সিঁড়ি-ঘরের দরজার দিকে তাকালো রাহাত। দরজার এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে পাপাগো-

পালা, হাতে ছুরি। আরেক পাশে ম্যালোরি। দু'জনেই তৈরি হয়ে আছে। কিন্তু অনেকক্ষণ হয়ে গেল সিঁড়ি-ঘর থেকে আর কোনো শব্দ ভেসে আসছে না। ম্যালোরি একরকম ধরেই নিল, শুনতে ভুল করেছে সে। কিন্তু প্যাসেজের শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে পরিষ্কার অনুভব করছিল রাহাত, সিঁড়ি-ঘর থেকে বেরিয়ে আসার আগে কোনো শব্দ হয় কিনা শোনার জন্যে ভেতরে অপেক্ষা করছে ক্যাপ্টেন ব্রুন।

আরও কয়েক সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল। হঠাৎ পাথরের ওপর বুটের অস্পষ্ট আওয়াজ পেল ওরা। ভিড়ানো দরজার কবাট খুলে গেল। দরজা দিয়ে প্রথমে বেরোলো একটা মেশিন-পিস্তলের মাজল, তার পিছু পিছু প্যাসেজে বেরিয়ে এল অ্যালপেনকরপ্স্ ইউনিফর্ম পরা ক্যাপ্টেন। দু'হাত সামনে বাড়িয়ে তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লো ম্যালোরি, একই সাথে পাপাগোপালাও ছুরি চালালো তাকে লক্ষ্য করে। ক্যাপ্টেনের শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল দেখে নিজের অজান্তেই দ্রুত এক পা সামনে বাড়লো রাহাত। ম্যালোরির একটা হাত ক্যাপ্টেনের মুখ চেপে ধরলো, অপর হাতটা আঁকড়ে ধরলো তার কণ্ঠনালী। ডান হাতের প্রচণ্ড ঝটকায় গলা থেকে ম্যালোরির হাতটা সরিয়ে দিল ক্যাপ্টেন। ছুরি চালাতে ভুল করে ফেললো পাপাগোপালা, ক্যাপ্টেনের মেশিন-পিস্তলে লেগে পিছলে গেল সেটা। মেশিন-পিস্তলটা হাত থেকে পড়ে গেল বটে, কিন্তু ছুরির পাত ক্যাপ্টেনের গায়ে একটু আঁচড় পর্যন্ত কাটতে পারলো না। ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে ম্যালোরির তলপেটে ধাঁই করে গুঁতো দিল ক্যাপ্টেন। ছিটকে দেয়ালের গায়ে পড়লো সে। দ্রুত সামনে এগোলো পাপাগো-

পালা, ঘ্যাঁচ করে ক্যাপ্টেনের পিঠে সেঁধিয়ে দিল ছুরি। মুঠো পাকিয়ে ম্যালোরির মুখে ঘুসি মারতে যাচ্ছিলো ক্যাপ্টেন, হঠাৎ নেতিয়ে পড়লো সে, মুঠো পাকানো হাতটা ঝপ করে শরীরের পাশে নেমে এসে মরা সাপের মতো ঝুলতে লাগলো, আলগা হয়ে গেল মুঠো। এগিয়ে এসে তার পালস পরীক্ষা করলো রাহাত। নেই।

'আমি টাওয়ারে উঠছি,' সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে বললো ও। 'সিগন্যাল শুনে ওরা ভাববে কিছু একটা নিতে ভুলে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে ক্যাপ্টেন। ট্র্যাপ-ডোর যদি খোলাতে পারি, উঠে যাবো আমি, চেষ্টা করবো আবার যেন কেউ সেটা বন্ধ করতে না পারে। প্রথম সুযোগেই আমাকে অনুসরণ করবে পাপাগোপালা...'

সিঁড়ি-ঘরের ভেতর ঢুকে প্রথম ধাপে পা দিয়েছে রাহাত, হঠাৎ ঘুরে উঠলো মাথা। অসম্ভব ক্লান্ত আর অসুস্থ লাগলো নিজেকে। দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে অন্ধকারে বিশ সেকেণ্ড বিশ্রাম নিল ও। পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাপাগোপালা। ভাবলো, মেজর বোধহয় কিছু চিন্তা-ভাবনা করছেন। আগের চেয়ে একটু ভাল লাগছে অনুভব করে ধীরে ধীরে ধাপগুলো টপকালো রাহাত। কোটের পকেট থেকে ল্যুগারটা আগেই বের করে নিয়েছে ও। বাঁ হাত মাথার ওপর তুলে স্পর্শ করলো ট্র্যাপ-ডোর। তারপর নক করলো, ঠিক যেভাবে নক করেছিল ক্যাপ্টেন ব্রুন। তারপর আর কোনো আওয়াজ নেই। এক সময় মনে হলো, এতে কোনো কাজ হবে না। ক্যাপ্টেনের নক করার ভঙ্গিটা হয়তো যথেষ্ট নয়, হয়তো এক একবার এক এক রকম

আওয়াজ করে ক্যাপ্টেন। ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে রাহাত, এই সময় টের পেল, ট্র্যাপ-ডোরের বোল্ট সরানো হচ্ছে।

পনেরো

ধীরে ধীরে খুলে গেল ট্র্যাপ-ডোর, আলোকিত হয়ে উঠলো সিঁড়ি, কিন্তু কাউকে দেখতে না পাওয়ায় গুলি করার সুযোগ হলো না রাহাতের। মাথার ওপর ফাঁকটা যথেষ্ট বড় হতে বাকি ধাপ ক'টা ছুটে পেরোতে শুরু করলো ও। ফাঁকের ভেতর মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছে, এই সময় টের পেল, ট্র্যাপটা খোলা হয়েছে ওর পিছন দিক থেকে, লোকটাকে দেখতে পাচ্ছে না ও। ছাদে পা দিয়ে ঘুরতে গেল, খানিকটা ঘুরলোও, কিন্তু তারপরই আবার চক্কর দিয়ে উঠলো মাথা। নিজেকে দিকভ্রান্ত লাগলো ওর, হাঁটু গেড়ে বসে থাকা জার্মান করপোরাল ট্র্যাপ-ডোর বন্ধ করে বোল্ট লাগাচ্ছে দেখেও ল্যুগার তুলে গুলি করতে পারলো না। নিচের সিঁড়ি থেকে খোলা ট্র্যাপ-ডোরের কিনারা ধরার জন্যে মাথার ওপর হাত তুলতে যাচ্ছিলো পাপাগোপালা, এই সময় সেটা বন্ধ হয়ে গেল। টাওয়ারের ছাদে একা হয়ে গেল রাহাত।

বোল্ট লাগানো শেষ করে হাঁটুর পাশে মেঝেতে পড়ে থাকা পিস্তলের দিকে হাত বাড়ালো করপোরাল। হয় এখুনি, তা না

হলে আর সময় পাওয়া যাবে না, বুঝতে পেরে ল্যুগার ধরা হাতটা তুলতে চেষ্টা করলো রাহাত। পরমুহূর্তে আবিষ্কার করলো, মাথা ঘুরছে বলে পরিমিতি জ্ঞান কাজ করছে না তার, ল্যুগার ধরা হাতটা যতটুকু দরকার তারচেয়ে অনেক বেশি ওপরে তুলে ফেলেছে সে। ভুলটা সংশোধন করার সময় নেই, বুঝতে পেরে মাথার কাছ থেকে ল্যুগারটা করপোরালের দিকে ছুঁড়ে দিল ও। ধাঁই করে করপোরালের চাঁদিতে বাড়ি খেলো পিস্তল, কাত হয়ে এক পাশে পড়ে গেল লোকটা। চোখ দু'টো আকাশের দিকে খোলা, শরীরটা নিথর।

টাওয়ারের ছাদে পা দিয়েই দ্বিতীয় জার্মান সৈনিককে পাঁচিলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল রাহাত। সামনের দিকে ঝুঁকে তেপায়ার ওপর ফিট করা অত্যন্ত শক্তিশালী একটা ফিল্ড-টেলিস্কোপে চোখ রেখে গালফের দিকে তাকিয়ে ছিল সে। তার পাশে মর্টারটাকেও দেখেছিল ও, চওড়া আর ভারি একটা তেপায়ার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, পাশেই ভোঁতা চেহারার এক গাদা শেল। লম্বায় যত না, তার তুলনায় চওড়ায় অনেক বেশি লোকটা, খোলা শার্টের ভেতর বুকের পেশী আর ঘন লোম দেখা যাচ্ছিলো। পিছনে আওয়াজ শুনে সিধে হয়ে দাঁড়ালো সে, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই নিঃসাড় পড়ে থাকা সঙ্গী এবং রাহাতকে দেখতে পেল। বিস্ময়ের ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে এক সেকেণ্ডও লাগলো না তার। ঝট্ করে হাঁটু গাড়লো মেঝেতে, পাশে পড়ে থাকা ক্যানভাসের নিচে হাত গলিয়ে দিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ততার সাথে কি যেন হাতড়াতে শুরু করলো। জিনিসটা কি বুঝতে অসুবিধে হলো না রাহাতের, কিন্তু লক্ষ্য করলো ক্যানভাসের তলা থেকে মেশিন-পিস্তলটা বের

করতে পারছে না লোকটা, কিসের সাথে যেন আটকে গেছে সেটা।

কিন্তু আটকে থাকলো না। লোকটাকে লক্ষ্য করে লাফ দিয়েছে রাহাত, এই সময় ক্যানভাসের তলা থেকে মেশিন-পিস্তল বেরিয়ে এল। মেঝে থেকে হাঁটু না তুলেই শরীরটাকে ঘুরিয়ে নিতে চেষ্টা করলো লোকটা, মেশিন-পিস্তলের ট্রিগারে চেপে বসছে আঙ্গুল। ব্যারেলটা ওর দিকে সিধে হবার আগেই সেটা মুঠোর মধ্যে পেয়ে গেল রাহাত। জার্মান সৈনিক আশা করলো, টান দিয়ে ওটা তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হবে, কিন্তু তা না করে মেশিন-পিস্তলটা সামনের দিকে ঠেলে দিল রাহাত। তাল হারিয়ে ফেললো লোকটা, হাত থেকে ছুটে গেল মেশিন-পিস্তল। হয় ডিগবাজি খেতো সে, না হয় তার ঘাড় মটকে যেত, কিন্তু দু'টোর কোনোটাই ঘটলো না। শেষ মুহূর্তে কনুই দু'টো মেঝেতে বাধিয়ে দিয়ে পতনটা যতটুকু পারলো সামলালো। মাথা এখনও ঘুরছে রাহাতের, তার সাথে যোগ হয়েছে নতুন উপসর্গ—বমি বমি ভাব। এই সময় একটা ভুল করে বসলো ও। সময় আছে মনে করে কেড়ে নেয়া মেশিন-পিস্তলটা ঘুরিয়ে সিধে করে নিতে চেষ্টা করলো। কাজটা শেষ করতে পারেনি, এরই মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়লো জার্মান লোকটা, হাত দু'টো বিদ্যুৎ গতিতে বাড়িয়ে দিল ওর গলার দিকে। ধস্তাধস্তির মধ্যে পিছিয়ে গেল রাহাত, পিঠ ঠেকলো কোমর সমান উঁচু টাওয়ারের পাঁচিলে। দু'টো শরীরের মাঝখানে পড়ে গেছে মেশিন-পিস্তল ধরা হাতটা, কাজেই গুলি করার কোনো সুযোগ পেল না। ইস্পাতের মতো শক্ত দু'টো হাত ওর গলা টিপে ধরেছে।

পাঁচিলের কিনারা ছাড়িয়ে নিচের দিকে বাঁকা হয়ে যাচ্ছে ওর শরীর। রাহাতের চেয়ে ইঞ্চি কয়েক ছোট হলে কি হবে, জার্মান সৈনিক সম্পূর্ণ সুস্থ এবং রীতিমত শক্তিশালী, রাহাত তার সাথে পেরে উঠছে না। পাঁচিলের কিনারা ছুরির ধারালো পাতের মতো ডেবে যাচ্ছে গায়ে, অসহ্য ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখছে রাহাত। একটু অক্সিজেনের জন্যে ছটফট করছে ফুসফুস, কিন্তু সরবরাহ নেই। পাঁচিলের মাথা থেকে অপর দিকে পড়ে যেতে শুরু করলো শরীর। আতংকে বিকৃত হয়ে উঠলো রাহাতের চেহারা।

শত্রুর কোনো আশা নেই, নেতিয়ে পড়েছে সে, পাঁচিলের মাথা থেকে নিচের লেকে তাকে ফেলে দিতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না বুঝতে পেরে মেশিন-পিস্তলের ব্যাপারে মাথা ঘামালো না জার্মান লোকটা। রাহাতের গলার ওপর হাতের চাপ আরও বাড়ালো সে। চোখের সামনে দেখতে পেল, শত্রুর মুখের রঙ বদলে যাচ্ছে।

ধস্তাধস্তি না করে শরীরটাকে একটু ঢিল করে দিল রাহাত, কিন্তু মেশিন-পিস্তলটা দুই শরীরের মাঝখানে সামান্য যেটুকু আটকে আছে বের করার জন্যে টানাটানি শুরু করলো। কয়েক সেকেণ্ড চেষ্টা করার পর সফল হলো বটে, কিন্তু এখনও সেটা ব্যবহার করার সুযোগ হলো না। এখন যদি জার্মান লোকটা রাহাতের শরীরের ওপর চাপ বজায় রাখে, অনায়াসে পাঁচিল থেকে অপর দিকে ফেলে দিতে পারে ওকে। হঠাৎ মেশিন-পিস্তলটা রাহাতের হাতে দেখতে পেয়ে সব গোলমাল হয়ে গেল তার। রাহাতের গলা থেকে ডান হাতটা নামিয়ে ছোঁ দিল সেটা ধরার জন্যে। মুঠোর ভেতর একবার নিতে পারলে রাহাতের সাধ্য নেই

নিজের দখলে রাখে ওটা। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাত থেকে সেটা ছেড়ে দিল ও। কিনারা থেকে নিচের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল মেশিন-পিস্তল।

প্রচণ্ড রাগে অন্ধ হয়ে গেল জার্মান সৈনিক। হাঁটু ভাঁজ করে ডান পা ওপরে তুললো সে, তারপর বুটটা সজোরে নামিয়ে দিল রাহাতের পায়ের পাতার ওপর। তীব্র ব্যথাটা ইলেকট্রিক শকের মতো ছড়িয়ে পড়লো রাহাতের সারা শরীরে। সাথে সাথে উন্মত্ত হয়ে উঠলো রাহাত। ডান হাত তুলে লোকটার মাথার চুল খামচে ধরলো ও। চুলের গোছা চার আঙুলে জড়িয়ে নিয়ে একপাশে টানতে শুরু করলো সমস্ত শক্তি দিয়ে। মনে হলো, গোড়া থেকে উঠে আসবে ওগুলো। গলার ওপর বুড়ো আঙুলের চাপ কমে গেল, তারপর একেবারেই থাকলো না। ফুসফুস ভরে ঠাণ্ডা পাহাড়ী বাতাস নিল রাহাত। জানে, এক সেকেণ্ডের মধ্যে নিজেকে সামলে নেবে শত্রু। চুল ছেড়ে দিয়ে হাতটা মুঠো পাকালো ও। তারপর জার্মানের মুখ এদিকে ফিরতেই ঘুসি চালালো। এটা আশা করেনি লোকটা। মুখ বাঁচাবার জন্যে দ্রুত পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করলো সে, কিন্তু মেঝেটা ওখানে হঠাৎ উঁচু হতে শুরু করায় তাতে পা বেধে গিয়ে টালমাটাল অবস্থা হলো তার। পতনটা ঠেকাবার চেষ্টা করছে, এই সময় মাথা নিচু করে ধেয়ে এল রাহাত। ডান কাঁধ দিয়ে লোকটার পেটে প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিল ও। ছাদের ওপর দিয়ে প্রায় উড়ে যাবার ভঙ্গিতে পিছিয়ে যাচ্ছে লোকটা, তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে টেলিস্কোপের তেপায়ার সাথে হোঁচট খেলো রাহাত। তেপায়া থেকে উল্টে গিয়ে গড়িয়ে দূরে সরে যেতে শুরু করলো টেলিস্কোপ। হোঁচট খেয়ে

পড়ে গেল রাহাত। উঠে দাঁড়াবার জন্যে হামাগুড়ি দেবার পজি-শনে পৌঁচেছে, এই সময় দেখলো, পাঁচিলের মাথায় কনুই বাধিয়ে পিছু হটার গতিটা ঠেকিয়ে দিয়েছে শত্রু। হামাগুড়ি দেয়া অব-স্থায় থেকে তার ডান পায়ের গোড়ালি আঁকড়ে ধরলো রাহাত, তারপর সেটা ওপর দিকে তুলতে চেষ্টা করলো। এই সময় আরেকটা ভুল করলো জার্মান সৈনিক। পেটে কাঁধের ধাক্কা এখ-নও সামলে উঠতে পারেনি সে, এই অবস্থায় রাহাতের মুখে লাথি মারার জন্যে অপর পা তুললো সে।

মেঝেতে হাঁটু গেড়ে শরীরটাকে উঁচু করলো রাহাত, সেই সাথে উঁচু করতে লাগলো দুই হাতে ধরা জার্মানের পা। পাঁচি-লের মাথায় কোমর দিয়ে রয়েছে লোকটা, পিঠ আর মাথা কিনারা ছাড়িয়ে চলে গেছে শূন্যে। মুক্ত পা এবার ছাদ থেকে উঠে গেল। বোকার মতো পা ছুঁড়তে শুরু করলো লোকটা, কাজেই রাহাতকে শুধু উঠে দাঁড়াবার সাথে সাথে তার ডান পা ছেড়ে দিতে হলো। ছেড়ে দিতেই কিনারা থেকে নিচের দিকে পড়ে গেল লোকটা। তীক্ষ্ণ আর্তনাদের আওয়াজটা ক্রমশ নিচের দিকে নেমে যেতে শুরু করলো। পাঁচিলে পেট ঠেকিয়ে নিচের দিকে ঝুঁকে রাহাত দেখলো, লেকের দিকে অর্ধেকের বেশি দূরত্ব পেরিয়ে গেছে জার্মান সৈনিক। কয়েকশো ফিট নিচে লেকের বরফে পড়লো সে।

পাঁচিলের মাথা ধরে টাল সামলে নিয়ে ট্র্যাপ-ডোরের দিকে এগোলো রাহাত। মাঝপথে একটা নোট-বুকের ওপর পা পড়লো। ঘাড় ফিরিয়ে সেটার দিকে একবার তাকালো ও। দেখলো, নোট-বুক খুলে গেছে। মেইনল্যাণ্ডের সাপ্লাই রোডে

মিত্রপক্ষের আসা-যাওয়া রেকর্ড করা হয়েছে ওতে। ট্র্যাপ-ডোরের বোল্ট খুলে দিয়ে পিছিয়ে এল রাহাত। নিচের সিঁড়ি থেকে ট্র্যাপের ঢাকনিটা সরিয়ে মাথা তুললো পাপাগোপালা। থরথর করে কেঁপে উঠে ছাদের ওপর রাহাতকে বসে পড়তে দেখলো সে। ট্র্যাপ-ডোর থেকে তাড়াতাড়ি উঠে এগোলো রাহাতের দিকে। তার পিছু পিছু উঠে এল ম্যালোরি আর গ্রীণ।

'আরেকজন কোথায়?' অজ্ঞান করপোরালকে দেখে জানতে চাইলো ম্যালোরি।

পাপাগোপালার বাড়ানো হাত ঠেলে সরিয়ে দিয়ে জোর করে একটু হাসলো রাহাত। 'লেকে,' বলে উঠে দাঁড়ালো সে। ওদের দিকে পিছন ফিরে পাঁচিলের মাথায় হাত রেখে তাকালো নিচের দিকে। 'এদিকে এসো। প্রায় পৌঁছে গেছে ব্রিজেল-বার্ড।'

লেকের ওপর দিয়ে অনেক দুর চলে এসেছে জার্মান বাহিনী। ছয়টা হাফ-ট্রাক দেখলো ওরা, পাশাপাশি এগিয়ে আসছে, কিন্তু পরস্পরের কাছ থেকে অনেক দুরে সরে থাকায় ছড়ানো একটা ঝাঁকের মতো লাগছে। দুর থেকে ওগুলোকে খেলনা গাড়ির মতো লাগছে দেখতে। হাফ-ট্রাকের পিছু পিছু আসছে অ্যালপেন-করপ্স্ আর ছত্রী-বাহিনী, পায়ে হেঁটে। আরও পিছনে লেকের তীর থেকে নেমে আসছে বেশ কয়েকটা হাফ-ট্রাক, এগুলোয় ড্রাইভার ছাড়া আর কোনো আরোহী নেই। সামনের গাড়ি-গুলো বরফে ফাটল তৈরি করতে পারে, তাতে পিছনের গাড়ি পড়লেও বেশি লোক যাতে আহত না হয় তারই জন্যে এই

ব্যবস্থা করেছে ব্রিজেলবার্ড। কয়েকটা হালকা অ্যাক-অ্যাক গান আর সেভেনটি-ফাইভ মাউন্টেন হাউইটজার হাফ-ট্রাক থেকে নামিয়ে চড়িয়ে দেয়া হয়েছে সৈনিকদের কাঁধে, দু'জন লোক এক-টা করে কামান বয়ে নিয়ে আসছে। রাহাত লক্ষ্য করলো, যেখানে কামান রয়েছে তার থেকে অন্য সৈনিকরা দূরে সরে আছে, বরফে যদি ফাটল দেখা দেয় এই ভয়ে। এখনও জার্মানরা অনেক-টা দূরে বলে টাওয়ারের মাথায় কোনো শব্দ ভেসে আসছে না। পাশে দাঁড়ানো গ্রীণের দিকে ফিরলো রাহাত।

'কোনো উপায় আছে, গ্রীণ, দাগা যায় কামান? এটা তো একটা এইট-সিএম, তাই না?'

'ওদের পায়ের তলার বরফ ভাঙতে চান আপনি, এই তো?' জিজ্ঞেস করলো গ্রীণ। তারপর নিজেই বললো, 'জানি না। তবে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। এই কাঁধ নিয়ে আমি তো আর শেল ভরতে পারবো না।' ম্যালোরির দিকে ফিরলো সে, দেখলো, ডান হাতের শুশ্রূষা করছে সেকেণ্ড-লেফটেন্যান্ট। 'উনিও পার-বেন না। আর সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় কাঁধে আঘাত পেয়েছে আপনার নাড়ু গোপাল। বাকি থাকলেন একা আপনি।'

'পারবো।' আবার সাগরের দিকে ফিরলো রাহাত। কোর্স বদলে সরাসরি কেপের দিকে এগিয়ে আসছে ডেস্ট্রয়ার। লোক-জন নামাবার জন্যে মিনিট কয়েকের মধ্যেই পাহাড়ের আড়ালে চলে যাবে ওটা। ব্রিজেলবার্ড যদি আশ্রমে পৌঁছুতে পারে, এক ঢিলে দু'টো পাখি মারবে সে। মেইনল্যাণ্ড রোডের ওপর যারা আসা-যাওয়া করবে তাদের মাথার ওপর ছড়ি তো ঘোরাবেই, সেই সাথে ডেস্ট্রয়ারের লোকেরা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠতে

শুরু করলে তাদেরকেও নিশ্চিহ্ন করার আনন্দ উপভোগ করবে। ভোঁতা চেহারার শেলগুলো গুণলো ও। ত্রিশটা বোমা। মনটা একটু দমে গেল, ত্রিশটা গোলা মোটেও যথেষ্ট নয়। শেষ আধ-পোড়া চুরুটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে গ্রীণের দিকে তাকালো সে। এই মুহূর্তে তাকেই সবচেয়ে শান্ত আর ঠাণ্ডা দেখাচ্ছে। প্যারাপেটের পাশে দাঁড়িয়ে বাতাসের গতিবেগ আর প্রবাহের দিক নির্ণয় করার চেষ্টা করছে সে। তাকিয়ে আছে ম্লান সূর্যের দিকে। দূরত্ব, গোলার সম্ভাব্য পথ, ইত্যাদিরও একটা অংক কষে নিচ্ছে সে। এই ফাঁকে স্কার্ফ দিয়ে একটা স্লিং তৈরি করতে ম্যালোরিকে সাহায্য করলো রাহাত। জার্মান বাহিনীর ওপর ওরা দু'জনেই তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। দূরত্বের দুই তৃতীয়াংশ পেরিয়ে এসেছে সামনের হাফ-ট্রাকগুলো আসছে সোজাসুজি রাস্তার দিকে, যেটা ক্রমশ ওপর দিকে উঠে আশ্রমে চলে এসেছে। এত-ক্ষণে ভোঁতা, অস্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে ওরা। বরফের ওপর ঘুরছে ক্যাটারপিলার ট্র্যাক।

'ও নিশ্চয়ই ব্রিজেলবার্ড—ওই যে, কারে।' স্লিং পরীক্ষা করে লেকের দিকে তাকিয়ে বললো ম্যালোরি। তার দৃষ্টি অনু-সরণ করে গ্লাসের ফোকাস অ্যাডজাস্ট করলো রাহাত।

ভোঁতা, বিদঘুটে চেহারার হুড খোলা একটা গাড়ি বরফের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। উল্টোদিকের তীর আর প্রথম সারির হাফ-ট্রাকগুলোর মাঝখানে চলে এসেছে সেটা। পাঁচিল থেকে নেমে মর্টারের দিকে এগোলো গ্রীণ, বললো, 'দেখে মনে হচ্ছে ওটা একটা কিউবেলওয়াগেন। গ্লাইডারে করে কত-কি-ই না এনেছে ব্যাটারা! মেজর, আমাকে সাহায্য করুন,

প্লিজ।'

প্রথম কাজ, সাগরের দিক থেকে মর্টারের মাজল লেকের দিকে ফেরাতে হবে। সেটা সহজেই সারা গেল। অনেক কষ্টে মর্টারের একটা গোলা হাতে তুলে নিল গ্রীণ, ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিল কি করতে হবে রাহাতকে। 'তিনটে জিনিস মনে রাখলেই চলবে। ব্যারেলের ভেতর বোমা ভরার সময় নাকটা আগে ঢোকাবেন না। ওটাকে পিছলে ঢুকে যেতে দিন, ঠেলে দেবেন না। তারপর যদি বোমাটাকে ধরে রাখার দরকার হয়, বেরিয়ে আসার রাস্তা থেকে হাত ছু'টোকে দূরে সরিয়ে রাখুন।'

ব্যারেলের ভেতর গোলাটা ভরে দেখিয়েও দিল গ্রীণ। তারপর বললো, 'এরপর যা করার আপনাকেই করতে হবে। কি ঘটছে না ঘটছে দেখার জন্যে পাঁচিলের ওপর থাকতে হবে আমাকে।'

'পাহাড়ের ওপর দিয়েও আসছে ওরা!' চিৎকার করে বললো ম্যালোরি। রাহাতের কাছ থেকে মলোকিউলার গ্লাসটা চেয়ে নিয়ে সে তাকিয়ে ছিল ঝুল-পাথর ছাড়িয়ে আরও দূরে। ট্যাকটিশিয়ান হিসেবে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্যে চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখছে না কর্নেল ব্রিজেলবার্ড। তার ফোর্সের বেশির ভাগটাই লেকের ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছে, কিন্তু সেই সাথে খোদ মাউন্ট জার্ভোসের নিচেকার ঢাল বেয়ে ছু'সারি সৈনিক ওপর দিকে এরই মধ্যে উঠতে শুরু করেছে। ওরা স্কি ট্রুপসের লোক, আরেক পথ দিয়ে আশ্রমে আসতে চাইছে। সারি ছু'টোকে ঢাল বেয়ে উঠতে দেখে, স্কি-বাহিনীর সম্ভাব্য পথটা অনুমান করতে অসুবিধে হলো না রাহাতের। পানির কিনারা থেকে খাড়াভাবে ঝুল-পাথরটা উঠে আড়াল করে রেখেছে লেকের দক্ষিণ তীর, কিন্তু

স্কি-ট্রুপ ঝুল-পাথরকে ছাড়িয়ে আরও উঁচুতে উঠে যেতে পারে, তারপর ওরা ঝুল-পাথরের ওপরের পাহাড়ী ঢাল বেয়ে এমন এক পর্যায়ে চলে আসবে যেখান থেকে স্কির সাহায্যে নিচের দিকে নেমে পৌঁছে যাবে একেবারে আশ্রমের গোড়ায়। ঝুল-পাথরের মাথার ওপর বরফ মোড়া পাহাড়ী ঢালটাকে পেট-ফোলা পোয়াতীর মতো লাগলো দেখতে। রাহাতের মতো পাপাগোপালা স্কি-ট্রুপের সম্ভাব্য পথটা অনুমান করতে পারলো।

বললো, 'শুধু সাবধান হলে চলবে না, ওই পথে আসতে হলে ভাগ্যেরও সহায়তা দরকার হবে ওদের।'

'কেন?'

'আড়মোড়া ভাঙার সময় হয়ে গেছে পাহাড়ের।'

'ধস নামবে? হিমবাহ?'

'হ্যাঁ।'

'তা নিয়ে পরে ভাবলেও চলবে।'

পাঁচিলে উঠে টার্গেট দেখে এল গ্রীণ, মর্টারের অ্যাঙ্গেল অব ফায়ার অ্যাডজাস্ট করে আবার উঠলো পাঁচিলে। গোলা ছোঁড়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে রাহাত। টার্গেট দেখার জন্যে সে-ও একবার উঠলো পাঁচিলে। সামনের সারি হাফ-ট্রাকের দিকে এগিয়ে আসছে কিউবেলওয়াগেন, পথে দু'এক সেকেণ্ডের জন্যে থামছে—বোঝা যায়, সৈনিকদের সাথে কথা বলছে ব্রিজেলবার্ড। প্রথম সারির ছ'টা হাফ-ট্রাক ইতিমধ্যে চার ভাগের তিন ভাগ দূরত্ব পেরিয়ে এসেছে, কয়েক মিনিটের মধ্যে শক্ত রাস্তায় উঠে আসবে ওগুলো। পোড়া চুরুটটা ধরাতে গিয়েও ক্ষান্ত হলো রাহাত, চোখে ধোঁয়া লাগতে পারে। মর্টারের কাছে ফিরে

এল ও। কোটের গায়ে হাত দু'টো ঘষে মুছে নিল ভাল করে। তারপর প্রথম বোমাটা তুলে নেবার জন্যে ঝুঁকে পড়লো ক্যানভাসের ওপর।

প্যারাপেটের পাশে পজিশন নিয়েছে গ্রীণ। ম্যালোরি আর পাপাগোপ লাকে সাবধান করে দিল সে, ওরা যেন যে যার কোণ ছেড়ে না নড়ে।

উত্তর-পূব কোণে রয়েছে ম্যালোরি, ওখান থেকে লেকের সবটা দেখতে পাচ্ছে সে। কয়েক সেকেণ্ড পরই প্রথম বোমা ছুটলো। প্রথমে উঠে গেল সেটা, প্রতি মুহূর্তে ছোট থেকে আরও ছোট হতে লাগলো, তারপর নামতে শুরু করলো। এক সময় কালো একটা বিন্দুর মতো দেখালো সেটাকে। দাঁতে দাঁত চেপে সেটার পতন চাক্ষুষ করলো ম্যালোরি। সামনের সারির হাফ-ট্রাকগুলোর সামনে পড়লো বোমাটা। খানিকটা বরফ ছড়িয়ে পড়তে দেখলো ও। কিন্তু তারপর আর কিছু ঘটলো না। এক, দুই, তিন—পাঁচ সেকেণ্ড অপেক্ষা করলো ওরা, তবু কিছু ঘটলো না। ঝট্ করে গ্রীণের দিকে তাকালো ও।

গ্রীণের চেহারায় কোনো ভাবান্তর নেই।

'ফাটেনি,' তিক্ত কণ্ঠে বললো ম্যালোরি।

'সেজন্যে আমাকে বা আমার বউ-ছেলে-মেয়ের কাউকে দায়ী করা যায় না,' কৌতুকে বললো গ্রীণ। রাহাতের দিকে ফিরলো সে। 'ওটা একটা নষ্ট শেল। আশা করি সবগুলো নষ্ট নয়। শুনেছি, জার্মান ফ্যাক্টরীতে ব্যাপক হারে অন্তর্ঘাতের কাজ চালানো হয়েছে। সেগুলোই যদি আমাদের কপালে পড়ে থাকে···রেডি?'

ঘাড় ঝাঁকিয়ে সায় দিল রাহাত। তার হাতে এরই মধ্যে উঠে

এসেছে আরেকটা তাজা বোমা।

'ফায়ার!'

মর্টারের মাজল থেকে বেরিয়ে গেল দ্বিতীয় বোমা, ছোট হতে হতে আলপিনের মাথার আকৃতি পেল সেটা। আগেরটার কাছেই পড়লো, পরমুহূর্তে শোনা গেল বিস্ফোরণের আওয়াজ। চারদিকে তুষার ছড়িয়ে পড়তে দেখলো ওরা, কিন্তু নিরেট বরফের কোনো ক্ষতি হয়নি। এতোই কি শক্ত যে কামানের গোলা ঢুকতে পারছে না বরফের ভেতর? ম্যালোরির চেহারায় হতাশা ফুটে উঠলো।

'ফায়ার!'

মর্টারের মাজল নতুন করে অ্যাডজাস্ট করার জন্যে পাঁচিল থেকে নেমে গিয়েছিল গ্রীণ, ফিরে এসে ফায়ার করতে বললো। তিন নম্বর গোলাটাও সামনের সারি হাফ-ট্রাকগুলোর নাকের ডগায় পড়লো। প্রায় একই সাথে বিস্ফোরিত হলো বোমা আর তুষার। টলমল করে উঠলো তিনটে হাফ-ট্রাক। কালো, মোটা একটা রেখা ফুটে উঠলো বরফের গায়ে।

'ফাটল ধরেছে!' উল্লাসে নাচতে শুরু করেই থেমে গেল পাপাগোপালা। খুনের নেশা জ্বলজ্বল করছে তার চোখে। লেকের ওপর শত্রুরা কিভাবে মারা যাচ্ছে দেখতে পেয়ে চেহারায় নিষ্ঠুর একটা ভাব ফুটে উঠলো।

মোটা, কালো ফাটল থেকে উথলে উঠছে পানি। ফাটলের নিচে ডেবে যাচ্ছে হাফ-ট্রাকগুলো।

'ফায়ার!'

এবারের বোমা ফাটলটাকে আরও বড় হতে সাহায্য করলো। প্রায় একই সাথে ফাটলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল তিনটে হাফ-

ট্রাক। বরফের নিচে থেকে বেরিয়ে আসছে এটা যেন নতুন আরেক-টা তরল লেক। বেরিয়ে আসছে, দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। পাপাগোপালা বলেছিল, পঞ্চাশ মিটার গভীর, মনে পঁড়লো ম্যালোরির। কিছু বেশিও হতে পারে। তারমানে একশো পঞ্চাশ ফিট হিম-শীতল পানির নিচে নেমে যাচ্ছে হাফ-ট্রাক-গুলো।

মর্টারের কাছে চলে এল গ্রীণ। আবার সামান্য রি-অ্যাড-জাস্টমেন্টের কাজ সেরে ছুটে ফিরে এল পাঁচিলের ওপর।

'ফায়ার!'

মর্টারের ব্যারেলে নতুন বোমা ভরলো রাহাত। পাঁচ নম্বর গোলা জার্ভোসের কাছাকাছি বাকি তিনটে হাফ-ট্রাকের মাঝ-খানে পড়লো। বিস্ফোরিত হলো তুষার। টাওয়ার থেকে ওরা ভোঁতা আওয়াজ শুনতে পেল। পরমুহূর্তে বিরাট একটা এলাকা নিয়ে ফাটতে শুরু করলো বরফ। অবাক চোখে ম্যালোরি দেখ-লো, চারদিকে পানি নিয়ে বরফের প্রকাণ্ড এক টুকরো লেকের মাঝখানে ভাসছে। ছোট একটা দ্বীপের মতো লাগলো ওটাকে। তার ওপর হাফ-ট্রাকগুলো রয়েছে, পিছনে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে একদল অ্যালপেনকরপ্স্ সৈনিক। খুব জোর হলে দশ সেকেণ্ড টিকলো দ্বীপটা, তারপরই চারদিক থেকে ছুটে এল ফাটল, টুকরো টুকরো হয়ে তলিয়ে গেল পানির নিচে। লেকের তলায় পৌঁছুতে হবে না ওদের, ভাবলো ম্যালোরি, তার আগেই মারা যাবে সবাই।

'ফায়ার!'

পরের গোলাটা ডান দিক ঘেঁষে ল্যাণ্ড করলো নিরেট বর-

ফের ওপর। ওদিক রয়েছে অ্যালপেনকরপ্স্ সৈনিকের দল। ভূতে পাওয়া মানুষের মতো ছুটোছুটি শুরু করেছে তারা। কিন্তু পালাবে কোথায়! যেদিকে ছোটে সেদিক থেকেই এগিয়ে আসছে নতুন নতুন ফাটল। গোটা লেক আলোড়িত হতে শুরু করলো। বোমা বিস্ফোরণের সাথে ওদের কানে ভেসে এল বরফ ভাঙার আওয়াজ, সে-ও অনেকটা ভোঁতা বিস্ফোরণের মতো শোনাচ্ছে। আগের চেয়ে ঘন ঘন গোলা ছুঁড়তে শুরু করলো রাহাত। দর-দর করে ঘামছে সে।

'ফায়ার!'

শুরুতেই মনে হলো, আগেরগুলোকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে গিয়ে পড়বে গোলাটা। চোখের ওপর মনোকিউলার গ্লাসটা আরও জোরে চেপে ধরলো ম্যালোরি। কিউবেলওয়াগেনটা সঁ্যাৎ করে কাছে চলে এল। দুপ করে গোলা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনলো সে। তুষার কণার পাহাড় মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো ব্রিজেলবার্ডের গাড়ির পিছনে। মুহূর্তের জন্যে সাদা কণায় ঢাকা পড়ে গেল গাড়িটা। তারপর সরে যেতে শুরু করলো সেগুলো। কিন্তু গাড়িটাকে আগের জায়গায় দেখলো না ম্যালোরি। ওখানে থইথই করছে পানি। নতুন ফাটলগুলো এগিয়ে এল আশ্রমের রাস্তার দিকে। রাস্তা থেকে একশো গজ দূরে থাকতে থেমে গেল ফাটলের গতি, কারণ এদিকে আর বরফ নেই, টলমল করছে কালো পানি।

'ফায়ার!'

ইতিমধ্যে আবার মর্টারের ব্যারেল অ্যাডজাস্ট করেছে গ্রীণ। লেকের পুব তীরের দিকে ছুটে গেল গোলাটা। পিছনের হাফ-

ট্রাক আর সৈনিকরা প্রাণ হাতে নিয়ে তীরের দিকে ছুটছে, তাদের মাঝখানে গিয়ে বিস্ফোরিত হলো বোমা। চোখের পলকে একজোড়া মাউন্টেন গান অদৃশ্য হয়ে গেল।

'ফায়ার!'

লক্ষ্য ব্যর্থ হলো এবার, পানিতে পড়ে ডুবে গেল বোমাটা।

'ফায়ার!'

ঝুল-পাথরের দিকে ছুটে আসছে জার্মান সৈনিকরা, তাদের সামনের পথে পড়লো গোলা। আরও সামনে, কয়েকজন নাছোড়-বান্দা জার্মান সৈনিক ক্লাইম্বিং রোপ ছুঁড়ে ঝুল-পাথরের খাড়া গায়ে হুক আটকে নিয়েছে। গোলা বৃষ্টির কবল থেকে বাঁচার জন্যে রশি ধরে ঝুলে পড়ছে তারা। তুষার-মোড়া রাস্তার দিকে তাকালো গ্রীণ, রাস্তার নিচে লেকের ওপর এখনও নিরেট বরফের একটা বর্ডার দেখা যাচ্ছে ওদিকে। কোণঠাসা হয়ে পড়ে কয়েক দল সৈনিক আর একটা হাফ-ট্রাক ছুটছে সেদিকে।

পাঁচিল থেকে নেমে মর্টারের রেঞ্জ অ্যাডজাস্ট করলো গ্রীণ, তারপর আবার পাঁচিলে ফিরে এসে নির্দেশ দিল, 'ফায়ার!'

মনোকিউলার গ্লাস নামিয়ে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ রগড়াতে শুরু করলো ম্যালোরি।

'ফায়ার!'

'ফায়ার!'

'ফায়ার!'

পর পর ক'টা গোলা ছুটলো গুণতে ভুলে গেল ম্যালোরি, আবার যখন চোখে গ্লাস তুললো সে, লেকের দৃশ্য দেখে থ হয়ে গেল। খানিক আগে লেকটা ছিল সাদা, এখন সেটা কালো হয়ে

গেছে। চারদিকে শুধু পানি আর পানি। এখানে সেখানে বরফের টুকরো ভাসছে বটে, কিন্তু সেগুলোকে এখন আর সাদা দেখাচ্ছে না, কালো পানির গায়ে রূপোর মতো লাগছে। লেকের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় বড় এক টুকরো বরফ ভাসছে এখনও, তাতে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কিছু সৈনিক।

'ফায়ার!'

বরফের টুকরোটা চৌচির হয়ে গেল, ধরাশায়ী সৈনিকগুলো গড়িয়ে পড়ে গেল পানিতে। দশ-বারোজন লোক ঝুল-পাথর বেয়ে ধীরে ধীরে ওপর দিকে উঠছে শুধু, গোটা লেকে আর কোনো জার্মান সৈনিক নেই।

'খুব দেখিয়েছেন, স্যার।' পাঁচিল থেকে একগাল হেসে বললো গ্রীণ। 'গোলন্দাজ-বাহিনীতে আপনার পদোন্নতি ঠেকায় কে!'

হেসে উঠে রাহাত বললো, 'নিজের কৃতিত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপাবার বদভ্যাস ত্যাগ করো, বুঝলে!'

ক্যানভাসের ওপর পড়ে আছে আর মাত্র তিনটে গোলা, এই সময় ম্যালোরি বললো, 'বিপদ কিন্তু কাটেনি!'

ম্যালোরির দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালো গ্রীণ আর পাপাগোশালা। ঝুল-পাথরের মাথায় অনেক পিছনে, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসছে স্কি-বাহিনী। খানিক আগে পর্যন্ত সবার মনোযোগ যখন লেকের ওপর ছিল, গোলা ছোঁড়ার ফাঁকে সারাক্ষণ স্কি-বাহিনীর দিকে একটা চোখ রেখেছিল রাহাত। পাহাড়ের এক পাশের গায়ের ওপর দিয়ে মোচড় খেয়ে নেমে এসেছে ঢাল, তার ওপর দেখা গেল ওদেরকে। পরস্পরের কাছ থেকে অনেক

দূরে ওরা, তবে পাশাপাশি একই লাইনে রয়েছে। সামনের লোকটা টাওয়ার থেকে মাইল খানেক কিংবা তারও বেশি দূরে। প্রতি মুহূর্তে আশ্রমের আরও কাছে চলে আসছে দলটা। নিজের কোণ থেকে বেরিয়ে এসে রাহাতের একটা কনুই চেপে ধরলো পাপাগোপালা। 'স্যার, বরফ ধসিয়ে দিন! চমৎকার একটা সুযোগ আছে···কালো গর্তটা দেখতে পাচ্ছেন?'

'ওটা একটা গভীর ফাটল বা খাদ,' বললো ম্যালোরি। 'ছায়া পড়েছে বলে অমন কালো লাগছে দেখতে। কিন্তু ওখানে কেন গোলা ছুঁড়তে বলছো, পাপাগোপালা?' এরই মধ্যে মর্টারের কাছে ফিরে এসেছে রাহাত। কামানের পজিশন বদল করার জন্যে গ্রীনকে সাহায্য করছে। ক্যানভাস থেকে শেষ তিনটে বোমার একটা তুলে নিল ও। পাহাড়ী ঢালের ওপর চোখ রেখে মর্টারের রেঞ্জ অ্যাডজাস্ট করলো গ্রীণ।

'কারণ,' ব্যাখ্যা করলো পাপাগোপালা, 'অস্ট্রেলিয়ান-স্কিম্যান ওখান থেকেই হিমবাহের সূচনা ঘটিয়েছিল। আমরা তাকে পই পই করে বারণ করি, ওদিকে যেও না, কিন্তু হতভাগা লোকটা আমাদের কথা শুনে হাসলো। এই ছাদে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম আমি। ওই গর্তের ওপর দিয়ে নামতে শুরু করলো সে. অমনি শুরু হলো তুষার-ধস। চোখের পলকে জ্যান্ত হয়ে উঠেছিল গোটা পাহাড়।'

'চেষ্টা করে দেখতে আপত্তি কি, গ্রীণ?' জিজ্ঞেস করলো রাহাত। ওরা যেভাবে ছড়ানো অবস্থায় এগোচ্ছে, এক একজনকে ঘায়েল করতে কয়েক ডজন করে বোমা লাগবে।'

নতুন করে মর্টার অ্যাডজাস্ট করলো গ্রীণ। তারপর মাথা

ঝাঁকিয়ে বললো, 'ঠিক আছে।'

পাহাড়ের ঢাল টাওয়ার ছাড়িয়ে ওপরে উঠেছে, তাই গোলার পতনটা এবার দেখতে পেল রাহাত। ফাটলের বেশ খানিক ওপরে বরফের গায়ে লাগলো গোলা।

'দুত্তোরি!' এই প্রথম নিজের ওপর বিরক্তি প্রকাশ করলো গ্রীণ। অ্যাডজাস্টমেন্টে ভুল থেকে যাওয়ায় লক্ষ্য ব্যর্থ হয়েছে। গম্ভীর দেখালো তাকে। হাতে আর মাত্র দু'টো বোমা। একটা তুললো রাহাত। রেঞ্জ অ্যাডজাস্ট করে একপাশে সরে দাঁড়ালো গ্রীণ। 'ফায়ার!'

ছুটলো দ্বিতীয় গোলা। ফাটলের নিচে পড়লো সেটা। স্কি-বাহিনীর কোনো ক্ষতি হলো না, যেমন নামছিল তেমনি নেমে আসতে লাগলো তারা, শুধু একটু দিক বদল করতে হলো। তুষারের ধস নামার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে রাহাতের দিকে তাকালো গ্রীণ।

'বারবার তিন বার!' তাকে উৎসাহ দেবার জন্যে বললো রাহাত। কিন্তু স্টাফ-সার্জেন্টকে সন্দিহান দেখালো। একবার বেশি ওপরে হয়ে গেল, একবার বেশি নিচে। অথচ হাতে আর মাত্র একটা গোলা আছে। কাজেই এটাকে দু'টো বোমার মাঝ-খানে ফেলতে হবে, ফাটলের একেবারে ভেতরে। বড় করে শ্বাস টেনে মর্টারের ব্যারেল অ্যাডজাস্ট করলো সে। তারপর রাহাতের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকালো।

মনে হলো ফাটলের ভেতরই ঢুকে যাবে গোলাটা, কিন্তু তা গেল না। ফাটলের কিনারায় পড়লো সেটা। টাওয়ারের ছাদে পিন-পতন স্তব্ধতা। এক চুল নড়লো না কেউ। ওদের পিছনে

সাগরে শুধু পানি আর ঢেউ, পাহাড়ের আড়ালে পড়ে গেছে ডেস্ট্রয়ার। নিচে লেক, শান্ত এবং নিষ্প্রাণ। সামনে ঝুল-পাথরের মাথা ছাড়িয়ে আকাশের দিকে উঠে গেছে মাউন্ট জার্ভোস। মর্টা-রের মাজল হাঁ করে চেয়ে আছে আকাশের দিকে, ওটা এখন আর কোনো কাজেই লাগবে না। বাতিল লোহা-লক্কড়ের মতো টাওয়ারের ছাদ থেকে ফেলে দেয়া হবে, যাতে অ্যালপেনকরপ্স্ সৈনিকরা কখনও ওটা ব্যবহার করতে না পারে। হয়তো কল্পনা, কিন্তু রাহাতের মনে হলো দ্রুত ছুটে আসা স্থির শাঁ শাঁ আও-য়াজ শুনতে পেল ও। চোখের কোণে কি যেন নড়ে উঠলো। চোখ পিট পিট করে ভাল করে তাকালো আবার। কই! এতক্ষণ তাকিয়েছিল ফাটলটার দিকে, এখন সেটাকে ছাড়িয়ে আরও অনেক ওপরে, সেই শৃঙ্গের কাছাকাছি চলে গেছে দৃষ্টি। ওখানেই কি যেন একটা নড়ে উঠেছিল।

ওই আবার! মনে হলো, তুষারের বিশাল একটা অংশ একটু নড়েই আবার স্থির হয়ে গেল। চোখের ভুল? হাত দিয়ে চোখ রগড়ে আবার তাকালো ও। চূড়ার কাছে এক জায়গার তুষার ঝাঁকি খেলো, কিন্তু এতোই সামান্য আর ক্ষণস্থায়ী যে ভাল করে দেখতে পাবার আগেই আবার স্থির হয়ে গেল সব। তারপর ভোজবাজির মতো ভেতর থেকে কিসের যেন চাপ খেয়ে ফুলে উঠলো তুষার। লম্বায় সেটা বাড়তে লাগলো। একশো ফিট, একশো গজ, কয়েকশো গজ, একমাইল! ফুলে ওঠা তুষারের ঢেউ, নামতে শুরু করলো নিচের দিকে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে থাকলো সবাই। যত নামছে ততোই ফুলে উঠছে ঢেউটা। এই সময় ভোঁতা একটা গমগমে আওয়াজ ঢুকলো ওদের কানে।

গুরু গম্ভীর হয়ে উঠতে লাগলো সেটা। যেন আয়োজন করে মেঘ ডাকছে। চূড়ার কাছ থেকে কয়েকশো ফিট নিচের ঢাল ধীর, অলস ভঙ্গিতে নিচের দিকে ধসে পড়ছে। প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসের মতো নেমে আসছে নিচের ঢালে, জার্মান স্কি-বাহিনীর ওপর।

শেষ মুহূর্তে দিগ্বিদিক পালাবার চেষ্টা করলো তারা। কেউ স্কি ছুটিয়ে নামতে শুরু করলো নিচের দিকে, কেউ ছুটে এল ঝুল-পাথরের দিকে। একদল নাছোড়বান্দা জার্মান সৈনিকের সাথে পাল্লা নিয়ে ছুটে আসছে পাহাড়ী তুষার-ধস। বিশৃংখল পিঁপড়েদের মতো লাগলো লোকগুলোকে। এই সময় পৌঁছে গেল ঢেউ। ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল ওরা। তুষারের নিচে চাপা পড়লো কেউ কেউ। ভারি তুষারের ঢেউ কয়েকজনকে ঠেলে নিয়ে এল নিচের দিকে। যারা চাপা পড়লো, তাদেরকে আর দেখা গেল না। ঝুল-পাথরের কাছাকাছি সরে এসেছে তিনজন সৈনিক। এখনও তারা আশা ছাড়েনি। নিচে ঝুল-পাথরের কিনারা, ওখান থেকে ঝপ করে লেকে নেমে গেছে পাথরের গা। তিন-জনের মধ্যে একজন একেবারে কিনারায় পৌঁছে গেছে। হঠাৎ স্কি থামিয়ে কাঁধ থেকে এক ঝটকায় রাইফেল নামালো সে। লক্ষ্য-স্থির করলো, তরপর টিপে দিল ট্রিগার। ঝুল-পাথরের মাথা ছাড়িয়ে ঢালের দিকে তাকিয়েছিল রাহাত। বুলেটের ধাক্কায় ছিটকে পড়লো ও। জ্ঞান হারালো মেঝেতে পড়ার আগেই।

ষোলো

অস্ট্রেলিয়ান ডাক্তার পৌঁছুবার আগেই একবার জ্ঞান ফিরে এসেছিল রাহাতের। মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে, তারপর আবার বেহুঁশ হয়ে যায় ও। ডাক্তার পৌঁছুলো কয়েক ঘন্টা পর। মেজর রাহাতের ঘুম ভেঙে যেতে পারে মনে করে ডাক্তার ওকে ঘুম পাড়ানিয়া ইঞ্জেকশন দেয়। বেশ কড়া ডোজের ইঞ্জেকশন, ঘন্টা কয়েকের মধ্যে ওর ঘুম ভাঙার কথা নয়। কিন্তু ওর সামলে ওঠার ক্ষমতা সম্পর্কে ডাক্তারের কোনো ধারণা ছিল না, থাকলে আরও অনেক কড়া ডোজের ওষুধ দিত। শুধু অসময়ে নয়, বিপজ্জনক মুহূর্তে ঘুম ভেঙে গেল রাহাতের। স্ট্রেচারে শুইয়ে সরু পায়ে চলা পাহাড়ী পথ দিয়ে নিচের কেপ জার্ভোসে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে, এই সময়।

ঘুম ভাঙতেই বুঝতে পারলো রাহাত, স্ট্রেচারের সাথে তার হাত-পা বেঁধে রাখা হয়েছে, নড়াচড়া করবে সে উপায় নেই। চোখ দু'টো সামান্য একটু মেলে যা দেখলো, কাঁপুনি ধরে গেল বুকের ভেতর। পথটা এতোই সরু যে সবচেয়ে বোকা খচ্চরটিও

এটা দিয়ে হাঁটতে রাজি হবে না। খাড়া পাহাড়ের গা থেকে রাস্তাটা এঁকেবেঁকে নেমে গেছে কেপের গোড়ায়, যেখানে মিত্র-পক্ষের সৈনিকরা ল্যাণ্ড করেছে।

রোদ ঝলমলে সকাল, গাঢ় নীল আকাশ, কুয়াশা বা তুষারের কণামাত্র নেই কোথাও। আধবোঁজা চোখে নিচের দৃশ্য পরিষ্কার দেখতে পেল রাহাত। উপলব্ধি করতে দেরি হলো না, ওর জীবন-মৃত্যু নির্ভর করছে দুই জোড়া হাতের ওপর। স্ট্রেচারের সামনের হাতল দু'টো ধরে আছে একজোড়া, পিছনের দু'টো ধরে আছে আরেক জোড়া। স্ট্রেচারটা প্রায় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী ঝুঁকে আছে নিচের দিকে। একে বিপজ্জনকভাবে সরু, তার ওপর এঁকেবেঁকে নেমে গেছে পথটা, অত্যন্ত সাবধানে এগোতে হচ্ছে লোকগুলোকে। পা ফেলতে ভুল করার কোনো অবকাশ নেই। পাশেই কিনারা, পা পিছলালে সোজা নেমে যেতে হবে কয়েকশো গজ নিচের সাগরে। উঁকি দিতে হলো না, কিনারাটা এতোই কাছে যে তাকা-তেই নিচের সাগর দেখতে পেল রাহাত। পাহাড়ের গা পেঁচিয়ে থাকা পথের একটা অংশও চোখে পড়লো। নিজের অজান্তেই শিউরে উঠে চোখ বুজলো ও।

ওর ঘুম ভেঙে গেছে বুঝতে পারলে বাহকরা বিচলিত বোধ করতে পারে, সেটা যদি এই পরিস্থিতিতে বিপদ ডেকে আনে তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কাজেই চোখ দু'টো আর খুলবে না বলে ঠিক করলো রাহাত। ম্যালোরির কথাগুলো মনে পড়ে গেল ওর। প্রথমবার যখন ওর জ্ঞান ফিরে এল, ম্যালোরিকে পাশেই দেখেছিল ও। 'গুলিটা আপনার কাঁধে লেগেছে···ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে সেটা আমরা বের করে ফেলেছি, স্যার,···কিছু-

ক্ষণের মধ্যে পৌঁছে যাবে ডাক্তার···কোনো ভয় নেই···ওরা আপনাকে এথেন্সে নিয়ে যাবে···'

আজ কি বার? ক'তারিখ? অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারলো না রাহাত। ম্যালোরির মুখে শোনা আরও অনেক কথা মনে আসছে। 'ডাক্তার পৌঁছায়নি, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান সৈনিকরা সাথে একটা পঁচিশ পাউণ্ডার কামান নিয়ে এসেছে। জোড়া লাগানোও হয়ে গেছে সেটা। জার্ভোস এখন সম্পূর্ণ আমাদের দখলে।'

'ওরা খবর পেল কিভাবে?' জানতে চেয়েছিল রাহাত।

'টাটরাকে চুরমার হতে দেখে ওরা ধরে নেয় সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে। কাটায়রার আকাশ ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে যেতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয় ওরা। সৈন্য ভর্তি ডেস্ট্রয়ার ছুটে আসে ··'

একটা জার্মান চুরুট পেলে হতো, ভাবলো রাহাত। পিছনের লোকটা হঠাৎ হোঁচট খেলো, টলমল করে উঠলো স্ট্রেচার। পায়ের আওয়াজে বোঝা যাচ্ছে, ওদের পেছন পেছন আরও কয়েকজন নামছে নিচে। ওদের মধ্যে একজন পাপাগোপালো হলে ভাল হতো। কিন্তু সেকি আর আশ্রম ছেড়ে নামবে!

নামার পথে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলো না। ম্যালোরির সাথে কথা হয়েছে ওর, যেখানেই থাকুক তারা, যোগাযোগ রাখবে। তাকে স্বাধীন ভারতে বেড়িয়ে যাবার আগাম আমন্ত্রণ জানিয়েছে রাহাত। বিদায়ের মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছে বুঝতে পেরে ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েছিল সেকেণ্ড-লেফটেন্যান্ট। রাহাতের হাত ধরে ভারি গলায় শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানিয়েছে সে। ছেলেমানুষ, ভাবলো রাহাত। চোখে পানি এসে গিয়েছিল।

কোনো কারণ নেই, তবু। কিন্তু ঠিক উল্টো আচরণ করেছে স্টাফ-সার্জেন্ট। রাহাতের রোগ-মুক্তি কামনা করার সময়ও কৌতুক করতে ছাড়েনি সে।

'আপনার নেতৃত্ব পেয়েছিলাম বলেই এ-যাত্রা বেঁচে গেলাম, স্যার,' বলেছে সে। 'সেজন্যেই কেউ যদি কৃতজ্ঞ হয় তো সে আমার বউ-ছেলে মেয়েরা। আমার কথা যদি বলেন, ধন্যবাদ জানিয়ে আপনাকে আমি ছোট করতে চাই না, স্যার। কারণ, আপনি এমনিতেই বেশ ছোটখাটো।'

কাঁধের ব্যথায় অস্থির হয়ে ছিল রাহাত, তবু গ্রীণের রসিকতায় না হেসে পারেনি।

সামনে জেটি। পাঁচিলের পাশে নামানো হলো স্ট্রেচার। এতক্ষণে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘুম থেকে জাগলো রাহাত। চোখ জোড়া পুরোপুরি মেলে সামনে তাকালো ও। একটা লঞ্চ অপেক্ষা করছে ওর জন্যে, ডেস্ট্রয়ারে নিয়ে যাবে ওকে। মাথা তুলে ঘাড় বাঁকা করে পিছন দিকে তাকালো রাহাত। ঠিক পিছনেই ডাকাতের চেহারা দেখতে পেল ও। চোখাচোখি হতে একগাল হাসলো পাপাগোপালা। 'আপনার সাথে এথেন্সে যাচ্ছি, মেজর,' বললো সে। 'এবার আর ওরা আমাকে আর্মিতে না নিয়ে পারবে না। তাই না?'

মৃদু হাসলো রাহাত, কাত হয়ে শুয়ে চোখ বুজলো।

সেই সাথে ফুরোলো আমার গল্প।

লাগলো কেমন?

শেষ

আলোচনা

[এই বিভাগে রহস্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, প্রশ্ন, মতামত, নিজের কোনো রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক (jokes) ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্টকার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে—দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি দেবেন না। প্রকাশযোগ্য চিঠি দিন, ছাপা হবে। —কা. আ. হোসেন।]

জিল্লুল হক টিটু
C-২২, বি. ও. এফ. ঢাকা।

কৌতুক

ঝগড়ার ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা বন্ধ। একদিন স্বামীর সকাল ৭টায় জরুরী প্রয়োজন থাকায় তিনি একটা চিরকুটে 'সকাল ৭টায় জাগিয়ে দিও' লিখে স্ত্রীর বালিশের তলায় রেখে

ঘুমিয়ে পড়লেন। সকাল ৯টায় ঘুম থেকে উঠে স্বামী রেগে-মেগে স্ত্রীর দিকে কটমট করে তাকালেন। পরে বালিশের কাছে দেখলেন একটা চিরকুটে লেখা "৭টা বেজে গেছে, উঠে পড়"। স্বামীর চক্ষু তো চড়ক গাছ।

শাজাহান রেজা
থানাপাড়া, কুষ্টিয়া।

আলোচনার চিঠি নির্বাচনের সময়, মনে করুন একই প্রেরকের দুইটা চিঠি পেলেন। এবং দু'টোই প্রকাশযোগ্য। সেক্ষেত্রে কি করবেন? দু'টোরই জবাব দিবেন? নাকি একটা দিবেন, আর একটা "আউট" লেখা বাক্সে ফেলে দিবেন?

তাছাড়া, একই খামের ভিতরে দু'টো কাগজে ভিন্ন ভিন্ন দু'টো প্রশ্ন যদি পাঠানো হয়, তার মধ্যে অন্তত একটা যদি প্রকাশ-যোগ্য হয়, তাহলে কি জবাব দিবেন?

০ একটা ছাপা হবে।

ইশরাত নাসরীন সোনিয়া
৬-বি, ৮-২, মিরপুর, ঢাকা।

আমার খারাপ লাগে—যখন আপনি একখণ্ড বই প্রকাশ করে দ্বিতীয়টি প্রকাশ না করেই অন্য বইয়ে হাত লাগান।

আমার খারাপ লাগে—যখন আপনি দুর্ধর্ষ মাসুদ রানাকে উপস্থিত করেন নির্জীব পশুর মতো। যার কিছুই করার থাকে না কাহিনীতে।

আমার খারাপ লাগে—রানার প্রিয়তমা সোহানাকে অব-হেলা করে শুধুমাত্র রূপাকেই রানার সঙ্গিনী করা হয় যখন।

আমার খারাপ লাগে—তখন, যখন মাসুদ রানার একান্ত

সুহৃদ গিলটি মিঞা এবং সোহেলকে আপনি গায়েব করে রাখেন।

আমার খারাপ লাগে—আপনার মতো লেখক যখন বাজে কাহিনী নিয়ে বই লেখেন। যেমন লাল পাহাড়, পিশাচ দ্বীপ, জিম্মি ইত্যাদি। অথচ পাঠক-পাঠিকারা রানাকে পেতে চায় দুর্গম দুর্গ, শত্রু ভয়ঙ্কর, টার্গেট নাইন-এর মতো অ্যাকশনপূর্ণ বইতে।

আমার খারাপ লাগে—যখন আপনার কাছে পর পর অনেকগুলি চিঠি দিয়েও প্রাপ্তি স্বীকার পর্যন্ত করা হয় না।

সোহেল অমিতাভ বাবুল
"জোয়ারদার বাড়ী," রানাখড়িয়া, তালবাড়িয়া, কুষ্টিয়া।

বই-এর বাজার নিশ্চিত করার জন্য অ্যামেরিকায় যেমন "ক্রেডিট কন্ট্রোল ব্যুরো" আছে। তেমনি আমাদের দেশেও কি আছে?

০ নেই।

মিজান পাপ্পু জাহাঙ্গীর
মিরপুর, ঢাকা।

কৌতুক

দাঁড়ি বিভ্রাট

ওগো,

সারাটি জীবন শুধু বিদেশেই কাটাইলে এই ছিল। তোমার কপালে আমার পা। আরও ফুলিয়া উঠিয়াছে উঠানটা। জলে ডুবিয়া গিয়াছে ছোট খোকা। স্কুলে যাইতে চায় না ছাগলটা। শুধু ঘাস খাইয়া ঝিমাইতেছে তোমার বাবা। পেটের অসুখে ভুগিতেছে বাগানটা। আমে ভরিয়া গিয়াছে ঘরের ছাদ। স্থানে স্থানে ফুটা হইয়া গিয়াছে গাভীর পেট। দেখিয়া মনে হয় বাচ্চা

দিবে করিমের বাপ। রোজ আধসের দুধ দেয় বড় বউ। রান্না করিতে গিয়া হাত পোড়াইয়া ফেলিয়াছে কুকুর ছানাটা। সারা-দিন লেজ নাড়িয়া খেলা করে বড় খোকা। দাড়ি কাটিতে গিয়া গাল কাটিয়া ফেলিয়াছে নুরীর মা। প্রসব বেদনায় ছটফট করি-তেছে নুরীর বাপ। বার বার ফিট হইয়া যাইতেছে ডাক্তার। সাহেব আসিয়া দেখিয়া গিয়াছেন। এমতাবস্থায় তুমি অবশ্য বাড়ি আসিবে না। আসিলে অত্যন্ত দুঃখিত হইব। ইতি—

তোমার স্ত্রী

জি, এইচ, হাবীব খোকন
সেকশন নং-১০, মীরপুর, ঢাকা-১৬।

প্রতিশোধ সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় এর চেয়ে লাল পাহাড় অনেক ভাল। আরেকটি কথা না বলে পারছি না। সেটা হলো 'তুষার যাত্রার' পর থেকে 'রানা' আর আকৃষ্ট করতে পারছে না। মাঝখানে একটু ভাল লেগেছিল 'নিরাপদ কারাগার' এবং 'হামলা'। বর্তমান অবস্থা আবার তথৈবচ।

আমার প্রশ্ন কেন আর আকৃষ্ট করতে পারছে না রানা? কি ছিল রানার আগের বইগুলোতে? উত্তরটা আমিই দিই।

রাহাত খানের কক্ষে ঢোকার পূর্ব মূহূর্তে রানার বুক ঢিব ঢিবা-নী, ঢোকার পরে শ্রদ্ধা এবং ভয় মিশ্রিত অবস্থা এবং বেরোবার পরের হাঁফ ছাড়া অবস্থা—এই তিনের অপূর্ব সমন্বয় আজকাল ফেরারী।

কারও কাছে রাহাত খানের মুখ নিঃসৃত প্রশংসা যখন রানা শুনে ফেলে এবং ভেতরে ঢুকে বকা খায় ও পরে মুচকি হাসে তখন যে অপূর্ব এক শিহরণ বয়ে যায় শরীরে তার বিন্দু মাত্র যদি

আপনি উপলব্ধি করতে পারতেন তবে আমার বিশ্বাস 'রানা' সিরিজের এ দুর্দশা ঘটতো না।

এরপর আসে গিলটি মিঞা, হ্যাঁ সেই বত্রিশ বছর ৩৭৯-এর লাইনে থাকার চরিত্র গিলটি মিঞা। যার অভাব পলে পলে দগ্ধ করছে প্রতিটি রানা ভক্তকে। পপিতে রানার প্রতি ওর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা মেশানো কথাগুলো আজও আমার মনে হয় কেউই বিস্মৃত হয়নি। কারণ এসব ভুলবার নয়। 'হাইজ্যাকে'র পর তাকে যে কে হাইজ্যাক করলো বুঝতে পারছি না। তবে এর পেছনে আপনার হাত যে সক্রিয় ভাবে কাজ করছে তা বুঝতে পারছি। যাই হোক আশা করছি আপনার কাছে ব্যাপারটা খোলাসা হয়েছে যে কোথায় গলদ।

o মতামত প্রকাশের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

মোস্তাক আহমদ
বি. এ. ডি. সি. ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

সশ্রদ্ধ সালাম ও আন্তরিক শুভকামনা জানবেন। ষাটের দশকে ধ্বংস পাহাড় আর ভারত নাট্যম দিয়ে শুরু করে মেজর রাহাত পর্যন্ত সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে মাসুদ রানার জয়যাত্রা বজায় রয়েছে। ভক্ত পাঠকদের বৈচিত্র্যের স্বাদ আর আপনার যাদুকরী লেখনী দিয়ে মুগ্ধ করে রেখেছেন এ যাবৎ। কাঁচা পাকা ভুরুর সিংহ হৃদয় কঠোর মানবের দ্বারা সংঘটিত অ্যাকশনগুলো শুনাতে চলেছেন এখন—আপনাকে ধন্যবাদ। মাসুদ রানা হাতে পেলে রাতের ঘুম হারাম হয়ে যায়…। সেবা প্রকাশনীর অন্যান্য বইগুলোও বৈচিত্র্য, ঘটনাক্রম ও নতুনত্বের আঙ্গিকে অপূর্ব।

রানাকে কিন্তু "ডিউক"-এর সজ্জায় মানায় বলে আমার মনে

হয় না। ভেবে দেখতে অনুরোধ জানাচ্ছি। শিকার কাহিনীর আর কোনো বই ইদানীং বেরোবে কি?

০ মতমাতের জন্য ধন্যবাদ। শিকার কাহিনী খুব শীঘ্রি বেরোচ্ছে না।

হাফেজ কাশেম "হাজেক" (ভুতি)
প্রধান তাহফিজুল কোরান, হোয়াইক্যং, টেক্নাফ, কক্সবাজার।

বছর দুই আগে সর্বনাশ হয়ে গেল, যখন সাথীভাই ওসমান একপ্রকার জোর করেই "বিস্মরণ" বইটা আমাকে দিয়ে পড়িয়ে ছাড়লো। আর কি বলবো, কাজীদা! তখন থেকে চাতক পাখীর মতো হা করেই থাকি, কবে বের হবে আমার প্রাণপ্রিয় রানা সিরিজের বই। এমন ভাল লাগে যা এই ক্ষুদ্র লিখনীতে ব্যক্ত করে লেখককে ছোট করতে চাই না। পরিশেষে একটি মাত্র প্রশ্ন: এ সিরিজকে আরও কতদূর এগিয়ে নিতে ইচ্ছা?

০ যতদিন আপনারা চাইবেন, ঠিক ততদিনই মাসুদ রানার আয়ু।—আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ।

বজরং এবং শিবলী,
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

দু'টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানার জন্যই আপনার কাছে আমাদের এই চিঠি লেখা। প্রশ্ন দু'টো হচ্ছে:—

১। আমরা পায়ের গোড়ালি একত্র করে দাঁড়ালে আমাদের এক হাঁটু অপর হাঁটুকে স্পর্শ করে থাকে।

২। আমাদের কাতুকুতু অন্যান্যদের চেয়ে অনেক বেশি।

আশা করি উপরোক্ত দু'টি প্রশ্নের সঠিক সমাধান দিয়ে

আমাদেরকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করবেন।

o দুঃখিত, সঠিক সমাধান আমার জানা নেই। বরং কারও কাতুকুতু আছে জানলে দিতে ইচ্ছে করে।

খসরু পারভেজ লাভলু
সিলেট মেডিকেল কলেজ।

প্রতিশোধ দু'টো খণ্ডই পড়লাম। প্রতিশোধ-২-এ প্রতিশোধের হিংসাত্মক কাহিনী লিখতে গিয়ে মিষ্টি প্রেমের কাহিনী লিখে ফেলেছেন। বই দু'টি সত্যিই চমৎকার লেগেছে। ধন্যবাদ আপনাকে। আরও ধন্যবাদ টিনাকে শেষ পর্যন্ত জীবিত রাখার জন্য।

ছায়া শিকারী ১ ও ২ পড়লাম। ওলগার জন্য সত্যিই দুঃখ পেয়েছি। সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন কাহিনীর জন্য লেখককে ধন্যবাদ। আশা করি তাঁর কাছ থেকে আরও চমকপ্রদ কাহিনী উপহার পাবো।

অশুভ সংকেত পড়ছি। পরে আলোচনা বিভাগে আবার লিখবো কেমন?

o প্রতিশোধ ভাল লেগেছে জেনে খুশি হলাম।...বিশু চৌধুরী আরও একটি চমৎকার কাহিনীতে হাত দিয়েছেন।... অশুভ সংকেত কেমন লাগলো জানাবেন।...ধন্যবাদ।

মোঃ শহিদুল ইসলাম চৌধুরী (শাহীন)
পঞ্চগড় চিনিকল কলোনী, পঞ্চগড়, দিনাজপুর।

প্রতিশোধ ১, ২ পড়লাম, এক কথায় লা—জবাব। শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভাবতেই পারিনি কেয়াই সব অঘটনের মূল। কেয়ার সাথে বিষ-নিঃশ্বাসের সেই শিবানীর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

মাসুদ রানা পড়ে আমি [পাঠকরা] অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় হয়ে গেছি। ঠিক যেমনটি শাহেদ। তাই শাহেদের চরিত্রটা ভাল লাগলো।

০ ভাল লেগেছে জেনে সুখী হলাম।

শহিদ রেজা
শ্রীরামপুর (কালীগঞ্জ), ডাক ঃ নলডাঙ্গা, যশোর।

রানা সিরিজের প্রতিটা কাহিনীর সাথে প্রচ্ছদের ছবির একটা মিল পাওয়া যায়, কিন্তু প্রতিশোধ-২-এর কোথাও সাপের উল্লেখ নেই, অথচ প্রচ্ছদের মেয়েটার গলায় সাপ জড়ানো, এটা কেমন ? আমার ধারণা, কেয়ার ভূমিকাটা বিষাক্ত সাপের সাথে তুলনা করছেন। ঠিক ?

০ ওই রকমই একটা কিছু ··আসলে যে যা ভেবে নেয়।

সোহেল, অমিতাভ, বাবুল এবং কাজল রশীদ
জি. কে. বালিঘাট, চাঁদ মোহাম্মদ রাস্তা, থানাপাড়া, কুষ্টিয়া।

আমরা জানি, বাংলাদেশ পাসপোর্ট ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক যে ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্ট দেয়া হয়, তাতে একটা প্যাডের কালির সীল-এর ছাপ, যা ইংরেজীতে লেখা, দেয়া থাকে। যার অর্থ হচ্ছে ওই পাসপোর্টধারী দুনিয়ার সবক'টি দেশেই যেতে পারবে শুধুমাত্র তিনটি দেশ বাদে। ওই দেশগুলো হচ্ছে: সাউথ আফ্রিকা, ইস্রায়েল ও তাইওয়ান।

মাসুদ রানা নিশ্চয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক নয়। সে বাংলাদেশী তো বটেই, উপরন্তু ইস্রায়েলের একজন বড় শত্রু। অথচ ওকে আমরা 'আমিই রানা'তে দেখলাম, দিব্যি ইস্রায়েলের তেল আবিবের একটি অভিজাত এলাকার দামী হোটেলে কোনো

এক ইহুদী মেয়েকে নিয়ে…যাই হোক, ব্যাপারটা আমাদের একটু জটিল মনে হয়েছে। জটটা ছাড়িয়ে দেবেন, প্লীজ।

০ নকল পাসপোর্ট।

মনজুর মোর্শেদ নোমানী

বাহের চড় লজ, বি এম স্কুল রোড, বরিশাল।

আমি আপনার মাসুদ রানা সিরিজের প্রত্যেকটি বই দু'বার করে পড়ি। ঠিক তেমনি "উদ্ধার-২" দ্বিতীয়বার পড়তে গিয়ে বইয়ের ২৯ পৃষ্ঠার এক জায়গায় দেখলাম যে, রানা ডাক্তার এডওয়ার্ডসকে বলছে অ্যাকশনে যাওয়ার আগে যদি কেউ ভয় পায় আর যদি মুখের চেহারা ফ্যাকাসে হয় তবে অ্যাকশনের সময় সে বুঝেশুনে চলতে পারবে। আর যদি মুখের চেহারা লাল হয় তবে সে অ্যাকশনের সময় অচল হয়ে পড়বে। কাজীদা, বাস্তব ক্ষেত্রে কথাটা কতখানি সত্যি, জানালে খুশি হবো। সবশেষে প্রতিশোধ ১ ও ২-এর জন্য ধন্যবাদ।

০ এসব কথা সাধারণ ভাবে সত্য, কিন্তু কারও বিশেষ ক্ষেত্রে সত্য না-ও হতে পারে। একে অতিরিক্ত গুরুত্ব না দেয়াই ভাল।

ম. আ. বেলাল

সুজলা ক্রোকারিজ ষ্টোর, ১৭৬, হযরত শাহ আলী গভঃ মার্কেট, মিরপুর-১; ঢাকা-১০।

সদ্য বেরোনো মেজর রাহাত-১ পড়লাম। বইটা কেমন লেগেছে তা বলার পূর্বে একটা কথা হলো, এই বইটিকে রানা সিরিজের অন্তর্ভুক্ত করার কোনো যুক্তি আমি খুঁজে পাইনি। এ বইটিকে বিচ্ছিন্নভাবে 'দক্ষিণ সাগর' জাতীয় একটা বই-এর ন্যায়

প্রকাশ করলেই মনে হয় ভাল হতো।

যাই হোক মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা বইটি পাঠককে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে সক্ষম, অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়। আর পাঠকরাও কিনে যে ঠকবেন না এটুকুই বলতে পারি। পরিশেষে কাজীদাকে ধন্যবাদ। কেন? তা বলতে পারবো না, তবে আন্তরিকতায় কোনো ঘাটতি নেই।

০ আপনাকেও আন্তরিক ধন্যবাদ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অনেক ভাল ভাল কাহিনী রয়েছে, আমি জানি পাঠকদের ভাল লাগবে; কিন্তু এ-ও বুঝতে পারছি রানা সিরিজে দেয়া যাবে না। ভাবছি, বিচ্ছিন্ন ভাবেই প্রকাশ করবো।

ইমাদ উদ্দিন আহমেদ
৩৭, শুকরাবাদ, ঢাকা-৭।

ব্রিগেডিয়ার তারিখ আখতার, সিকান্দার বিল্লাহর মতো পাঞ্জাবী ক্যাপ্টেন মিশ্রি খান, লেফটেন্যান্ট আতাসী এদেরকে পরবর্তী যে কোনো একটি বইয়ে আনুন না, কাজীদা। সেই সাথে অনুরোধ, রাফেলা বার্ডকে তার স্ব-পরিচয়ে রানার সাথে দেখা করিয়ে দিন।

০ হতে পারে। অসম্ভব কি?

মোঃ মুহ্‌সিনুল ইসলাম খান
গ্রাম, ডাক :-মৈশাদী, চাঁদপুর, কুমিল্লা।

১৯৭৫ সাল। আমি তখন ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। আমার বড় ভাই বাড়িতে আনলেন সেবা প্রকাশনীর দু'খানি বই, প্রবেশ নিষেধ-১ ও ২। বই দু'টি পড়েছিলাম। দু'খানা বই-ই আমার মনের মধ্যে স্থায়ী আসন দখল করে নিল। যদিও মারিয়ার মর্মা-

ন্তিক মৃত্যুটা অবশ্য মৃত্যু না বলে পৈশাচিক ও নিষ্ঠুর হত্যাই বলবো, আমার তখনকার কচি মনে একটা দুঃখজনক দাগ টেনে দিয়েছিল। বস্তুতঃ সেবা প্রকাশনী এবং মাসুদ রানার সাথে আমার যোগাযোগ হয়েছিল সেই তখনই। তবে সেবা'র সাথে আমার পরিচয় সু-প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮০ সালে। '৭৫ থেকে '৮০, মাঝের সময়টুকু আমারই অবহেলা। '৮০ সালের শেষের দিকের কোনো এক দিন, তারিখটি মনে নেই, ঢাকা গেলাম, সদর ঘাট টার্মিনাল বুকস্টলে দেখলাম সুন্দর প্রচ্ছদে ছাপা দু'টি বই 'আই লাভ ইউ, ম্যান' ১ ও ২। কিনে নিলাম। তারপর···? যে ভাই-য়ের দ্বারা সেবা'র সাথে পরিচয়, বাড়ি এলেই এখন তিনি জিজ্ঞেস করেন নতুন কি বই কিনেছি।

রানা এখন আমার কতটুকু দখল করে আছে তা আর বলবো না, কারণ তা বলতে গেলে হয়তো বা নিজেকে প্রবঞ্চনা করা হবে। তবে এটা বলাতে ভুল হবে না যে রানাকে আমি ভালবাসি। আমার অবসর সময়টুকু তার জন্যই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের।

○ জেনে সুখী হলাম। ধন্যবাদ।

বুলবুল
A. F C. C, আশুগঞ্জ, কুমিল্লা

জানেন, কাজীদা, আমার অনেক দিনের আশা আজ পূর্ণ হলো। সেই কবে রানা সিরিজের 'সন্ন্যাসিনী'তে আপনি লিখে-ছিলেন যে রানার রক্ত "O" গ্রুপের, যার ফলে যে-কোন লোককে রানা রক্ত দিতে পারবে, কিন্তু "O" গ্রুপের রক্ত ছাড়া সে অন্য কোনো গ্রুপের রক্ত নিতে পারবে না। সেই তখন থেকেই আমার মনে কেবল জেগেছে, ইস্, আমি যদি "O" গ্রুপের হতাম।

বিশ্বাস করেন আজ আমার রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করে দেখি আমি "0" গ্রুপের, আজ আমার কত আনন্দের দিন তা আপনাকে লিখে জানাতে পারবো না। রানাকে বলে দেবেন, আমি আর রানা একই গ্রুপের রক্ত বহন করি। আর একটি কথা রানাকে বলবেন, তার রক্তের দরকার হলে যেন নিঃসংকোচে আমাকে জানায়।

০ আচ্ছা।

ফিরোজ আক্তার নাসিম
"ড্রীম্ হাউস্" ১০২, বি, আকুয়া, ময়মনসিংহ।

সেবা প্রকাশনীর সম্প্রতি প্রকাশিত প্রতিশোধ-১, ২ ভাল লেগেছে। সুন্দর লেখার জন্য লেখককে এবং অপূর্ব প্রচ্ছদের জন্য শিল্পীকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

নূর ইসলাম
চকইলাম, নওগাঁ, রাজশাহী।

মেজর রাহাত-১ পড়লাম। কেমন লেগেছে নাই বা জানালাম। যদিও ব্রায়ান ম্যালোরি রানাদেরকে গল্প শেষ হওয়ার পরের রাতেই গল্পের অবশিষ্টাংশ শোনাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমরা কবে যে আপনার মারফতে তা জানতে পারবো আপনিই জানেন ভাল। প্লিজ একটু তাড়াতাড়ি বের করার চেষ্টা করুন না। ব্রায়ান ম্যালোরির কাছ থেকে লেফটেন্যান্ট কর্নেল, কর্নেল এবং ব্রিগেডিয়ার রাহাত খান সম্বন্ধেও আমরা জানতে আগ্রহী। এমনকি কোনো অ্যাসাইনমেন্টে ব্রিগেডিয়ার সোহেল আহমেদের হাত কাটা যায় সে তথ্যও আমরা জানতে আগ্রহী।

০ জানতে পারবেন, সুযোগ হলেই জানিয়ে দেবো।

মো: গোলাম কিবরিয়া (জাহাঙ্গীর)
মালতীনগর, বগুড়া।

'প্রতিশোধ-২' পড়লাম, কোনো সময়ও ভাবতে পারিনি শুধু লেখনী দ্বারা ঘটনার এত বড় পট পরিবর্তন সম্ভব। বেশ মজা লাগলেও বলতে দ্বিধা নেই "কেয়ার" জন্য দুঃখ বোধ করেছি। প্রচ্ছদই মনে হয় গল্পের প্রতীক, তা শাহাদত চৌধুরী তুলে ধরেছেন প্রতিশোধ-২-এ। তাঁকে আমার ধন্যবাদ দিবেন।

o জানিয়ে দিলাম।

প্রাপ্তি স্বীকার

১। মোঃ নুরুজ্জামান, মালগুদাম রোড, জামালপুর। ২। মলয় ভৌমিক, বোয়ালমারী, ফরিদপুর। ৩। সাজু, বারঘরটোলা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। ৪। আঞ্জুম খাঁন, পাইকপাড়া, মীরপুর, ঢাকা-১০। ৫। এস, এ হান্নান, মনির কুটির, গোহাটা সড়ক, যশোর। ৬। মাহমুদ কাদির, বাবলু, কলেজ হোস্টেল রোড, থানাপাড়া, গাইবান্ধা, রংপুর [অযত্নে যে বন্ধু বই নষ্ট করে, তাকে না দিলেই হয়।] ৭। মোঃ জাহাঙ্গীর, পৈকখালী, ভাণ্ডারিয়া, বরিশাল। ৮। মোঃ আব্দুল হাই, কালিবাড়ী, সিরাজগঞ্জ, পাবনা ৯। মোঃ সাঈদ-উল-হক, দক্ষিণ নালা পাড়া, জরিয়া কলোনী, চট্টগ্রাম। ১০। মাহবুব আলম, হাছন নগর, সুনামগঞ্জ, সিলেট। ১১। ম, আ, মুহিত, শ্রীমঙ্গল, সিলেট। ১২। হুমায়ুন কবীর বেলাল, নওয়াদাবগা, সরকারপাড়া, বগুড়া। ১৩। এম, মোবারক ছফা, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম। ১৪। মঈনউদ্দিন আহমেদ মুকুল সুজানগর, পাবনা [আপনি আলোচনা বিভাগের মাধ্যমে যে-সব কথা প্রচার করতে চান সে-সব ছাপা বেআইনী কাজ হবে।

কাজেই···দুঃখিত।] ১৫। মোঃ ওয়াসিকুল আজাদ, এনায়েতগঞ্জ, পিলখানা, ঢাকা-৯ [কবিতাটি ভালোই লাগলো।] ১৬। রশিদ খান, শাহীন কলেজ, কুর্মিটোলা, ঢাকা। ১৭। মোজাম্মেল জাহাঙ্গীর, মীরপুর, ঢাকা। ১৮। মিন্টু, নয়াপাড়া, জামালপুর। ২৯। নিয়াজ মোঃ নাসিম আনোয়ার, জগলু, জগদীশপুর, ইটাখোলা, সিলেট। ২০। সোহেল, মিঠু, কচি, শাহীন, পঞ্চগড় চিনিকল, দিনাজপুর। ২১। মুকুল, সুইটি, কল্যাণপুর, ঢাকা-৭। ২২। মোহাঃ মোজাম্মেল হক মৃধা, অগ্রণী ব্যাঙ্ক, পাবনা। ২৩। সুমন, ৬ নং পুষ্পরাজ সাহা লেন, লালবাগ, ঢাকা-১১ [আমিও।]

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন।

কিন্তু অনেক ঘুরে, অনেক খুঁজে, পুস্তক বিক্রেতাকে অনেক অনুনয়-বিনয় ও অনুরোধ-উপরোধ করেও অনেক পাঠক সেবা'র বিশেষ কোনো বই সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে আমাদের কাছে চিঠি আসে।

তাঁদের জন্যে আমরা ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহের ব্যবস্থা নিয়েছি। ইচ্ছে করলেই আপনি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেন।

আজই মানি অর্ডার যোগে ৫০·০০ টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হয়ে যান। নতুন বই প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। নতুবা নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্য সেলস ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন।

আগামী বই

আলেয়ার পিছে

লেখক : কাজি মাহবুব হোসেন

মূল্য : পনের টাকা

বিষয় : বাংলা ভাষায় প্রথম ওয়েস্টার্ন কাহিনী। যেমন চমকপ্রদ, তেমনি রোমাঞ্চকর এক অভিযানে ভাল মন্দ অনেক লোকের সাথে পশ্চিমে চলেছে এক বাঙালী যুবক—এরফান জেসাপ। রেড ইণ্ডিয়ানদের চেয়েও ভয়ঙ্কর সাদা চামড়ার ডাকাত দলের সাথে বেধে গেল এরফানের মরণপণ সংঘর্ষ।

রানা-১১০

দুই খণ্ডে সমাপ্ত স্পাই থ্রিলার

মেজর রাহাত-২

কেউ জানতো না
বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের সুযোগ্য কর্ণধার
কাঁচা-পাকা ভুরুর অধিকারী
গুরু-গম্ভীর ওই ছিমছাম ঋজু ব্যক্তিত্ববান
চাপা মানুষটির আসল রূপ
অতীত বীরত্বের কাহিনী।

বিপদেই মানুষের সত্যিকার পরিচয়।
মস্ত বিপদে পড়েছে ম্যালোরি, গ্রীণ আর
মেজর রাহাত।

স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করবে এবার বাঙালী যুবক।
কাটায়রায় পেঁছে প্রথম আঘাত হানলো সে।
প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সাথে সাথে
দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো টাটরা।
তারপর থেকে আর হাঁফ ছাড়ার ফুরসত নেই,
শুধু বিপদ আর বিপদ—
ধৈর্য, বুদ্ধি আর সাহসের চরম পরীক্ষা!

তের টাকা

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

শো-রুম : ৩৬/১০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১